সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৩

২০১৭-২০১৮ সালে মিডিয়াতে প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ

সমসাময়িক উন্নয়ন চিন্তা ৩

২০১৭-২০১৮ সালে মিডিয়াতে
প্রকাশিত সিপিডি'র নির্বাচিত বক্তব্যসমূহ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭৯, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪
ই-মেইল: info@cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৯

স্বত্ব
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও সাক্ষাৎকারগুলোতে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবে লেখকদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

প্রচ্ছদ
অভ্র ভট্টাচার্য

অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস
মোঃ সাইফুল হাসান

ISBN 978-984-34-5797-4

মূল্য
৩৭০ টাকা

মুদ্রক

লিথোগ্রাফ
৪১/৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

C12019_2SOM_SPE

সিপিডি পরিচিতি

১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) যাত্রা শুরু করে। নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সহযোগীদের সাথে সংযোগ ও সংলাপ প্রসারের লক্ষ্যে একটি নাগরিক উদ্যোগ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় সিপিডি।

দীর্ঘ ২৫ বছরের পথ চলায় সিপিডি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি স্বাধীন থিংক ট্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। সিপিডি'র অন্যতম কার্যক্রম হল দেশের সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক ও নীতি-নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত নিয়ে সংলাপের আয়োজন করা।

গবেষণার প্রধান বিষয়গুলো হল সামষ্টিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, দারিদ্র্য ও অসমতা, কৃষি, বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বৈশ্বিক সামঞ্জস্য, অবকাঠামো ও ব্যবসায়ী উদ্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, নীতি ও প্রতিষ্ঠান এবং ২০৩০ এজেন্ডা বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)। বর্তমানে, সিপিডি দু'টি বৈশ্বিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে। একটি হল LDC IV Monitor, যা জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চতুর্থ সম্মেলনে গৃহীত কর্মসূচিগুলোর বাস্তবায়ন গতিচিত্র পর্যবেক্ষণে গঠিত একটি স্বাধীন অংশীদারিত্ব; অপরটি হল ৪৯টি থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সম্মিলিত একটি নেটওয়ার্ক, Southern Voice on Post-MDG International Development Goals (সাউদার্ন ভয়েস), যা মূলত ২০৩০ এসডিজি বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে উন্নয়নশীল দক্ষিণের ভূমিকা নিয়ে কাজ করে।

জাতীয় পর্যায়ে সিপিডি *এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ*-এর সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে। দেশে এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা রাখাই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য।

গবেষণা সংলাপ ও নীতি পরামর্শে সিপিডি'র বিশেষ অর্জন রয়েছে। নীতি গবেষণা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম ও সার্বিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ Think Tank Initiative-এর আওতায় বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য সিপিডি পরপর দুইবার নির্বাচিত হয়েছে।

সিপিডি প্রকাশিত বই, মনোগ্রাফ, ওয়ার্কিং পেপার, সংলাপ প্রতিবেদন ও সংক্ষিপ্ত নীতি পরামর্শের সংখ্যা ইতিমধ্যে ৪০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সিপিডি'র প্রকাশনা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি নিয়মিতভাবে সিপিডি'র ওয়েবসাইটে (www.cpd.org.bd) প্রকাশ করা হয়।

লেখক পরিচিতি

অধ্যাপক রেহমান সোবহান
চেয়ারম্যান

এম. সাইদুজ্জামান
সদস্য, বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ (বিওটি)

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য
সম্মাননীয় ফেলো

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. রওনক জাহান
সম্মাননীয় ফেলো

ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
গবেষণা পরিচালক

ড. আনিস পারভেজ
অতিরিক্ত পরিচালক

তৌফিকুল ইসলাম খান
জ্যেষ্ঠ গবেষণা ফেলো

মুখবন্ধ

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের একটি স্বাধীন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসেবে কাজ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিষয় যেমন অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য, অসমতা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সুশাসন, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সিপিডি তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করছে। এর পাশাপাশি সিপিডি'র গবেষকরা তাঁদের গবেষণার ফলাফল বৃহত্তর পরিসরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংবাদপত্রে কলাম লিখে থাকেন এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতেও সিপিডি'র গবেষকদের মতামত প্রকাশিত হয়।

২০১৪-২০১৭ সালের নির্বাচিত মতামতগুলো দু'টি পূর্ণাঙ্গ বই আকারে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলার জন্য বর্তমান সংকলনটি আমরা প্রকাশ করছি, যেখানে ২০১৭-২০১৮ সালে দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সিপিডি'র গবেষকদের নির্বাচিত বিশেষ মতামত, কলাম ও সাক্ষাৎকার সংকলন করা হয়েছে। এ লেখাগুলোতে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণ সম্পর্কিত আলাপ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বাজেট, ব্যাংকিং খাত, শ্রমবাজার, বৈষম্য ও বিভাজন নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া বইটিতে এলডিসি হতে উত্তরণ ও এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের করণীয় ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ক বক্তব্য আছে।

বিষয়বস্তুর উপর বিন্যাস করে সংকলনটিতে বক্তব্যগুলোকে আটটি পৃথক অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। 'গণতান্ত্রিক উত্তরণ' শিরোনামের প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গণতন্ত্র ও রাজনীতির প্রেক্ষাপট এবং চ্যালেঞ্জ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায় 'অর্থনৈতিক পরিস্থিতি'-তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কীভাবে জীবনমানের – বিশেষত নাগরিক শহর ঢাকার – উপর প্রভাব ফেলছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে। বাংলাদেশের বাজেট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও করণীয় সংক্রান্ত মতামত সংকলিত হয়েছে 'বাজেট প্রসঙ্গ' শিরোনামের তৃতীয় অধ্যায়ে। এলডিসি'র তালিকা থেকে উত্তরণ, এবং বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সমসাময়িক অবস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায় 'এলডিসি'-তে।

এ ছাড়া, 'এসডিজি' শিরোনামের পঞ্চম অধ্যায়ে এসডিজি অর্জনে নাগরিকের মনোভঙ্গি ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে সময়োপযোগী আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায় 'ব্যাংকিং'-এ ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, ঋণখেলাপি এবং ব্যাংকিং কমিশন গঠনের আহ্বান সংক্রান্ত আলোচনা রয়েছে। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যথাক্রমে 'শ্রমবাজার' ও 'বৈষম্য ও বিভাজন'-এ শ্রমবাজারে

নারীর অংশগ্রহণ, শ্রমিকদের জীবনে নতুন মজুরি কাঠামোর প্রভাব এবং আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বৈষম্য কীভাবে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে সে বিষয়ে গভীর আলোচনা করা হয়েছে।

আশা করা যায়, সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সিপিডি'র গবেষকদের বিশ্লেষণ ছাত্র-ছাত্রী, তরুণ সমাজ ও বৃহত্তর জনমানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বইটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সিপিডি'র গবেষণাকর্ম বাংলা ভাষায় বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব পত্রিকা সুযোগ করে দিয়েছেন, এ গ্রন্থের সকল লেখকের পক্ষে আমি সেসব পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে উল্লেখ্য যে, মিডিয়ায় প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করে প্রকাশের উপযোগী করতে গিয়ে ক্ষেত্র-বিশেষে কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা হয়েছে।

সিপিডি'র ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগের সহকর্মীরা এ সংকলন প্রকাশের জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন। লেখা ও মন্তব্যসমূহের নির্বাচন ও বাছাই, সেগুলো বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যাস ও পরিমার্জন করে প্রকাশের উপযোগী করে তুলতে তারা প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এ বিভাগের প্রধান *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ* ও অতিরিক্ত পরিচালক ড. *আনিস পারভেজ* এক্ষেত্রে সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছেন। উপ-পরিচালক *অভ্র ভট্টাচার্য*, প্রকাশনা সহযোগী *আসমাউল হুসনা* এবং প্রোগ্রাম সহযোগী (ডিটিপি) *মোঃ সাইফুল হাসান* সংকলনটির প্রকাশে মূল ভূমিকা রেখেছেন। তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা
ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

সূচিপত্র

মুখবন্ধ — *সাত*

অধ্যায় ১: গণতান্ত্রিক উত্তরণ

ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাতির চেতনা ধারণ করেছিলেন — ৩
রেহমান সোবহান

মানবমুক্তির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ — ৫
রেহমান সোবহান

গণতন্ত্রের গাড়ির সব চাকাই সচল রাখতে হবে — ২১
রওনক জাহান

শিশুদের বিপ্লব থেকে কী শিখলাম? — ২৬
রেহমান সোবহান

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন — ৩৩
এম. সাইদুজ্জামান

গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের রেকর্ড ভালো নয় — ৪৪
রেহমান সোবহান

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বিরাট চ্যালেঞ্জ — ৫১
রওনক জাহান

বাংলাদেশের ‘উন্নয়ন’ উড়োজাহাজের দুই ইঞ্জিনের একটি প্রায় বিকল — ৫৬
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অস্থির রাজনীতি সুস্থির অর্থনৈতিক চিন্তার অন্তরায় — ৬৫
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

নির্বাচনী বিতর্কের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য — ৭০
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতির পূর্বশর্ত — ৭৫
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ২: অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

চাহিদার তুলনায় প্রাপ্যতা কম হওয়ার কারণেই ঢাকায় চাপ বাড়ছে ৮৩
ফাহমিদা খাতুন

কেন ঢাকা এত ব্যয়বহুল? ৮৯
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অধ্যায় ৩: বাজেট প্রসঙ্গ

অর্থনীতিতে হঠাৎ চাপ ৯৫
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অঙ্ক মেলানো সহজ হবে না: বাজেট ২০১৮-১৯ ৯৯
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

ভালো-মন্দ সবই অব্যাহত থাকবে ১০৪
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোই বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ ১০৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাজেটে বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে ১১৩
মোস্তাফিজুর রহমান

কর ফাঁকি বন্ধে জিরো টলারেন্স জরুরি ১২১
মোস্তাফিজুর রহমান

বাজেট বাস্তবায়ন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ১২৩
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৪: স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি)

বাংলাদেশের নতুন সক্ষমতা ও ঋণের বিকল্প উৎস ১২৭
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

‘মসৃণ রূপান্তর’-এর জন্য এখন যা করণীয় ১৩২
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন পরিচয়, নতুন দিগন্ত: জাতিসংঘের স্বীকৃতি ১৩৬
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

আমাদের উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে হবে ১৪১
রেহমান সোবহান
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ: চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন দক্ষতা ১৪৮
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা সুবিধাও পাব ১৫০
তৌফিকুল ইসলাম খান

অধ্যায় ৫: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

এসডিজি, পৃথিবীর রূপান্তর ও নাগরিকের মনোভঙ্গি ১৫৯
আনিস পারভেজ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পথরেখা: ব্যতিক্রমী অর্জনের প্রেক্ষাপটে আগামীর চ্যালেঞ্জ ১৬২
মোস্তাফিজুর রহমান

অধ্যায় ৬: ব্যাংকিং

ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা ১৭৭
ফাহমিদা খাতুন

ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি থেকে কেন সরে এলেন অর্থমন্ত্রী? ১৮১
মোস্তাফিজুর রহমান

নিয়মনীতির সর্বজনীন কোনো প্রয়োগ নেই ১৮৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সমস্যা ১৮৬
ফাহমিদা খাতুন

অধ্যায় ৭: শ্রমবাজার

দেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ১৯১
ফাহমিদা খাতুন

শ্রমিকেরা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না ১৯৫
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

নতুন মজুরি কাঠামো আগের চেয়ে বেশি দুর্বল হয়েছে ১৯৮
খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

অধ্যায় ৮: বৈষম্য ও বিভাজন

বৈষম্য কমানোই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ২০৩
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বৈষম্য পুরো সমাজ ব্যবস্থায় বিভাজন তৈরি করে, যা অর্থনীতির জন্য সুখকর নয় ২০৯
ফাহমিদা খাতুন

অধ্যায় ১

গণতান্ত্রিক উত্তরণ

ব্যক্তিত্ব দিয়ে জাতির চেতনা ধারণ করেছিলেন

রেহমান সোবহান

এক একাডেমিক আলোচনায় রেহমান সোবহান এক 'দেশ, দুই অর্থনীতি' তত্ত্ব হাজির করে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তরুণ অর্থনীতিবিদ দেখিয়েছিলেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কী ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করছে। ১৯৬১ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত ফোরামে প্রকাশিত তার লেখা প্রকৃত অর্থে ষাটের দশকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এক জীবন্ত দলিল। ছয় দফা তৈরিতে তারও অংশগ্রহণ ছিল। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি শিল্প-বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবকাঠামো বিভাগে (১৯৭২-৭৪) কর্মরত ছিলেন।

আমার জানা মতে, সাম্প্রতিক ইতিহাসেও আন্দোলনকারী কোনো নেতা বঙ্গবন্ধুর মতো সরাসরি রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের পূর্বেই দেশ ও জনগণের উপর এমন পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আরোপ করতে সক্ষম হননি। এ ক্ষেত্রে আমরা মহাত্মা গান্ধী, মাও সে তুং, হো চি মিন, নক্রুমা, সুকর্নো, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ নেতার কথা উল্লেখ করতে পারি। এমন ঘটনার কথা আমার জানা নেই, যেখানে বেসামরিক সরকার ও সিভিল সমাজ উভয়েই ক্ষমতাসীন সরকারের উপর থেকে তাদের আনুগত্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং এমন এক ব্যক্তির উপর আনুগত্য ন্যস্ত করেছে রাষ্ট্রক্ষমতার উপর যার কোনো আনুষ্ঠানিক কমান্ড নেই। এমন কোনো ঘটনার কথাও আমার জানা নেই, যেখানে ক্ষমতাসীন কিংবা দখলদার শক্তির সামরিক বাহিনীতে কর্মরত একটি জাতিগোষ্ঠীর সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ করেছে এবং প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নেতার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

২৬ মার্চ ১৯৭১-এর এই গণবিদ্রোহে কর্মরত সৈন্যদেরকে একটি মুক্তিবাহিনীর সর্বাগ্রভাগে স্থাপন করে। সমগ্র বাঙালি জাতি একজন নেতার পেছনে সমবেত হওয়ার কারণে এই গণবিদ্রোহ সম্ভবপর হয়। এই নেতা ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের জনগণ তাদের স্বায়ত্তশাসনের দাবি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নিরঙ্কুশভাবে নির্বাচিত করে। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দল এইভাবে একটি প্রতিনিধিত্বশীল মর্যাদা লাভ করে - যা ছিল নির্বাচনী রাজনীতির ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। তবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলের ঊর্ধ্বে উঠে যান এবং ইতিহাস তাঁকে জাতির পিতার ভূমিকায় অবতীর্ণ করে। ওই মার্চ মাসেই, বাঙালির ইতিহাসে হয়তো প্রথম ও শেষবারের মতোই, একজন মানুষ তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে একটি জাতির চেতনাকে ধারণ করেছিলেন এবং এইভাবে সমগ্র জনগণকে তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অর্থাৎ সকল রাজনৈতিক মতের লোক, প্রশাসনযন্ত্র, সশস্ত্রবাহিনী, সিভিল সমাজের সকল অংশ-ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিক, পেশাজীবী থেকে দরিদ্র কৃষক - সকলকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন এবং তাদের অনেকেই ১৯৭১-এর ২৬ মার্চে শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত হয়।

(১৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে ভোরের কাগজে প্রকাশিত ‘জাতির পিতার স্মরণে: মার্চ ১৯৭১ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়’ শীর্ষক নিবন্ধ থেকে নেওয়া।)

১৫ আগস্ট ২০১৭
বণিক বার্তা

মানবমুক্তির জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ

রেহমান সোবহান

শতকের পর শতক ধরে চলা বহিরাগত ও অগণতান্ত্রিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব রয়েছে বাংলাদেশের জনগণের উপর। স্বাধীনতা আমাদের সর্বস্তরের জনগণের অনাবিষ্কৃত শক্তিকে অবমুক্ত করে দিয়েছে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন উল্লেখযোগ্যভাবে চাঙ্গা করতে ভূমিকা রেখেছে। স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের এই আবির্ভাব জরাজীর্ণ কোনো ঔপনিবেশিক শাসনের বিদায়ী উপহার ছিল না, বরং এটি জনগণের প্রবল অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফসল, যা ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতাযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে। যুদ্ধ অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর গণহত্যার শিকার সাধারণ মানুষকে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় শামিল করেছে। ফলে জনগণের প্রতি আমাদের রক্তের ঋণ হলো, আমাদের এমন একটি সমাজ গড়ে তুলতে হবে, যে সমাজ এই বিপুল আত্মত্যাগ আর নির্যাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

বিগত দুই দশকে আমরা দারিদ্র্যের হারহ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতিসহ মানুষের জীবনমানে লক্ষণীয় উন্নতি প্রত্যক্ষ করছি। আবার দুর্ভাগ্যবশত একই সঙ্গে দেখেছি অসমতা বৃদ্ধি, সামাজিক বৈষম্যের বিস্তার, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ত্রুটিবিচ্যুতি এবং সমাজের ভেতরে অন্তর্ভুক্তিবিরোধী শক্তির শিকড় গেড়ে থাকা। এগুলো স্বাধীনতার কল্যাণে প্রাপ্ত আমাদের স্পৃহাগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে এবং ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাদেশের মানুষকে রুদ্ধ করে রাখা হয়। নিপীড়ক জমিদার, ঋণদাতা আর বাজারব্যবস্থার

অন্ধশক্তি আমাদের কৃষকদের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা আর অকালমৃত্যুর বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের কল্যাণে আমরা অর্জন করেছি আমাদের জাতিসত্তা। তবে এই মুক্তিসংগ্রামের আরও যে সুদূরপ্রসারী ও গভীর প্রভাব আছে, সেটি তখনো স্পষ্ট বোঝা যায়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের অনাবিষ্কৃত উদ্যোক্তাসুলভ সক্ষমতার যে প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, তার ক্ষেত্র ছিল জাতীয় মুক্তির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। এ ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নেতৃত্ব আর রাজনৈতিক উদ্যোগের অসামান্য গুণের স্বাক্ষর রেখেছেন, যা ভোটের বাক্সের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে বাংলাদেশের মানুষকে একতাবদ্ধ হতে এবং ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম করে তুলেছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন গণহত্যা শুরু করে, বাংলাদেশের মানুষ তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের অভিযান হিসেবে দেখেনি, বরং দেখেছে সার্বভৌম বাংলাদেশের ভূখণ্ড আর জনগোষ্ঠীকে পুনরায় দখল করে নেওয়ার অভিযান হিসেবে; যা রুখতে সর্বস্তরের প্রতিরোধ প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু মানুষকে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, যা ১৯৭১-এর মার্চে দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। এই চেতনা পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালিদের পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার শপথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভঙ্গ করতে এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা অর্জনে অস্ত্র ধরতে উদ্বুদ্ধ করে। এই সংগ্রামে বাঙালি যোদ্ধাদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন প্রশাসক, পুলিশ, শিক্ষক-ছাত্র, সর্বোপরি বাংলাদেশের শ্রমিক ও কৃষক। অজস্র বছর ধরে এই মানুষগুলোকে কখনো সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়নি। বাংলাদেশের মানুষের বড় একটি অংশ গুলির শব্দটিও শোনেনি এর আগে। সশস্ত্র সংগ্রামের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই, বন্দুকের সঙ্গে পরিচয়হীন এই একই মানুষেরা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে অস্ত্র হিসেবে যা পেয়েছেন, তাই-ই হাতে তুলে নিয়েছেন। সামরিক প্রশিক্ষণ কিংবা অস্ত্র চালনার অভিজ্ঞতা ছাড়া হাজারো তরুণ যোগ দিয়েছেন মুক্তিবাহিনীতে, যেখানে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন রাজনৈতিক কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা, পুলিশ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, চিকিৎসক ও অন্য বেসামরিক লোকজন।

প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অস্ত্রধারণের সাহস ও উদ্যোগ জরুরি ছিল, যা স্বাধীনতাযুদ্ধে যোগ দেওয়া আমাদের পেশাদার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সামরিক সদস্যরা নবগঠিত মুক্তিবাহিনীর ভিত্তি গড়ে দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের জনগণের এই সামরিক উদ্যোক্তাসুলভ পদক্ষেপের কারণেই পাকিস্তানি সৈন্যদের স্থানীয় পর্যায়ের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড একটি পূর্ণমাত্রার গণহত্যায় রূপান্তরিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা টের পায়, তাদের হত্যাযজ্ঞ শুধু আওয়ামী লীগ কিংবা ছাত্রসমাজ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত রাখলে চলবে না, বরং বাংলাদেশের পুরো জনগোষ্ঠীর উপর তা চালাতে হবে।

রাষ্ট্র গঠন

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর এত সমস্যা আমাদের ঘিরে ধরেছিল যে জন্মের পরই সেগুলো আমাদের গলা টিপে মেরে ফেলতে পারতো। এই রক্তস্নাত জন্ম-পরবর্তীকালে টিকে থাকার জন্য দরকার ছিল নেতৃত্ব আর উদ্যোক্তাসুলভ অসামান্য গুণ। উপনিবেশোত্তর বেশির ভাগ দেশেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রশাসনকাঠামো এবং ঔপনিবেশিক সময়ের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যায়, যা সচল রাখে অর্থনীতির চাকা। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের কপালে সেই সুবিধা ছিল না। পাকিস্তান দেশটির গড়ন এমন অদ্ভুত ছিল যে তাতে ক্ষমতাসীন অভিজাতদের নাগপাশ থেকেই আমরা শুধু মুক্তি খুঁজিনি, স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বছরগুলোয় এ দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রণকারী পাকিস্তানকেন্দ্রিক ব্যবসায়িক স্বার্থগুলোর সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দী) ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করার পরপরই তাদের ব্যবসায়িক সম্প্রদায় সম্পদ ফেলে এই ভূখণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে অর্থনীতির প্রতিটি খাতে প্রবেশ করা একটি বিস্তৃত ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য চালিয়ে নেওয়ার দায়ভার বর্তায় এই দেশটির উপর। এই ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে এমন একটি পর্যায় পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা করতে হবে, যাতে ন্যূনতম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আবার শুরু করা যায়। শতকের পর শতক বিদেশিরা নিয়ন্ত্রণ করেছে এ দেশের অর্থনীতি। ফলে বাংলাদেশের মানুষের উদ্যোক্তাসুলভ কর্মকাণ্ডে এমন এক শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়িক মালিকানা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, এমনকি উৎপাদন সক্ষমতা বা রেল পরিচালনায় কারিগরি দক্ষতা - সবই ছিল বিদেশনির্ভর।

কিন্তু দিন শেষে বাংলাদেশিরা নিজেদের ভেতরের সুপ্ত রাষ্ট্রপরিচালনা ও উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলি আবিষ্কার করেছে। আগে যেমনভাবে তারা আবিষ্কার করেছে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার অকল্পনীয় সক্ষমতা। বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের যখন মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান এবং ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য একটি প্রশাসন গড়ে তোলার প্রয়োজন পড়েছে, তখনই রাষ্ট্রপরিচালনার সক্ষমতার কিছু বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে পরিত্যক্ত হাজারো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা অথবা সেগুলো আত্তীকরণের জন্য তিন মাসের মধ্যে একটি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো ও জাতীয় নীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের পেশাদার লোকেরা, যাঁদের অধিকাংশই মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পেয়েছিলেন, আত্তীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব নেন। এই ব্যবস্থাপকদের বেশির ভাগই সেই স্তরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যা তাঁদের অতীত অভিজ্ঞতারও অতীত। তবে দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দুই বছর তাঁরা স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ের সমান উৎপাদনে যেতে পেরেছিলেন। এর পেছনে ছিল তাঁদের কঠোর শ্রম। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও খুব কম পারিশ্রমিকে নিবেদিত হয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন তাঁরা।

চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় শাসনব্যবস্থার আরও বড় উদ্যোক্তাসুলভ সক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। বহু বছর ধরে বহিঃশক্তির পদানত থাকার ফলে নিজেদের শাসনের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না বাংলাদেশের। এমনকি পাকিস্তান রাষ্ট্রেও সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, নীতি এবং সরকারের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো পাকিস্তানি শাসকেরাই নিয়ন্ত্রণ করেছে। কাজেই নতুন সৃষ্ট রাষ্ট্রটিকে তার নিজের ভেতরে সুপ্ত সরকার পরিচালনার অসামান্য সক্ষমতা আবিষ্কার করতে হয়েছে।

যুদ্ধকবলিত একটি দেউলিয়া দেশে জাতি গঠনে এই অনুশীলন ওই সময় - এমনকি পরবর্তী বছরগুলোয়ও - খুব একটা প্রশংসা পায়নি। অপর একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের অসুস্থ জরায়ু থেকে রক্ত আর আগুনের ভেতর দিয়ে ভূমিষ্ঠ নতুন একটি রাষ্ট্রের এমন অনেক অনাবিষ্কৃত গুণের প্রয়োজন হয়েছে, যেগুলোর জন্য কোনো প্রশিক্ষণ পুস্তিকা নেই। কাজেই বাংলাদেশ গঠনে নেতা এবং জনগণ - সবারই উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে হয়েছে। ক্লেশ আর ভুলের মাধ্যমে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে প্রথমে তাঁদের শিখতে হয়েছে, রাষ্ট্র কীভাবে গঠন করতে হয়। পরে জানতে হয়েছে সেই রাষ্ট্র পরিচালনার কলাকৌশল।

কৃষক সমাজের সংগ্রাম

স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষিনির্ভর। আমাদের কৃষির প্রায় পুরোটাই নির্ভরশীল ছিল ক্ষুদ্র চাষিদের উপর, যাঁরা খুব কম জমি চাষ করে কোনো রকমে জীবন ধারণ করতেন। প্রত্যন্ত এলাকার ৫০ শতাংশ পরিবার ছিল ভূমিহীন। যে বছর ভালো ফলন হতো, সে বছর আমাদের কৃষকেরা প্রায় এক কোটি টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারতেন, যা দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য ছিল অপ্রতুল। ফলে ভূমিহীন,

স্বল্প জমির মালিক এবং নগরের জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে আমাদের অতিমাত্রায় খাদ্য সহায়তার উপর নির্ভর করতে হতো।

এই ক্ষুদ্র চাষিরাই - যাঁরা ১ থেকে ৫ একর জমি চাষ করেন - গত ৪৭ বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ চার গুণ বাড়িয়ে চার কোটি টনে উন্নীত করেছেন। প্রতিকূল আবহাওয়া আর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং উৎপাদন ও পারিবারিক পেশাগত কাঠামোয় বৈচিত্র্য এনে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন তাঁরা। বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলের অর্থনীতিতে এখন বৈচিত্র্য এসেছে। হাঁস-মুরগির খামার, গবাদিপশু পালন, চিংড়ি চাষ ছাড়াও খামার কার্যক্রমের বাইরে বিস্তৃত হয়েছে গ্রামীণ অর্থনীতি। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগেও এসব অকল্পনীয় ছিল। এগুলো সম্ভব হয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উদ্যোগের ফলে। আর গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার কমেছে এসব উদ্যোগের প্রকাশ ঘটার পর। গ্রামীণ অবকাঠামোয় বিনিয়োগ, শিক্ষার প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতার মতো কর্মসূচিও দারিদ্র্যের হার কমানোয় ভূমিকা রেখেছে। তবে পল্লি এলাকার জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সক্রিয়তা এবং উৎপাদন সক্ষমতার রূপান্তর ভূমিকা রেখেছে সবচেয়ে বেশি।

উদ্যোক্তা বিপ্লব

বেসরকারি খাতে উদ্যোক্তা হিসেবে আমাদের সীমাহীন সক্ষমতা কেবল বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়েই এক বিস্ময়। স্বাধীনতার সময় আমরা শুধু একজন বাঙালিকেই উদ্যোক্তা হিসেবে পেয়েছিলাম - এ কে খান। পাকিস্তানের ব্যবসা খাতকে নিয়ন্ত্রণকারী ২২ প্রভাবশালী পরিবারের একটি ছিল এ কে খানের পরিবার। ষাটের দশকে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় পাট ও বস্ত্র খাতে ছোট পরিসরে একটি বাঙালি উদ্যোক্তা শ্রেণি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই সময় বাঙালিদের মধ্যে শীর্ষ মেধাবীরা হয় সরকারি চাকরি, নতুবা পেশাজীবিতার দিকে ঝুঁকেছেন। ফলে ১৯৭১-এ বাংলাদেশে ৩৫ শতাংশ উৎপাদন সক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল করপোরেশনের (ইপিআইডিসি) মাধ্যমে। বাঙালি উদ্যোক্তারা ছিল উৎপাদন সক্ষমতার ৩ শতাংশের মালিক, বাকি ৬২ শতাংশের মালিকানা ছিল পাকিস্তানিদের হাতে। বেশির ভাগ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য, ব্যাংক, বিমা, এমনকি বড় খুচরা প্রতিষ্ঠানগুলোও ছিল অবাঙালিদের মালিকানায়। স্বাধীনতা-পরবর্তী সরকারি খাতের উপর যে জোর দেওয়া হয়েছিল, তার পেছনে ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে বাংলাদেশিদের মধ্যে উদ্যোক্তাসুলভ গুণের ঘাটতি আছে এবং কেবল রাষ্ট্রীয় বড় পৃষ্ঠপোষকতাতেই এর অগ্রগতি সম্ভব।

তবে কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ অর্থায়নে একটি বড় উদ্যোক্তা শ্রেণি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। তবে এটি অর্জিত হয়েছে নতুন এই বেসরকারি উদ্যোক্তা শ্রেণির বিশাল ঋণখেলাপির বিনিময়ে। বছরের পর বছর এই খেলাপি ঋণ জিইয়ে রাখা হয়েছে। আজ অবধি চেপে আছে খেলাপি ঋণের বোঝা, যা পরিচিতি পেয়েছে ‘খেলাপি সংস্কৃতি’ হিসেবে।

তৈরি পোশাকশিল্প (আরএমজি) সম্ভবত প্রথম বেসরকারি খাত, যা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বিকশিত হয়েছে, যদিও রাষ্ট্রের নীতি এ ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। নুরুল কাদের খানের পথিকৃৎ প্রচেষ্টা এ স্থলে স্মরণযোগ্য। পাবনার ডেপুটি কমিশনার থাকা অবস্থায় নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে নিজের উদ্যোগ প্রদর্শন করেছেন। স্বাধীনতার পর তিনি কোরিয়ার একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করে বৈশ্বিক মাল্টিফাইবার চুক্তির (এমএফএ) আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অব্যবহৃত কোটার সুযোগ নিতে রাজি করান। অভিজ্ঞতা কম হলেও বহু পেশাদার এরপর নুরুল কাদেরের দেখানো পথে হেঁটে তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালেন।

চীনের পর বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রফতানিকারক দেশ। নতুন প্রজন্মের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বৈশ্বিক বাজারে স্বাধীনভাবে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অর্জন করেছে। গত শতকের আশির দশকে যেখানে এই খাত থেকে ২৫ শতাংশ আয় আসতো, এখন আসে ৭৫ শতাংশ।

বিগত ৩০ বছরে তৈরি পোশাক খাতের গতিশীল উৎপাদন ওষুধ ও জুতাশিল্প, জাহাজ নির্মাণ, ইস্পাত উৎপাদন এবং বর্তমানে নির্মাণ খাতকে প্রভাবিত করেছে। বহুতল ভবন নির্মাণ প্রযুক্তি তো ঢাকা আর চট্টগ্রামের চেহারাই বদলে দিয়েছে।

নতুন প্রজন্মের বেসরকারি ব্যাংক এখন ব্যাংক অর্থায়নের উৎস হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। শিল্প বিনিয়োগে তারাও দিচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদের ঋণ। বেসরকারি ব্যাংকগুলো এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণে স্বাধীন উৎস হিসেবে কাজ করছে। ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। তবে উদ্যোক্তা তৈরিতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও রয়েছে।

উদ্যোক্তা সৃষ্টি এখন আর মেট্রোপলিটন কেন্দ্রগুলোর করপোরেট খাতেই সীমিত নেই। বিভিন্ন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানও (এসএমই) বাংলাদেশজুড়ে নগর ও গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে।

উদ্যোক্তা বিপ্লবে নারীর ভূমিকা

উদ্যোক্তা বিপ্লবে লক্ষণীয় যে সর্বস্তর থেকেই নারী উদ্যোক্তাদের উত্থান ঘটেছে। ১৯৭১-এর আগে এটি ছিল অকল্পনীয়। এমনকি আজকের পাকিস্তানেও তা একপ্রকার অসম্ভবই। এটি তর্কসাপেক্ষ যে এই বিপ্লবের উৎস গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে মুহাম্মদ ইউনূস এবং ব্র্যাকের মাধ্যমে ফজলে হাসান আবেদের ক্ষুদ্রঋণ বিপ্লবে প্রোথিত কি না। ক্ষুদ্রঋণ তেমন কোনো নতুন উদ্যোগ না হলেও গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাকের বিশেষত্ব হলো তাদের ঋণ অর্থায়নের মূল সুবিধাভোগী এবং পরিবারে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হলেন নারীরা। গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্র ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের (এমএফআই) তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও উচ্চপর্যায়ের বেসরকারি সংগঠনে (এনজিও) পরিণত হয়েছে।

এসবের কিছুই সম্ভব হতো না, যদি না গ্রামীণ নারীরা - যাঁদের অধিকাংশ হতদরিদ্র - উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা ও আর্থিক শৃঙ্খলা প্রদর্শন করতে পারতেন। এই গুণ ওই সব নারীকে নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যবসা থেকে আয় করে ঋণ পরিশোধ এবং পরিবারের জীবনমান পরিবর্তনে সক্ষম করেছে। তাই বলে এই ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকাকে প্রয়োজনাতীত বড় করে দেখানো এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ ও গ্রামীণ জীবনের মান পরিবর্তনে জাদুকরী কিছু ভাবা ঠিক হবে না। নারীর জীবনে পরিবর্তন আনতে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও পুরুষশাসিত সমাজের স্বৈরতন্ত্রসহ আরও অনেক কিছু চিহ্নিত করতে হবে। তবে নির্ভরযোগ্য গবেষণার তথ্যমতে, চরম দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনতে, নারীদের মধ্যে উদ্যোগ গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করতে এবং এসএমই খাতে বড় পরিসরে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় ক্ষুদ্রঋণ যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

শিল্প খাতে, বিশেষত বৃহত্তর ব্যবসায়িক খাত ও তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক হিসেবে নারীর আবির্ভাবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। তৈরি পোশাক খাতে ৪০ লাখের মতো নারী এখন কর্মরত। লজ্জাজনক কম মজুরিতে তাঁদের কঠোর পরিশ্রম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্ধমান জটিলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যন্ত্রপাতি চালানোর মতো কারিগরি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এই শ্রেণির সক্ষমতাও করপোরেট বসদের মতোই উদ্যোগের বহিঃপ্রকাশ।

এক প্রজন্ম আগেও ঘরে বন্দী ছিলেন নারীরা। বিনা পারিশ্রমিকে পরিবারে তাঁরা প্রায় সমপর্যায়ের শ্রম দিতেন। তাঁদের জনসমক্ষের বাইরে রাখত সমাজ। কাজেই তাঁদের ঢাকায় এসে কারখানায় কাজ করা ছিল চিরকালের জন্য নরকের টিকিট কাটার মতোই। ওই একই কৃষক পরিবারের মেয়েরা - যাঁদের অনেকেই এখনো অবিবাহিত - আজ বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে আমাদের আরএমজি খাতকে ধরে রাখতে পুরোমাত্রায় ভূমিকা রাখছেন। অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাতের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে নারীকে যেতে হয়েছে সাংস্কৃতিক এক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। গ্রামীণ পরিবারে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে অচেনা-অজানা নগরে জনসমক্ষে জায়গা করে নিতে হয়েছে, যেখানে কিনা তাঁর সামাজিক প্রয়োজন ও সুরক্ষায় খুব বেশি কিছু করা হয়নি। একদিন যা অগ্রহণযোগ্য ছিল, আজ গ্রামীণ ও নগর সমাজ তা গ্রহণ করে নিয়েছে। আমাদের রফতানিশিল্পকে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার বাজারে টিকিয়ে রাখতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করছেন অল্পবয়সী নারীরা। নারীদের এই একক উদ্যোগকে তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার সমমাত্রিক পুরস্কার দিতে আরও অনেক কিছু করা প্রয়োজন।

অভিবাসী শ্রমিকদের উদ্যোক্তাসুলভ ভূমিকা

যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দেখেছেন, উনিশ শতকের বিশের দশকের বাংলার একটি গ্রামীণ চিত্র তাঁদের সামনে ফুটে ওঠে। ছবিটিতে অপুর আকাঙ্ক্ষা ছিল তার বোনকে গ্রাম থেকে দূরের রেলপথের কাছে নিয়ে যাওয়া, যেখান থেকে তারা কলকাতার উদ্দেশে ছুটে যাওয়া যাত্রীবাহী ট্রেন দেখতে পাবে। আজকের বাংলাদেশের অপুদের সঙ্গে তাদের বোনেরা গ্রাম ছেড়ে ট্রেনে চেপে বসছে। তারা কেবল ঢাকায় নয়, কলকাতা, মুম্বাই, করাচি, এমনকি মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্বের সব জায়গায়। আজ বলিভিয়ার জঙ্গল পরিষ্কারক দলে, সৌদি আরবের মরুভূমিতে খামারের কাজে, রোমের সড়কে ঠেলাগাড়ি নিয়ে, নিউইয়র্কে ট্যাক্সি ক্যাব চালনায়, উত্তর ফিনল্যান্ডে রেস্তোরাঁর পরিচারক হিসেবে - পৃথিবীর সব কোণে বাংলাদেশি শ্রমিকের দেখা মেলে। আমাদের নারীরা জর্ডানের তৈরি পোশাক খাতে, আরব উপদ্বীপে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন, নিউইয়র্কের সড়কে বিক্রি করছেন ফল। বাংলাদেশের তরুণেরা নিজেদের গ্রামকে আর নিজেদের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু বা একমাত্র কাজের জায়গা ভাবছেন না। গোটা বিশ্ব যেন তাঁদের কাছে মুক্তা আহরণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে; এবং বাড়ির তুলনায় উন্নত জীবনমানের নিশ্চয়তা দানকারী যে কোনো সুযোগ নিতে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে পাড়ি জমাতে, যে কোনো ঝুঁকি নিতে, যে কোনো মূল্য পরিশোধে তাঁরা প্রস্তুত।

এই তরুণদের সাহস আর উদ্যোগের কারণে বাংলাদেশ বছরে দাপ্তরিক হিসাবে ১ হাজার ৫০০ কোটি মার্কিন ডলার আয় করছে; এ আয় সম্ভবত আরও ৫০০ কোটি ডলার বেশি, যা দাপ্তরিক হিসাবে নেই। এই বৈদেশিক আয় আমাদের বিদেশি ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য এনেছে, মোট দেশজ সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছে, দেশের ভেতরে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করেছে আর দারিদ্র্য দূরীকরণে পালন করেছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্যোগে নতুন প্রজন্ম

বাংলাদেশের স্বাধীন উদ্যোক্তাদের মধ্যে সাম্প্রতিকতম চালকেরা হলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের বিপ্লবী। পারস্পরিক এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের উপায়গুলোয় পরিবর্তন আনছেন তাঁরা। মুঠোফোনের বিস্তৃতির হারের দিক থেকে ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। এটি অকল্পনীয় নয় যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে অধিকাংশ বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হবেন এবং বেশির ভাগ মানুষের কাছে মুঠোফোন, এমনকি স্মার্টফোন, আইপ্যাডের মতো আরও আধুনিক উপকরণ থাকবে।

এ ধরনের সংযোগ ক্রমান্বয়ে আর্থিক সেবাদানকারী শিল্প, জ্ঞানের প্রসারের উপায়, শিক্ষার ধরণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির উপায়গুলোয় পরিবর্তন আনছে। সরকার যেহেতু এ ক্ষেত্রে উৎসাহী, কাজেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবার বিষয়গুলো নিশ্চিত করে রাষ্ট্রপরিচালনায় বড় পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্যমতে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত এরই মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) ৬ দশমিক ২ শতাংশ অবদান রাখছে। তবে এই খাতকে বড় রফতানি শিল্পে পরিণত করা এবং এর সম্ভাবনা ব্যবহার করে দুর্নীতি মোকাবেলা, পরিচালনা প্রক্রিয়াসহ সবক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা ভারতের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছি।

অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন: বাংলাদেশ কূটাভাস

অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামের অংশ হয়ে রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অবমুক্ত হওয়া সর্বস্তরে এই উদ্যোগের উত্থানের একটি মিশ্র ফল তৈরি করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের চিত্র বদলে দিয়েছে এটি। খাদ্য উৎপাদনের হার চার গুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন খাতের বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করছি আমরা, যা

রফতানি খাতে বিস্ফোরক উন্নতিতে অবদান রেখেছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি গত এক দশকে ৬ শতাংশের বেশি বর্ধিত হয়েছে। রফতানি ও রেমিট্যান্স থেকে বৈদেশিক আয় তিন হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও রয়েছে। টাকার মূল্য স্থিতিশীল হয়েছে এবং রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছে বিপুল পরিমাণে, এ কারণে জনগণের ব্যয়ের সক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশ আর বিদেশি সহায়তানির্ভর অর্থনীতির দেশ নেই। বিদেশি সহায়তা এখন জিডিপি'র ২ শতাংশের কম। এই ইতিবাচক সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধারা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মতো মানব উন্নয়ন সূচকগুলোর সঙ্গে খাপ খেয়েছে। এসব অর্জনে নীতি ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের অবদান উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন।

উদ্যোক্তা সক্ষমতা অবমুক্ত করার মাধ্যমে প্রাপ্ত এসব অর্জনের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। আমাদের উন্নয়নের এই অর্জনে জোয়ারের সৃষ্টি হলেও এর সুযোগ নিয়ে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কিছু লোক বড় মাপের দুর্নীতিতেও জড়িয়ে পড়ছে। ঋণখেলাপ, আর্থিক শঠতাসহ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বড় ধরনের অনিয়মের তথ্যও উঠে আসছে। জবরদস্তির মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতা ভুল পথে পরিচালিত উদ্যোগেরও ইঙ্গিত বহন করে।

বলা হয়, উদ্যোগের ভুল পথে গমনের এই চিত্র তথাকথিত বাংলাদেশ কূটাভাসের অংশ, যেখানে উন্নয়নমূলক সাফল্যের পাশাপাশি অসৎ পরিচালনা পদ্ধতি যুগপৎ অবস্থান করার সুযোগ পেয়েছে। এমন একটি পরিবেশে উদ্যোগ শিকারে পরিণত হয়। রানা প্লাজা, তাজরীন গার্মেন্টসের ভয়াবহতা এবং ভূমি ও জলাশয় দখলের মতো বিষয়গুলো কেবল ইতিবাচক অর্জনের জন্যই হুমকি নয়, রাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্যও চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের অশান্ত গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা

আমাদের শাসনসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর উৎস রাজনৈতিক বলয়ের কিছু হতাশাজনক ঘটনা। গণতান্ত্রিক সংহতি যা স্বাধীনতাসংগ্রামকে ত্বরান্বিত করেছে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, তা অর্থনীতির উন্নয়নের তুলনায় অসম কক্ষপথে আবর্তিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ঘাটতি আমাদের উন্নয়ন দক্ষতাকে পূর্ণ সম্ভাবনার চেয়ে পিছিয়ে রেখেছে, অপশাসন প্রশ্রয় দিয়েছে দূর্নীতিকে এবং অসম আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি তৈরি করেছে সামাজিক অসমতা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্রের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাজাত। গণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের মাধ্যমে যে জাতির জন্ম হয়েছে, সে জাতি গণতন্ত্র রক্ষায়

এবং তা শক্তিশালীকরণে প্রতিশ্রুত থাকবে, এটিই প্রত্যাশিত। স্বাধীনতা অর্থনৈতিক সুযোগগুলোর পরিসর বাড়ালেও জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রয়ে গেল। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঐতিহ্যের অনুসরণে ১৬ বছর এই জাতিকে সেনানিবাস থেকে শাসিত হতে হয়েছে। ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৬ আর ১৯৮৮ সালের রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ বা সুষ্ঠু হয়নি, উপরন্তু নির্বাচনগুলো ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার মেয়াদই কেবল বাড়িয়েছে।

১৯৯০ সালে গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্বৈরাচারী এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৯১-এ এই সরকার অপেক্ষাকৃত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেয়। ১৯৯৫-৯৬ সালেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন দেখা যায়। রাজনৈতিক দলগুলোর জোটের প্রধান হিসেবে তিনি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার ফলে ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে সরকারে পরিবর্তন এসেছে।

দুর্ভাগ্যবশত, এই প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ও সরকার পরিবর্তন অপরিহার্যভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে পারেনি। আমাদের নির্বাচিত সংসদ অকার্যকর হওয়ার দিকে ধাবিত হয়েছে, কারণ বিরোধী দলগুলো নিজেদের দাবি আদায়ে ব্যাপকভাবে সংসদ বয়কট করেছে। নির্বাচিত সরকার বিরোধী দলের চ্যালেঞ্জবিহীন শাসন এবং সংসদে আইন প্রণয়ন করতে পেরেছে। লাগামহীন নির্বাহী ক্ষমতার বিপরীতে তুলনামূলক মুক্ত গণমাধ্যম, সুশীল সমাজের কিছু কণ্ঠস্বর এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুতির ভয়ের কারণে কিছুটা হলেও ভারসাম্য ছিল।

এই ক্ষমতাচ্যুতির আতঙ্কের কারণে বিএনপি ২০০৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার মধ্যে কারসাজি করে, যা আরেক দফা রাজনৈতিক সংঘাতের জন্ম দেয়। এই পরিস্থিতি সেনানিবাস থেকে সামরিক নেতৃত্বে দুই বছরের শাসনের সূচনা ঘটায়। সৌভাগ্যবশত সেনা সমর্থিত সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপেক্ষাকৃত অবাধ নির্বাচনের আয়োজন করে, যাতে বিজয়ী হয়ে ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসে। পাকিস্তানে ১৯৫৮ ও ১৯৬৯ সালে এবং বাংলাদেশে ১৯৭৫ ও ১৯৮২ সালে যেমনটি হয়েছিল, তার বিপরীতে গিয়ে সেনাবাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে সেনানিবাসে ফিরে যায়।

সেনানিবাসভিত্তিক এই শাসনব্যবস্থার পরিণতি ভালো হয়নি, যা বড় দু'টি রাজনৈতিক দলে সংস্কার ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের প্রবল চেষ্টা করেছিল, যা অবিবেচক ও অবাস্তবায়নযোগ্য

বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের সংস্কৃতির রাজনীতিতে নেতৃত্বের পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় হতে পারে, বাইরের চাপে নয়। সেনানিবাসের যে নেতৃত্ব এই সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। তবে এই অধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে আরও ঝুঁকির মুখে ফেলে দেয়। ২০১১ সালে সেই একই দল - যারা ঐতিহাসিকভাবে কারচুপির নির্বাচনের শিকার হয়েছে এবং ১৯৯৪/৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করেছে - তারাই সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচনের এই ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সাম্প্রতিকতম এই অধ্যায়ের ফলাফল আমরা জানি। ২০১৪-তে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রধান বিরোধী জোট বর্জন করেছিল। ক্ষমতাসীন জোট আবারও ক্ষমতায় আসে, তবে মোট ভোটারের একটা অংশের ভোট পেয়ে। অর্ধেকের বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ায় কোনো ভোট ছাড়াই এই জোটের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এই নৈরাশ্যজনক ফল হয়তো বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের নির্বাচন বর্জনের কারণে হয়েছে এবং এই বর্জনকে টিকিয়ে রাখতে অগ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সহিংসতা হয়েছে। এই রাজনৈতিক নাটকের ফলে গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেট দুর্বল হয়ে পড়েছে।

এটি অনিশ্চিত যে কবে, কীভাবে ক্ষমতাসীন দল আমাদের অবাধ, সুষ্ঠু এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়া ফিরিয়ে দেবে, আদৌ দেবে কি না। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আওতায় ২০১৮ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিএনপি ও তার মিত্র দলগুলো এই ব্যবস্থা চ্যালেঞ্জ করতে পারবে বলে মনে হয় না। কারণ, রাজনৈতিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়া এই দল সাংগঠনিকভাবেও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। বড়জোর সব দল ও ভোটাররা অপেক্ষাকৃত বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন (ইসি) নির্বাচনের আয়োজন করবে বলে আশা করতে পারে।

ক্ষমতাসীন দল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করে যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, তার উপর ভর করে অপেক্ষাকৃত অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচনে বিজয় পাওয়ার ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস আছে কি না, তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তবে মনে রাখতে হবে, জাতীয় পর্যায়ের এসব অর্জন সংসদীয় পর্যায় পর্যন্ত না-ও পৌঁছাতে পারে। প্রতিটি সংসদীয় আসনে ক্ষমতাসীন সাংসদকে কেবল বিরোধীদের চ্যালেঞ্জই মোকাবেলা করতে হবে না, একই সঙ্গে নিজের

দলের ভেতরকার প্রতিযোগিতাও মোকাবেলা করতে হবে। এসবই হবে ক্ষমতাসীন দলের সামনে চ্যালেঞ্জ।

যেসব পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত

আমরা যদি আমাদের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালনকারী সমৃদ্ধ উদ্যোক্তাসুলভ সম্পদগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে নিজেদের অর্জনগুলোকে আর ততটা ছোট বলে মনে হবে না। শাসনসংক্রান্ত সংকট এখানে উদ্যোগের গতিরোধ করতে পারেনি বটে, তবে তা আমাদের ব্যয় বাড়িয়েছে, ফললাভে ঘাটতি পড়েছে। আমরা যদি বাংলাদেশকে এমন এক সম্ভাবনার দেশে রূপান্তর করতে চাই, যে দেশ চীনের সঙ্গে না হোক, অন্তত ভিয়েতনামের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, তাহলে শাসনের ক্ষেত্রে আমাদের এসব ঘাটতি পূরণ করতে হবে। আরেকটি ভিয়েতনাম হয়ে ওঠার স্বপ্নকে অতিক্রম করে আমাদের যদি আরও দূরে যেতে হয় এবং মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র নির্মাণ করতে হয়, তাহলে বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলি অর্গলমুক্ত করতে হবে। এসব প্রস্তাবকে দু'টি শিরোনামের অধীনে আনা যায়: রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক।

রাজনৈতিক ক্ষেত্র

রাজনৈতিক ও জনপর্যায়ে আমাদের মতামত গড়ে তুলতে হবে, যাতে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত হয়। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে হবে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে। সব রাজনৈতিক পক্ষের অংশগ্রহণ এখানে নিশ্চিত করতে হবে। একটি প্রকৃত স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠনের পক্ষে জনমত তৈরি করতে হবে। রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাছাই করতে হবে এ কমিশন, যাতে এটি সর্বজনীন বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে পারে। নির্বাচনী ও রাজনৈতিক দল পরিচালনার ব্যয় সরকারি তহবিল থেকে মেটানো হবে, তবে তাতে পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে, যাতে সরকারি ও বেসরকারি ব্যয়ের তথ্য যে কেউ চাইলেই পেতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলো প্রার্থী বাছাই এমনভাবে করবে, যাতে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার কাঠামোয় সরাসরি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ৫০ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব অর্জিত হয়। সংসদে কৃষক ও শ্রমজীবী শ্রেণির জোরালো প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও আনুপাতিক হারে নিশ্চিত করার ব্যাপারে জনমত তৈরি করতে হবে। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো যদি বাদ পড়া জনগোষ্ঠীগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে

ব্যর্থ হয়, সে ক্ষেত্রে এসব জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর ধারণ করতে সক্ষম রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন পড়তে পারে।

অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি

বঞ্চিত গোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে এসব গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় এনে তাদের সম্মিলিত শক্তিমত্তা বৃদ্ধির মাধ্যমে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের টেকসই উদ্যোগের অনুপস্থিতিতে এ ধরনের বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত কর্মসূচি জরুরি। তবে এটি কোনো কাঠামোগত সমাধান নয়।

সামাজিক অবিচার প্রতিরোধ করতে হলে আমাদের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ক্ষুদ্র কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং অন্যান্য সম্পদহীন গোষ্ঠীর সম্মিলিত শক্তিমত্তাকে সংহত করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা বাজারে বৃহদায়তন উদ্যোগগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে এবং বাজারের উপরের স্তরে প্রবেশের সুযোগ পায়।

শ্রমজীবী মানুষ, বিশেষত তৈরি পোশাকশিল্পের শ্রমিকেরা যাতে শেয়ার মালিকানার অধিকারবলে নিজ নিজ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশীজনে পরিণত হওয়ার সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

দিনমজুর, রিকশাচালক, ঝাড়ুদার, মাঝি ইত্যাদি ক্ষুদ্র পর্যায়ের সেবাদাতাদের এমনভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে তাঁরা বাজারের প্রতিযোগিতায় শামিল হতে পারেন। ঢাকায় আমাদের রিকশাচালকদের মালিকানায় এমন একটি করপোরেট প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে হবে, যাদের অধীনে থাকবে রিকশার বিশাল এক বহর। আধুনিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এ করপোরেট প্রতিষ্ঠানের থাকবে ব্যাংকঋণের সুযোগ, আইনি সেবা ও স্বাস্থ্য বিমা।

প্রবাসী শ্রমিকদের ক্ষমতাহীন ব্যষ্টি থেকে রূপান্তর ঘটিয়ে বিদেশে সেবা রফতানিকারক বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারে পরিণত করতে হবে, যাতে মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রতারণার হাত থেকে তাঁরা রক্ষা পান।

বৃহদায়তন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে তারা উপরের নতুন ধারার উদ্যোগগুলোকে অর্থায়ন করতে পারে।

গণতন্ত্র: সমাজ গঠনের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসন

জবাবদিহিবিহীন শাসন দুর্নীতি ও অদক্ষতাকে উৎসাহিত করে। তাই ভালো শাসন নিশ্চিত করতে হলে জবাবদিহি বাড়াতে হবে। এ জন্য যেসব সাংসদ ভোটারদের কাছে দেওয়া তাঁদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না বা অপকর্ম করেন, তাঁদের সাংসদ পদ রি-কলের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা পৃথিবীর কিছু দেশ করেছে। গণমাধ্যমের টেকসই স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের পদে আসীনদের নাগরিক, ভোটার ও সেবাগ্রহীতাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ব্যক্তি খাতের করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের শেয়ারহোল্ডার/জামানতকারী ও ক্রেতার কাছে জবাবদিহি থাকতে হবে।

পরিপূর্ণ জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হলে তথ্যের অধিকারকে আরও শক্তিশালী ও বিশদ করতে হবে। ইন্টারনেট/ওয়েব প্রযুক্তির সহায়তায় সরকারি তহবিলের ব্যয়ের হিসাবনিকাশ জনসমক্ষে তুলে আনতে হবে। এর মধ্যে থাকবে সব ধরনের টেন্ডার ও দরপত্রের নথি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার তথ্য এবং জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন সব ধরনের সরকারি ফাইল। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনগণ চাইলেই যে কোনো মন্ত্রী, সাংসদ, স্থানীয় কর্মকর্তা, সরকারি কর্মী প্রমুখের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও করের তথ্য দেখতে পাবেন।

উপসংহার

যেসব প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো কঠিন মনে হতে পারে। তবে আমার প্রস্তাবগুলো সম্ভব বলে মনে হয় কেবল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে লুকায়িত বিপুল সম্ভাবনার কারণে। এই সম্ভাবনার অনেকখানি প্রকাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের জীবনমানের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়নের মাধ্যমে। চরম বৈরী পরিস্থিতিতেও এ অর্জন সম্ভব হয়েছে।

আমাদের যে মানবসম্পদ আছে, তা কেবল পরিবর্তনের বিপুল সম্ভাবনাই ধারণ করছে না, আমাদের উদ্যোক্তারা এক বিশাল গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে, যারা পুরাতনের শিকল খুলে ফেলে কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রণোদনা গ্রহণ করতে উদগ্রীব। এই

গোষ্ঠীকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে এবং সমাজ পরিবর্তনের উপকরণ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

(৩০ জানুয়ারি ২০১৭ সালে প্রদত্ত 'বাংলাদেশের পার্মানেন্ট লিবারেশন স্ট্রাগল: কন্সট্রাকটিং এন্ড ইনক্লুসিভ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি' শিরোনামে জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক স্মারক বক্তৃতার সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ।)

২৬ মার্চ ২০১৮
প্রথম আলো

গণতন্ত্রের গাড়ির সব চাকাই সচল রাখতে হবে

রওনক জাহান

আজ ২৬ মার্চ, স্বাধীনতার ৪৭ তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের এই দিনে বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই শুরু করেছিল, যা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পায়। এর আগে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখন স্বাধীনতা বলতে শুধু যে পাকিস্তানি শাসনকাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছিল তা-ই নয়, সেই ভাষণে ছিল সার্বিক অর্থেই বাংলাদেশ রাষ্ট্র এবং তার প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রত্যয়।

৪৭ বছর পর আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখার সময় এসেছে, সেই সার্বিক অর্থে স্বাধীনতা আমরা কতটুকু অর্জন করেছি, কতটুকু করতে পারিনি। প্রথমেই স্বীকার করতে হবে, গত ৪৭ বছরে আমরা যে অর্জন শুধু অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই করেছি তা নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমাদের অনেক অর্জন আছে, যা আমরা অনেক সময়ই আলোচনা করি না।

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসনের ২৩ বছরের মধ্যে বেশির ভাগ সময় আমরা ছিলাম সামরিক শাসনের আওতায়। অন্যদিকে বাংলাদেশের ৪৭ বছরের বেশির ভাগ সময় বেসামরিক নির্বাচিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি আমরা। আমাদের দেশে সামরিক শাসকেরা পনেরো বছর সরাসরি এবং দুই বছর পেছন থেকে দেশ শাসন করেছেন। একটি দেশ গণতান্ত্রিক কি না, তার একটি মানদণ্ড হলো দেশটির রাষ্ট্রক্ষমতা কার হাতে রয়েছে - সামরিক বাহিনীর হাতে, না বেসামরিক নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে? এই মানদণ্ড ব্যবহার করলে বলতে হয় বাংলাদেশে গণতন্ত্রের কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছে।

দ্বিতীয় যে অর্জন তা হলো আমাদের শাসকবর্গ, সামরিক কিংবা বেসামরিক এবং জনগণ উভয় পক্ষের কাছে এটি আজ প্রতীয়মান যে নির্বাচনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে হবে এবং টিকে থাকতে হবে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ১০ বছর পর ১৯৫৮ সালের জাতীয় নির্বাচন ঠেকাতে সেখানে সামরিক বাহিনী শাসনভার গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালে প্রথম জাতীয় নির্বাচন হয়, কিন্তু তার ফলাফলও পাকিস্তানি শাসকবর্গ মেনে নেয়নি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তারা গণহত্যার পথ বেছে নেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পাঁচ বছরের মধ্যেই সামরিক বাহিনী হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেও ১৯৯১-এর পর থেকে আর তারা সেভাবে ক্ষমতা দখলের সাহস দেখায়নি। নির্বাচনই যে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র পন্থা, সে ব্যাপারে আমাদের দেশে একটি ঐকমত্য গড়ে উঠেছে। আর নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে আগ্রহ-উৎসাহও বেড়েছে। এটিও আমাদের আরেকটি অর্জন।

আমাদের তৃতীয় অর্জন নাগরিক অধিকার ও নাগরিক কণ্ঠস্বর। পাকিস্তান আমলে এই অধিকার একেবারেই সংকুচিত ছিল। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের নতুন যাত্রার পর বাংলাদেশে গণমাধ্যমের প্রসার ঘটতে থাকে। আগে যেখানে একটিমাত্র সরকারি বেতার-টিভি ছিল, সেখানে এখন অনেকগুলো বেসরকারি টিভি ও রেডিও আছে। বিশ্বব্যাংক, ফ্রিডম হাউসসহ বিভিন্ন সংস্থা জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে গণমাধ্যমকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের শক্তিশালী উপাদান হিসেবে দেখছে। সাম্প্রতিক কালে সামাজিক যোগাযোগ ও ইন্টারনেটের মাধ্যমেও জনমত প্রতিফলিত ও প্রকাশিত হচ্ছে। চাইলেই কেউ এসব বন্ধ করে দিতে পারেন না।

তবে এসব অর্জনের পাশাপাশি আমাদের অনেক ব্যর্থতাও রয়েছে। প্রথম ব্যর্থতা হলো নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য গড়ে তুলতে পারিনি। নির্বাচিত দলের অধীনে নির্বাচন করতে বিরোধী দল চায় না। তারা অভিযোগ করে, যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্বাচনের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ দক্ষিণ এশিয়ার অপর তিনটি দেশ ভারত, শ্রীলঙ্কা ও নেপাল নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ধারা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলো সামরিক শাসকেরা ক্ষমতায় থাকতে যে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতেন, গণতান্ত্রিক আমলেও আমরা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারিনি। ১৯৯৪-৯৫ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের ফলে ১৯৯৬ সালে সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা চালু করা হয়। সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থায় তিনটি নির্বাচনও হয়েছিল, যার ফলে আওয়ামী লীগ ও

বিএনপি'র মধ্যে ক্ষমতার পালাবদলও হয়। কিন্তু ২০০১ সালের পর থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকেও দলীয়করণ করার প্রচেষ্টা করা হয়, যার ফলে দুই বছরের জন্য দেশ একটি সেনাসমর্থক সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সরকারই ২০০৮ সালের নির্বাচনের ব্যবস্থা করে, যার মাধ্যমে আবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু তারপর ২০১১ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধান থেকে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিল করার পর নির্বাচনী ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আর মতৈক্যে পৌঁছাতে পারল না। ২০১৪ সালে যে নির্বাচন হয়, তাতে বিএনপিসহ অনেক দলই অংশ নেয়নি এবং ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীরা জিতেছেন। এ কারণে দশম সংসদের নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা হারায়। আমরা আরেকটি সংসদীয় নির্বাচনের সম্মুখীন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের দুই পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনব্যবস্থার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেনি। আগামী নির্বাচন কীভাবে নিরপেক্ষ এবং সব দলের সমান অংশগ্রহণমূলক করা যাবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। নির্বাচনব্যবস্থা এবং নির্বাচনের ফলাফলকে আমরা কেমন করে সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলব, তা আমাদের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

আমাদের দ্বিতীয় ব্যর্থতা, আমরা আমাদের নাগরিক অধিকারকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। ব্যক্তিস্বাধীনতা, মিডিয়ার স্বাধীনতা, নাগরিক সমাজের স্বাধীনতা প্রায়ই নানা রকমভাবে সংকুচিত হচ্ছে। কিছু হচ্ছে আইনের মাধ্যমে, কিছু হচ্ছে নানা রকম ভয়ভীতির মাধ্যমে। যখন ভয়ের সংস্কৃতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করে, যা আমরা ইদানীং লক্ষ্য করছি, তখন আলোচনা, বিতর্ক, ভিন্নমত পোষণ করা, যা গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমাদের তৃতীয় ব্যর্থতা, আমাদের দেশে নির্বাচনী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি পরম সংঘাতময় রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে। জয়ী ব্যক্তিরা বিজিতদের প্রতি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক আচরণ করছেন। বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মী জেলে যাচ্ছেন কিংবা মামলায় পড়ছেন। 'আমাদের বিজয়ী দল সব পাবে' এই রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে দল হারছে, তারা প্রায় সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। সংঘাতের রাজনীতির ফলে দুই প্রধান দলের মধ্যকার বিরোধ কখনোই রাজনৈতিক সংলাপের মধ্য দিয়ে সমাধান করা যাচ্ছে না। রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু একটি ব্যবস্থা সব দলকেই মানতে হবে, যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সেই মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা যায়।

আমাদের চতুর্থ ব্যর্থতা, আমরা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে পারিনি। যদিও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে চারটি সংসদ - যেমন পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম সংসদ নির্বাচিত হয়েছিল, কিন্তু বিরোধী দল সেই সব সংসদ বর্জন করেছে এবং রাজপথে আন্দোলন করে নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দিয়েছে। সংসদে একটি কার্যকর বিরোধী পক্ষের অভাবে আমরা সরকার প্রক্রিয়ার ভেতরে কোনো রকম ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি, যা গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম খুঁটিয়ে দেখা এবং এর জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হলো জাতীয় সংসদ। সংসদীয় তদারকির অভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাহী বিভাগ উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে।

আমাদের পঞ্চম ব্যর্থতা, আমরা আইনের শাসন কোনো দিনই প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। দলীয়করণের প্রচেষ্টার কারণে জনসাধারণের মনে জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, নিম্ন আদালতের প্রতি তেমন আস্থা নেই। দেশে-বিদেশের বিভিন্ন জরিপে আমাদের এই দুর্বলতা প্রতীয়মান।

১৯৯১ সালে গণতন্ত্রের নবযাত্রার পর থেকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি করেছে। বর্তমানে সেই ধারা আরও জোরদার হয়েছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও উন্নতি হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে। এর পেছনে সরকারের যেমন অবদান আছে, তেমনি ব্যক্তি মানুষেরও উদ্যোগ রয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন টেকসই করতে হলে আমাদের সুশাসন ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হবে। সুশাসন, বিশেষ করে আইনের শাসন এ জন্য প্রয়োজন যে আইন ঠিকমতো কাজ করলে দেশের মানুষ একধরনের স্বস্তি বোধ করে। ভাবে, আইন মেনে চললে তাদের কোনো ভয় নেই। আর আইনের শাসন না থাকলে অথবা ব্যত্যয় ঘটলে সমাজে অস্থিরতা ও ভয়ভীতি বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। কারণ, কেউ তখন দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বা উদ্যোগ নিতে চান না।

১৯৯১ সালের পর থেকে আমরা কেবল নির্বাচনী গণতন্ত্রটাকেই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু নির্বাচন ছাড়াও গণতন্ত্রের অন্যান্য উপাদান আছে, যেমন মানবাধিকার এবং আইনের শাসন। এগুলো শক্তিশালী না হলে নির্বাচনী গণতন্ত্রও ঠিকমতো চলবে না। আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের একটি দুর্বলতা হলো নির্বাচনী রাজনীতিতে এলাকার রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ নির্মাণ ইত্যাদি বিষয় প্রাধান্য পায়। দল ও প্রার্থীকে এসব ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। তাই নির্বাচনী প্রচারে এলাকার উন্নয়নের ব্যাপারটা যত

গুরুত্ব পায়, ততটা পায় না সার্বিক গণতন্ত্রের উন্নয়ন বা সুশাসনের কথা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচরণ কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো টেকসই করা যাবে, সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা উপেক্ষিতই থেকে যায়। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আর আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির উন্নতি কিংবা রাজনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ কথাবার্তা শুনিনি।

কিন্তু আমরা যদি সব দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং নির্বাচন করতে চাই, তাহলে আমাদের সেই আলোচনা প্রথমে করতে হবে আমরা কীভাবে সব দলের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আচরণ প্রতিষ্ঠা করতে পারব। গণতন্ত্রকে আমাদের একটি চার চাকার গাড়ির মতো ভাবতে হবে। এর একটি চাকা নির্বাচন। অন্য তিনটি চাকা হচ্ছে মানবাধিকার, আইনের শাসন ও নাগরিক কণ্ঠস্বর। এক চাকায় গাড়িটি চলবে না, সব ক'টি চাকাই সুষ্ঠুভাবে চলতে হবে। তাহলেই গণতন্ত্রের গাড়িটি সামনে এগোবে।

২৬ মার্চ ২০১৮
প্রথম আলো

শিশুদের বিপ্লব থেকে কী শিখলাম?

রেহমান সোবহান

ছোট ছোট ছেলেমেয়ে সপ্তাহখানেকের আন্দোলনেই আমাদের হৃদয়ে আশার পুনর্জাগরণ ঘটিয়ে দিয়ে গেছে। তারা আমাদের মনে এই বিশ্বাস আবার জাগিয়ে তুলেছে, হয়তো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিরাপদ হাতেই রয়েছে।

এখন এমন একটি সময় চলছে, যখন দেশের শাসনব্যবস্থার দুর্দশা দেখে বড়রা নির্বিকার ও নেতিবাচক অবস্থায় চলে গেছে। এ রকম একটি সময়ে এই শিশু-কিশোরেরা অন্যায়ের শিকার হয়ে আপন সমস্যা সমাধানে বড়দের মুখের দিকে চেয়ে থাকার প্রথাগত ধারণাকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা অসম সাহস নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। দীর্ঘদিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিষয় যে সড়ক নিরাপত্তা, সেটি নিয়ে তারা যে শুধু স্লোগান দিয়েছে তা-ই নয়, এ সমস্যা সমাধানে কী কী করতে হবে, তা তারা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। রুগ্ন শাসনব্যবস্থায় সংস্কার আনার ক্ষেত্রে শিশুদের এই আন্দোলনকে আমাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ছিল। কিন্তু তার বদলে রক্তক্ষয় ও অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে যেভাবে এর সমাপ্তি ঘটল, তা আমাদের সবার জন্য এক নিদারুণ অস্বস্তির বিষয় হয়ে থাকল।

গোড়াতে আমরা সবাই আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে সরকারের, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীর নম্র ও সহানুভূতিশীল প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। তখন আমাদের সবার মনে বিশ্বাস হচ্ছিল, এই শিশুরা আসলেই অনুসরণীয় এক মহা বার্তা বয়ে এনেছে। তাদের এই বার্তা অনুসরণ করে আমরা গোটা শাসনব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি আমলে নিয়ে সামনে এগোতে পারব।

শিশুদের এই মহতী উদ্যোগের সঙ্গে বিশদ পরিসরে বয়স্ক ব্যক্তিরা অর্থপূর্ণ একাত্মতা প্রকাশ করতে পারতেন। সরকারের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নাগরিক সমাজের জ্যেষ্ঠ নেতারা রাস্তায় নেমে প্রতীকীভাবে তাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করতে পারতেন। বছরের পর বছর উপেক্ষা করে আসা সড়ক নিরাপত্তা আইন সংস্কার ও তা কার্যকর করতে তাঁরা কী কী উদ্যোগ নিচ্ছেন, তা তাঁরা তুলে ধরতে পারতেন। তাতে শিশু-কিশোরেরা আশ্বস্ত হতে পারত। তাদের মনে এই বোধ জন্ম নিত যে তাদের আন্দোলন একেবারে নিষ্ফলা হয়নি; তখন তারা শান্তিমতো ক্লাসে ফিরতে পারত। তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্ম নিত যে তাদের দাবি বাস্তবায়নে বড়দের সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উপর ভরসা করা যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে অশুভ অপচ্ছায়ার মতো অস্ত্রধারীরা যেভাবে সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করেছে এবং সহিংসতা ছড়িয়েছে, তাতে আমাদের জন্য আশাবহ একটি নতুন অবস্থা তৈরি হবে - এমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে তাদের ঘরে ফেরা কঠিন ছিল।

আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকা অপশাসনের কারণে এই তরুণেরা ভবিষ্যতে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে অথবা তারা তাদের গর্বিত অথচ উদ্বিগ্ন বাবা-মায়ের কাছে কী বার্তা নিয়ে ফিরে যাবে, আমি তা আন্দাজ করতে পারছি না। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, এই শিশুদের আন্দোলনে যে একেবারে কোনো লাভ হয়নি, তা নয়। এই আন্দোলনের জের ধরেই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরকার সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ-সংক্রান্ত আইনের খসড়া আলোচনার টেবিলে তুলেছে। এ আইনটির খসড়া সাত বছর ধরে স্থবির হয়ে পড়ে ছিল।

অমনোযোগী ড্রাইভিংয়ের জন্য সংঘটিত বহুল আলোচিত সড়ক দুর্ঘটনায় নন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক তারেক মাসুদ ও বিখ্যাত সাংবাদিক মিশুক মুনীরের মৃত্যুর পর আইনটির খসড়া তৈরি করা হয়। ওই ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার পর একইভাবে সারা দেশে বিক্ষোভ হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে তাড়াহুড়ো করে মূল আইনটি বানানো হয়েছিল। কিন্তু দিন শেষে দেখা গেল, ক্ষমতাধর মন্ত্রীদের নেতৃত্বে থাকা পরিবহনমালিক ও শ্রমিক ফেডারেশনগুলোর চাপের মুখে সেই আইন সিন্দুকবন্দী করে রাখা হলো।

আমাদের ছেলেমেয়েরা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেই সিন্দুক খুলে বিলটি বের করে এনেছে এবং শিগগিরই বিলটি পাসের জন্য পার্লামেন্টে ভোটে যাবে। এর জন্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। দেশের স্বার্থে, বিশেষ করে দেশের শিশুদের স্বার্থে তাঁর এই পদক্ষেপের জন্য তাঁকে অভিবাদন জানাতে হবে। এ আইনটির সম্ভাবনার বিষয়ে যতই সীমাবদ্ধতা থাকুক না কেন, এটি যে বিধিবদ্ধ হয়েছে,

সেটিই ইতিবাচক অর্জন বয়ে আনবে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের অন্যান্য আইনের মতো এ আইনটির মূল্য অধিকতর প্রতিষ্ঠা পাবে তখন, যখন এটিকে শুধু ঘোষণায় আটকে না রেখে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বহু বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝেছি, প্রথম কোনো কারণে এ ধরনের আইন তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কিংবা কেন বেশির ভাগ আইনই কদাচিৎ যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে - সেসব ভালোভাবে না জেনেই আমরা আইন প্রণয়ন বা পুনর্লেখনে মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করি।

লক্ষণীয় হলো, এই দেশে আইন কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার বিষয়ে রাষ্ট্রের অক্ষমতার বিষয়টি আমাদের শিশুরা এই অল্প বয়সেই বোঝার মতো প্রগাঢ় অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করতে পেরেছে। তারা এমন এক অভিজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে, যা বেশির ভাগ বড়রা দায় এড়ানোর জন্য এত দিন পাশ কাটিয়ে এসেছেন।

এই ছেলেমেয়েরা তাদের আন্দোলনে যে প্রধান স্লোগান আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে তা হলো, ‘আমরা ন্যায়বিচার চাই’ ও ‘সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখিত, রাষ্ট্র মেরামতের কাজ চলছে’। তারা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, অল্প কিছুসংখ্যক অদক্ষ ও দায়িত্বজ্ঞানহীন চালকই মূল সমস্যা নন, এই সমস্যা আরও গভীরে প্রোথিত। ত্রুটিপূর্ণ শাসনব্যবস্থাই এই সমস্যার মূল উৎস। শিশুরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, আমাদের সরকারব্যবস্থার নজরদারি ও জবাবদিহির অভাব আতঙ্কজনক মাত্রায় নেমে এসেছে। চালকেরা বৈধতার কাগজপত্র ছাড়াই গাড়ি চালাতে পারেন; কারও কাছে যদিও বা কাগজ আছে কিন্তু তাঁদের পেশাগত দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ, যথাযথভাবে পরীক্ষা দেওয়া ছাড়াই তাঁরা টাকাপয়সা দিয়ে বা অন্য কোনো কায়দায় এসব কাগজপত্র জোগাড় করেছেন।

আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে একটি আইন সবার জন্য প্রযোজ্য হয় না। যুগের পর যুগ এই পক্ষপাতমূলক নীতির উপর দাঁড়িয়ে আমাদের আইনের শাসন পরিচালিত হচ্ছে। এই চিরন্তন সত্যটি আমাদের ছেলেমেয়েরা সবার সামনে উন্মোচন করে দিয়েছে। একটি বিষয় আমরা সবাই জানি এবং বলা যায়, যা আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। সেটি হলো, যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ভবন নির্মাণবিধি অথবা ঋণের অর্থ পুনরুদ্ধার করতে যেসব আইন রয়েছে, তা ঠিকমতো প্রয়োগ করা হয় না। একেকজনের ক্ষেত্রে একেকভাবে আইন প্রয়োগ করা হয়। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের চাকরির প্রথম দিন থেকেই একচোখা বিচারের বিষয়কে আত্মস্থ করে ফেলেন। ফলে সবার সামনে আইন লঙ্ঘন করার পরও যখন কাউকে ছাড় দেওয়া হয়, তখন

আমরা বুঝে নিই এই আইন ভঙ্গকারী ব্যক্তি রাজনৈতিক সুবিধাপ্রাপ্ত ক্ষমতাধর লোক, সুতরাং আইন তাঁর জন্য অন্যদের মতো প্রযোজ্য নয়; তিনি ছাড় পেতেই পারেন।

অসহায় শিক্ষার্থীদের উপর হেলমেট পরে লাঠি হাতে যেসব যুবক হামলা চালিয়েছেন, তাঁদের পরিচয় নিয়ে কিছু জননেতা অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকেই এসব দুর্বৃত্তকে তাঁদের ভালো করে চেনার কথা। আমার রাজনীতিসংশ্লিষ্ট স্মৃতি থেকে বলতে পারি, অর্ধশতক আগে পাকিস্তান আমলে যখন আইয়ুব খানের শাসন চলছিল, তখন আমরা এই ধরনের অপরাধীদের সহজেই শনাক্ত করতে পারতাম। যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন এসব লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন না, তখন সহজেই বোঝা যায়, তাঁরা শাসক দলের সহযোগী। আজকের মন্ত্রিসভার সদস্য রাশেদ খান মেনন, মতিয়া চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, নুরুল ইসলাম নাহিদ, হাসানুল হক ইনু - তাঁরা সবাই আইয়ুব আমলে ছাত্রনেতা ছিলেন। তাঁরা ভালো করেই জানেন, পাকিস্তান আমলে আমাদের ক্যাম্পাসগুলোতে কীভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এনএসএফ) ছেলেরা দাপিয়ে বেড়াত। গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের জন্য যখন তখনকার বীরোচিত ছাত্রনেতারা আন্দোলন-সংগ্রাম করতেন, তখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে এনএসএফের কর্মীরা যুক্ত হয়ে তাঁদের উপর হামলা করতেন। সহিংসতা ছড়াতেন। আমাদের এই নেতারা তাঁদের ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বহু আগেই জেনেছিলেন, এনএসএফ সদস্যরা যত বড় অন্যায়ই করুন না কেন, সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে না।

একই ধরনের ঘটনা এরশাদ এবং বিএনপি'র আমলে দেখা গেছে। তখনো আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা হয়েছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পুলিশ যখন নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে, তখন বোঝা গেছে, ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা ছাড়া আর কারও পক্ষে এভাবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপর চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

পাল্টা আঘাতের মুখে পড়লে নিজেদের বাঁচাতে এই গুন্ডাপান্ডাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা দরকার হয়। নিজেদের কুকীর্তি থেকে দায়মুক্তি পাওয়ার জন্যও তাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দরকার হয়। এমনকি প্রকাশ্য দিবালোকে সংবাদ মাধ্যমকর্মীদের সামনে সহিংসতা চালানোর পরও সাজা এড়ানোর সুযোগ পেতে তারা এসব সংস্থার উপর নির্ভর করে। ক্ষমতাসীন যে রাজনীতিকেরা একসময় গুন্ডাদের দা এবং পুলিশের লাঠির সামনে আন্দোলন করেছেন, তাঁদের সেই অতীত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, যখন দুর্বৃত্তরা পুলিশের সামনে যাকে-তাকে হেনস্তা করে, তখন তাদের আসল পরিচয় কী। একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সহিংসতায় নিয়ে

যাওয়া দুর্বৃত্তদের পরিচয় নিয়ে যে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল, তা সহজেই দূর করা যেতে পারত। যখন আমরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সশস্ত্র গুন্ডাদের মিশে গিয়ে ছাত্রদের উপর হামলা চালাতে দেখেছি, তখনই প্রমাণিত হয়েছে, তারা ক্ষমতাশালীদের ঘনিষ্ঠ। তারা মুখোশ পরা নাকি হেলমেট পরা ছিল, সেটি আর তখন দেখার বিষয় থাকেনি।

এরপর আমরা দেখলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। দুঃখজনক হলো, ক্যামেরায় যাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর হামলা চালাতে দেখা গেছে, তাদের একজনকেও আটক করা হয়নি। এর আগে একইভাবে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের উপর ক্ষমতাসীন দলের সংশ্লিষ্ট লোকজনকে হামলা করতে দেখা গেছে। এসব সহিংসতা জনগণের স্মৃতিতে গেঁথে আছে। বেছে বেছে শুধু এই ছাত্র-ছাত্রীদের (যাঁদের অনেকেই হামলার শিকার হয়েছেন) বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা প্রচ্ছন্নভাবে অন্যায় বলে সবার সামনে প্রতীয়মান হচ্ছে।

আমরা এর আগেও দেখেছি, যখনই কোনো গণ-আন্দোলন হয়, সেই মুহূর্তে নানা ধরনের খেলোয়াড় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। স্মরণাতীতকাল থেকে বিরোধী দলগুলো এ ধরনের আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করে থাকে। অতি জনগুরুত্বসম্পন্ন ইস্যুগুলোকেও তারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কোনো শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনকে কোনো দুর্বল রাজনৈতিক দল তাদের দুর্বলতর সাংগঠনিক দক্ষতা দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে সরকারের সর্বশেষ নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে সাইবার কার্যক্রমের জের ধরে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগের জগৎ এমনই এক নতুন জগৎ, যার সঙ্গে আমার একেবারেই জানাশোনা নেই। আমার কোনো ফেসবুক অ্যাকাউন্টও নেই, এটি কীভাবে কাজ করে, সে বিষয়ে আমার পরিষ্কার ধারণাও নেই। তবে আমি এটুকু জেনেছি, একুশ শতকে যোগাযোগ ও তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এটি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চেয়েও অনেক শক্তিশালী মাধ্যম। এই সাইবার জগতে সরকারের প্রতিটি কাজ ও উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হয়।

এ অবস্থায় সরকারের মাথায় রাখা উচিত, দেশের সব নাগরিক এবং সব ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তার বন্ধু নয়; সবাই শত্রুও নয়। তারা নানা ধরনের মন্তব্য করবে। কিছু সরকারের পক্ষে, কিছু বিপক্ষে যাবে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই খবর তৈরি করে না; তারা খবর আদান-প্রদান করে। সরকারের মাথায় রাখা উচিত, তার এমন কিছুসংখ্যক সমালোচক আছেন, যাঁদের সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রম নিয়ে মন্তব্য করার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যকে সর্বোচ্চসংখ্যক শ্রোতা-পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে চান। কিন্তু সরকারের বিপক্ষে যায় এমন কোনো মন্তব্য করার জন্য তাঁদের সরকারের শত্রু ভাবার কিছু নেই।

আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বনন্দিত আলোকচিত্রী শহিদুল আলম এই শ্রেণিতে পড়েন। বহু বছর ধরে তিনি নানা ধরনের সামাজিক আন্দোলনের ছবি তুলেছেন, যা তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সম্মান এনে দিয়েছে। বাংলাদেশে যাঁরা সচেতন নাগরিক আছেন; এবং যাঁরা শহিদুলের ফটোগ্রাফির সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা সবাই জানেন শহিদুল উদার গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল চেতনার একজন মানুষ। সারা জীবন তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে তাঁর শিল্পকর্মকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একেকটি ছবির মধ্য দিয়ে তিনি যেভাবে একেকটি গল্প বলেন, তা আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগায়।

যদি শহিদুল কোনো ঘটনায় আলোড়িত হয়ে ছবি তোলেন এবং সেই ঘটনা প্রশংসার চোখে দেখার মতো না হয় কিংবা তিনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সরকার সম্পর্কে কিছু মতামত দেন, আমি মনে করি সেটি করার অধিকার তাঁর আছে। এটি তাঁকে সরকারের শত্রু কিংবা রাষ্ট্রদ্রোহী বানাবে না।

অতীতে আমাদের অনেককেই বিভিন্ন সরকার দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো, শেষ পর্যন্ত আমাদের মানমর্যাদা অক্ষুণ্ন অবস্থায় ফিরে এসেছে। কিন্তু আমাদের গায়ে এমন তকমা দেওয়া শাসনব্যবস্থা তাদের সুনাম অক্ষত রাখতে পারেনি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন থাকা দলটির রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রতি আজীবন সহানুভূতিশীল একজন হিসেবে আমার শুধু দুঃখ হয় এই দেখে যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর রেখে যাওয়া পথপ্রদর্শনমূলক রাজনৈতিক আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হয়ে গেছি। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন সরকারবিরোধী হিসেবে। বহু বছর ধরে তিনি নির্যাতন, স্বেচ্ছাচারী আটকাদেশ, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাজপথে আন্দোলন করেছেন। মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছেন। তিনি এমন এক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে অগণতান্ত্রিক পাকিস্তান

সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, যেখানে এ ধরনের অন্যায়-অবিচার রাষ্ট্র পরিচালনার যন্ত্র হবে না, যেখানে নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারকে দমন করে রাখা হবে না।

এই বৃদ্ধ বয়সে আমার রাজনৈতিক অবস্থানে বড় কোনো পরিবর্তন আনতে পারব না। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে আমি শুধু এই আশাই করতে পারি, তাঁর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীদের হাতে নিজেদের ভুলত্রুটি সংশোধন করার সময় এখনো আছে। পেশিশক্তি দিয়ে জনগণের আন্দোলন দমন না করে তাদের কাতারে এসে দাঁড়িয়ে তাদের ভালোবাসা ও সমর্থন জয়ের সময় এখনো আছে।

আমি মনে করি, সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ করতে গিয়ে আটক হওয়া সব শিক্ষার্থীকে ছেড়ে তাদের সব ধরনের অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া উচিত। কোটা আন্দোলনকারীসহ কিছু শিক্ষার্থীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া একটি ইতিবাচক দিক উন্মোচন করেছে। আমি মনে করি, শহিদুলকেও জামিনে মুক্ত হওয়ার বিষয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা করা উচিত। শহিদুলকে কারাবন্দী করায় দেশে-বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

কোনো এক প্রাচীন ঋষি তাঁর অনুসারী নৃপতিদের উদ্দেশে কয়েকটি বাণী দিয়েছিলেন। সেগুলো আমাদের এই সময়েও প্রাসঙ্গিক। সেগুলো হলো:

সত্যিকারের শত্রুদের থেকে সত্যিকারের বন্ধুদের আলাদা করতে শেখো
শত্রুদের বন্ধুতে পরিণত করার চেষ্টা করো
এটা নিশ্চিত করো, তোমার বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হবে না

(২০ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকায় প্রকাশিত। ইংরেজি থেকে অনূদিত, ঈষৎ সংক্ষেপিত।)

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮
প্রথম আলো

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন

এম. সাইদুজ্জামান

আজকে আমি যে বিষয়টি সম্পর্কে বলব, যার শিরোনাম আপনারা দেখছেন 'স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন', এ সম্পর্কে বলা এত সহজ নয়; তবু আমি চেষ্টা করব, কারণ এ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাকে কাজ করতে হয়েছে এবং দেশের একজন সাবেক সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমি আজও এ বিষয়ে চিন্তা করি।

প্রথমেই বলতে হয়, বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন ছিল রাষ্ট্রের উন্নয়নে সমাজতান্ত্রিক ও সমতাবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা; যা সংবিধান অনুসারে বাধ্যতামূলক। এ দর্শনের পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা। গ্রামগঞ্জে ঘুরে কৃষক-শ্রমিকের দারিদ্র্য, জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া, হেঁটে-রিকশায়, রেলের তৃতীয় শ্রেণিতে ভ্রমণ করে অর্থনীতির বিভিন্ন অংশের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হওয়া, কীভাবে তদানীন্তন পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করা যায় এমন একটি পরিস্থিতিতে, যখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সব কর্মকাণ্ড ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থনৈতিক উন্নতিতে ও প্রশাসন পদ্ধতিতে পূর্ব বাংলার বলতে গেলে কোনো উপস্থিতি ছিল না। স্বায়ত্তশাসনের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সশস্ত্র বাহিনী গঠনে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো উপস্থিতি ছিল না বললে ভুল বলা হবে না, হয়তো দু-চারজন ছিলেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পূর্ব বাংলার অসহায়তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি প্রকাশের মাধ্যমে সমস্যাগুলো ও পূর্ব বাংলার বঞ্চনাকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এরপর ১৯৬৯ সালের আন্দোলন এবং পরবর্তীতে গোলটেবিল বৈঠকের কোনো

সুফল না পাওয়ায় বঙ্গবন্ধুর মনে স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি গভীরভাবে উপস্থিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক দর্শনের রাজনৈতিক পটভূমি সম্পর্কে আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

এরপর আমি আসি সত্তরের নির্বাচন ও পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল জয়লাভ এবং অসহযোগ আন্দোলনের মাঝে বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা ও অর্থনৈতিক মুক্তির ঘোষণায়। সেই ১৮-১৯ মিনিটের বক্তৃতা, যেটি অলিখিত ছিল, ইউনেস্কোর উদ্যোগে আজ বিশ্বজুড়ে ওয়ার্ল্ড ইউনেস্কো হেরিটেজের অংশ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটি সত্যিকার অর্থে বাঙালির গৌরব ও স্বাধীনতার ডাকের অতুলনীয় ঐতিহ্য।

এবার আমি বলতে চাই অর্থনৈতিক দর্শনের কথা, যা একটি স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান ও সংবিধানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়ে আসে। স্বাধীনতার পরে বহু রাজনৈতিক নেতা দলীয়ভাবে, ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়নের নীতি কী হবে, সে বিষয়ে ঘোষণা ও দাবি প্রকাশে ব্যস্ত ছিলেন। ওই সময় থেকে অর্থনৈতিক দর্শনের উপর মূল আলোচনা শুরু হয়। আমাদের নতুন প্রজন্মকে জানতে হবে কিছু তথ্য। প্রথমত, আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক দল হিসেবে ছিল না; দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে দেশের অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের কথা উল্লেখ ছিল।

অর্থনীতিবিদরা সার্বিকভাবেই এসবের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের সঙ্গে দারিদ্র্য ও অসমতা হ্রাসের উপায় হিসেবে।

স্বাধীনতার পর কিছু উগ্রবাদী ও বিপ্লববাদী শ্রেণি দলের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র', 'মুজিববাদ মুজিববাদ' ইত্যাদি স্লোগান উত্থাপন শুরু করে। সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা সংবিধান অনুমোদিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু ব্যাংক, বীমা ও সব বৃহৎ শিল্প-কারখানাকে রাষ্ট্রীয়করণের ঘোষণা দেন এবং আরো জানান, শিল্প-কারখানার ম্যানেজমেন্ট বোর্ডে ৪০ শতাংশ শ্রমিক থাকবেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিলগ্নীকরণ করা হবে, যার অনেকগুলো পরিত্যক্ত হয়েছে। ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেওয়ার ঘোষণাও দেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান (যেটি সংসদের প্রথম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর অনুমোদন করেন) যথার্থ রূপে ও স্পষ্টভাবে

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন নির্দেশিত ও প্রতিফলিত করেছিল। সংবিধান প্রণয়নের পর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরের জন্য তাজউদ্দীন আহমদের বাজেট বক্তৃতায় বিস্তারিত জানানো হয়।

আমাদের সুস্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিত স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ পেয়েছিল একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি। অবকাঠামো ছিল দুর্বল, বেশির ভাগ সড়ক, বন্দর, সেতু ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে ছিল বহু বিধ্বস্ত শিল্প-কারখানা ও স্থবির হয়ে থাকা কৃষি খাত। স্বাধীনতার পর ধারাবাহিকভাবে দু'বার বাংলাদেশ কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতার অব্যাহতি পরেই ১৯৭২-৭৩ সালে বহির্বিশ্বের পরিস্থিতিও ছিল চরম প্রতিকূল। যেমন - বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কিন প্রশাসন গ্রহণ করে 'স্মিথসোনিয়ান এগ্রিমেন্ট'। এর মানে হলো, গোল্ড থেকে ডলারকে পরিবর্তন করার যে একটি পরিমিত সমীকরণ (ইকুয়েশন) ছিল, সেটাকে বাদ দিয়ে দেওয়া। ফলে যেটি হলো, ৩ ডলারের তেলের ব্যারেল হয়ে গেল ১১ ডলার। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৮০ ডলার করে আমরা যে গম কিনতাম, সেটি হয়ে গেল ২৪০ ডলার (প্রতি টন)। আমরা সার কিনতাম প্রতি টন ৮০ ডলার করে, সেটি হয়ে গেল ২০০ ডলার। পুরো বিশ্বে এবং উন্নত অর্থনীতিগুলোর অনেকগুলোয় আন্তর্জাতিকভাবে নজিরবিহীন মূল্যস্ফীতি দেখা দিল। বঙ্গবন্ধু সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনকে নির্দেশ দিলেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রিলিফের জন্য খাদ্য সরবরাহে স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য এবং পুনর্গঠন ও উন্নয়নে মধ্যম মেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করতে।

পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন ড. নুরুল ইসলাম। অধ্যাপক রেহমান সোবহান, অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসাইন ও অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমান সদস্য ছিলেন। এদের উপর দায়িত্ব ছিল পরিকল্পনা কমিশন সংগঠিত করা এবং নিজেদের সর্বোচ্চ বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী একটি পরিকল্পনা তৈরি করা। ১৯৭৩ সালের ২ মার্চ পাকিস্তান থেকে পালিয়ে প্রত্যাবর্তনের পর আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পরিকল্পনা কমিশনের সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ইএডি'র (ইকোনমিক অ্যাফেয়ার্স ডিভিশন) সচিব পদে কিন্তু বাস্তবে পরিকল্পনা কমিশনের সব বিভাগের সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের কিছু মধ্য-দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল - প্রথমত, স্ব-নির্ভরতা, যতটা সম্ভব দেশের সম্পদ ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, বিদেশ ও দাতাদের কাছ থেকে শর্তহীন অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে স্বাগত জানানো এবং ক্রমান্বয়ে এ ধরনের নির্ভরতা হ্রাস করা। তৃতীয়ত, ১৯৭৪ সালের শুরুতেই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের সীমা ২৫

লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়। কাজেই বেসরকারি খাতকে বঙ্গবন্ধু উপেক্ষা করেছেন, এটা কখনো বলা যাবে না।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল বিষয়গুলো আমি ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখের সংবিধান থেকে উদ্ধৃত করব। বাংলাদেশের সংবিধান, যেটা পরবর্তীতে মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছিল। এসব নীতি ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরের জন্য তাজউদ্দীন আহমদের বাজেট বক্তৃতায় ঘোষণা করা হয়, যা আমি আগেই বলেছি। পরে আমি সংবিধানের কিছু আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, জনগণকে প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জানানো জনগণের প্রতি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি বিষয়টি স্বচ্ছ করতে চেয়েছিলেন এবং জনগণকে জানাতে চেয়েছিলেন দেশে কী ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে। তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ১৯৭৪-৭৫ অর্থবছরের বাজেটের সঙ্গে অর্থনৈতিক পর্যালোচনা নথি (ইকোনমিক রিভিউ ডকুমেন্ট) প্রকাশ করতে।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যদি বলতে চাই, তাহলে বলতে হবে প্রবৃদ্ধির অগ্রগতি সম্পর্কে। এখনো বিনিয়োগে (সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ) অনেক দুর্বলতা রয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রচেষ্টা চলছে। অনেকভাবেই সফল হয়েছে, যদিও প্রশাসনিক দুর্বলতা ও বিভেদ প্রতিদিনই খবরের কাগজে ও বিভিন্ন মিডিয়ায় উঠে আসছে। দরিদ্র ও অতিদরিদ্রদের সামাজিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী প্রোগ্রাম দিয়ে সেগুলো বর্তমান সরকার মোকাবেলা করতে সচেষ্ট রয়েছে। নির্ভরযোগ্য আইনি পদ্ধতি ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এখনো সম্পূর্ণভাবে আমরা দেখতে অপেক্ষা করছি।

বঙ্গবন্ধুর সময়ে ব্যাংকসহ তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়, যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। ছয়টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়, চারটি ছিল বিশেষায়িত ব্যাংক - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্পোন্নয়ন সংস্থা ও হাউজ বিল্ডিং করপোরেশন। দাতারা শুধু রিলিফ ও পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা দিয়েছিল। এখানে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের কথা আমাদের মনে এসে যায়।

বাংলাদেশ কোনো উন্নয়ন ঋণের দাবি গ্রহণ করেনি, যা পাকিস্তান দাবি করেছিল। 'এইড টু পাকিস্তান কনসোর্টিয়াম'-এর সদস্যদের দাবির বিপরীতে বাংলাদেশ স্পষ্টভাবে বলেছিল, 'না'। বাংলাদেশ পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করেছিল যে আমাদের কোনো দেনা

নেই। কারণ আমরা কোনো উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র নই এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার কোনো দাতার কাছ থেকে সরাসরি ঋণ গ্রহণ করেনি। কিছু নির্দিষ্ট শর্তে পাকিস্তান সরকার দাতাদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিল এবং ভিন্ন শর্তে ও অনেক বেশি কঠিন শর্তে এ ঋণের কিছুটা বাংলাদেশকে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) দিয়েছিল। বিভিন্নভাবে এগুলো আমাকে যুক্তিসঙ্গত করতে হয়েছে সরকারের পূর্ণ সম্মতি নিয়ে।

সাবেক 'পাকিস্তান কনসোর্টিয়াম অব ডোনারস'-এর সদস্যরা ১৯৭৩ সালের মার্চে ঢাকায় বৈঠক করেন। আইনি ও তথ্যমূলক যুক্তিগুলো একই ছিল, আমরা আইনত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র ছিলাম না এবং তাই আমরা কোনো ঋণের জন্য দায়ী নই। ওই সময় পিটার কারগিল ছিলেন বিশ্বব্যাংক এশিয়ার জন্য ভাইস প্রেসিডেন্ট।

বৈঠক শেষে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চান এবং আমরা সে ব্যবস্থা করে দেই। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন ড. নুরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন ও ইএডি'র সচিব হিসেবে আমি। যখন ওখানে আমরা ছিলাম, আলোচনা করছিলাম, পিটার কারগিল বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী দাতাদের কাছ থেকে সহায়তা নিতে অস্বীকৃতি জানালে আপনার জনগণ কী খাবে।' বঙ্গবন্ধু পাইপ হাতে নিয়ে উঠে তাকে বললেন, 'আমার সঙ্গে আসুন', বলে জানালার কাছে নিয়ে গেলেন, দেখালেন এবং বললেন, 'আপনি নিচে কী দেখতে পাচ্ছেন? আপনি বাইরে কী দেখতে পাচ্ছেন?' কারগিল বললেন, 'সবুজ ঘাসের একটি সুন্দর উঠোন।' বঙ্গবন্ধু বললেন, 'যদি আপনারা কোনো ধরনের সহায়তা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে আমার জনগণ এগুলো খাবে।

কারগিল চলে গেলেন, আমরা তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি। আমরা যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি, তখন হঠাৎ বঙ্গবন্ধু পেছন দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই সইদুজ্জামান (আমাকে সবসময় তিনি এ নামেই ডাকতেন, 'সাইদুজ্জামান' বলতে কখনো শুনিনি) এই যে কথাগুলো ওরা বলল, তা কতটুকু সত্য? যে প্রকল্পগুলোর কথা বলল, এগুলো থেকে আমরা কি কোনো উপকার পাচ্ছি? যেসব প্রকল্প ওদের টাকায় হয়েছিল, সেগুলোর কি অস্তিত্ব আছে? এবং থাকলে কী অবস্থায় আছে।" আমি বললাম, স্যার, কিছু প্রকল্প আছে যেগুলো সম্পূর্ণভাবে টিকে আছে, যেগুলো থেকে মানুষ এখনো উপকার পাচ্ছে। কিছু প্রকল্প আছে যেগুলো যুদ্ধের সময় ভেঙ্গে গিয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে, সেগুলো পুনর্নির্মাণ করার টাকা যদি ওরা দেয়, তাহলে ভালো হবে। আর কতগুলো নতুন প্রকল্পও আমাদের দরকার অবকাঠামো, পরিবহন, বন্দর খাতে। এগুলোর জন্য আমাদের অর্থ প্রয়োজন। বঙ্গবন্ধু বললেন, 'শোনো, এক কাজ করো, ওই সমস্ত প্রকল্প,

যেগুলো থেকে আমাদের লোক উপকার পাচ্ছে, সেগুলোর দায়িত্ব আমরা নেব; যে সমস্ত তুমি বললে যে পুনর্নির্মাণ করার দরকার আছে, সেগুলোকে আবার পুনর্নির্মাণ করতে হবে, ওই সমস্ত প্রকল্পের ও যেগুলো নতুন করে করতে হবে সেগুলোর একটি তালিকা করে পরিকল্পনা কমিশন থেকে তোমরা আমাকে দাও। এবং দেখো, তুমি হিসাব করো, কত টাকা আমাদের দিতে হতে পারে এবং আরো কত টাকা আমাদের দরকার।'

বাংলাদেশ যখন পাকিস্তানের অংশ ছিল, তাদের হিসাবে পাকিস্তান দাতাদের কাছ থেকে নিয়ে যে অর্থ সাহায্য বাংলাদেশে ব্যয় করেছিল, তার জন্য ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন ডলার তারা দাবি করল। এ বিষয়টি মধ্যস্থতা বা দরাদরি করার জন্য আমাকে বঙ্গবন্ধু নিয়োগ করলেন 'চিফ নেগোশিয়েটর' হিসেবে। বিষয়টি মধ্যস্থতা করার জন্য ঢাকা ছাড়াও আমাকে ওয়াশিংটন, লন্ডন, প্যারিস এমনকি চেকোস্লোভাকিয়ায়ও যেতে হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি মধ্যস্থতা সম্পূর্ণ হয় এবং সরকারের পরামর্শ ও সময় অনুমোদন নিয়ে ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন ডলারের দাবি মাত্র ৪০০ মিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনতে আমি সফল হই (কীভাবে এটা করতে পেরেছিলাম এর বিস্তৃত বিবরণ অন্য জায়গায় আছে)। আইডিএ শর্তানুসারে (যা ওই সময় সম্ভাব্য শিথিলতম শর্ত ছিল) আমরা এই পরিমাণ সাহায্যের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আমরা রাজি হলাম একটি নতুন সংস্থা গঠন করতে - বাংলাদেশ এইড গ্রুপ।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে এর একটি সভা হয় প্যারিসে, ১৯৭৫ সালের মে মাসে দ্বিতীয়বার। কোনো এক আর্থিক বছরে এ ধরনের একাধিক মিটিং সেটিই প্রথম। প্রথমবার দাতাদের কাছ থেকে আমরা পেলাম ৮০০ মিলিয়ন ডলার এবং দ্বিতীয়বার পেলাম ১ হাজার ২০০ মিলিয়ন ডলার। এক বছরে দু'বার বাংলাদেশ এইড গ্রুপের বৈঠক হওয়া ছিল এক অনন্য বিষয়, অন্য কোনো দেশের জন্য এমনটি হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

সমঝোতায় পৌঁছানোর পর দেশে ও দেশের বাইরের সাংবাদিকরা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন এবং তাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। আমরা পরিকল্পনা কমিশন থেকে হিসাব করে ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমাদের প্রয়োজনীয় অংক উপস্থাপন করেছিলাম। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল:

আপনার সরকার সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে, এখন আপনার এক নম্বর অগ্রাধিকার কী হবে? বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন, "আমার কাছে এক নম্বর কোনো অগ্রাধিকার নেই;

আমার কাছে 'যৌথ এক নম্বর' অগ্রাধিকার রয়েছে, সেটি হলো খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।"

এরপর আলোচনার মাধ্যমে যে একটি সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেটি ছিল বাংলাদেশের নিজ মুদ্রার অবমূল্যায়নে সম্মত হওয়া। কারণ স্বাধীনতার পরপর ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশের টাকার মান ছিল ৭ দশমিক ৫০ এবং ভারতের রুপির মানও একই ছিল। কিন্তু ১৯৭৪ সালের ওই চুক্তির পরে এবং আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতির বিবেচনা করে তখন আমরা রাজি হলাম মুদ্রার অবমূল্যায়নে এবং ডলারের বিপরীতে টাকার মান ১২ দশমিক ৫৮ করতে। এটি মন্ত্রিপরিষদের এক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

এখন সংবিধানে যে কথাগুলো বলা আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই, যেটি সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু সবসময় বলতেন, 'তোমরা সংবিধান গঠন করার জন্য অপেক্ষা করো, দেখবে কী হবে আমার অর্থনৈতিক দর্শন।' সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে দু'টি প্যারা উপস্থাপন করছি:

We the people of Bangladesh, having proclaimed our Independence on the 26th day of March 1971 and a historic war for national independence, established the independent, sovereign People's Republic of Bangladesh.

Further pledging, that it shall be a fundamental aim of the state to realize through the democratic process, a socialist society, free from exploitation - a society in which the rule of law, fundamental human rights and freedom, equality and justice, political, economic and social, will be secured for all citizens;

এটি হচ্ছে প্রস্তাবনা থেকে। এরপর কতগুলো আর্টিকেল আছে যেগুলোয় তিনি অর্থনৈতিক দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বলে গেছেন। সেগুলো আর্টিকেল ৮ থেকে শুরু করে আর্টিকেল ২০ পর্যন্ত দেওয়া আছে। ৮ নম্বরে বলা আছে, The principles of Nationalism, Socialism, Democracy and Secularism, together with the principles derived from them as set out in this part, shall constitute the fundamental principles of state policy.

আর্টিকেল ১০ - The social economic system will be established with the view to ensuring the attainment of a just and egalitarian society free from exploitation of men by men. (This is what actually was meant by Socialism and Freedom from exploitation)

আর্টিকেল ১৩ - The people shall own or control the instruments and means of production and distribution, and with this end in view, ownership shall assume the following forms, (a) State ownership, that is ownership by the state on behalf of the people through the creation of an efficient and dynamic National Public Sector, embracing the key sectors of the economy; (b) Cooperative ownership, that is, ownership by cooperatives on behalf of their members within such limits, as may be prescribed by law; and (c) Private ownership, that is ownership by individuals within such limits as may be prescribed by law.

বেসরকারি খাতকে অবহেলা করা বঙ্গবন্ধুর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তাই যেটি আমি আগেও বলেছি, ১৯৭২ সালে বেসরকারি বিনিয়োগকারীর মালিকানায় সীমা, যা ছিল ২৫ লাখ টাকা, সেটি ১৯৭৪ সালে ৩ কোটিতে উন্নীত করা হয়, যাতে বেসরকারি খাত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে যোগদান করতে পারে।

আর্টিকেল ১৪ - It shall be a fundamental responsibility of the state to emancipate the toiling masses, the peasants, and workers, and backward sections of the people, from all forms of exploitation.

আর্টিকেল ১৫ - It shall be a fundamental responsibility of the state to attain, through planned economic growth, a constant increase of productive forces and a steady improvement in the material and cultural standard of living of the people, with a view to securing to its citizens - (a) the provision of the basic necessities of life, including food, clothing, shelter, education and medical care; (b) the right to work, that is the right to guaranteed employment, at a reasonable wage having regard to the quantity and quality of work.

বর্তমান সরকার এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ও দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা এখনো তা সম্পূর্ণভাবে করে উঠতে পারিনি। দারিদ্র্যের হার ১৯৭২ সালের ৭২ শতাংশ থেকে কমে এখন ২৪ শতাংশ/২২ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে হতদরিদ্র আছে প্রায় ৯ শতাংশ, যাদের জন্য এখন সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ ব্যবস্থা এখনো সম্পূর্ণ সুফল বয়ে আনতে পারেনি। কারণ এর মধ্যে অনেক ফাঁকিঝুঁকি ধরা পড়ছে। যাদের পাওয়ার কথা, তারা পাচ্ছে না কিন্তু যাদের পাওয়ার কথা না, তারা লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে আর্টিকেল ১৫-তে আরো বলা আছে, 'The right to social security, that is to say, to public assistance in cases of want arising from unemployment, illness, or disablement, or suffering widows, and elderly, in old age, or other such cases.'

বর্তমান সরকারও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা করেছে, যেটি বঙ্গবন্ধু বলে গিয়েছিলেন। অসুস্থ ও অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে এবং হচ্ছে।

আর্টিকেল ১৬ - The state shall adopt effective measures to bring about a radical transformation in the rural areas through the promotion of an agriculture revolution, the provision of rural electrification, the development of cottage and other industries, and the improvement of education, communications and public health, in those areas, so as progressively to remove the disparity in the standards of living between the urban and the rural areas. বর্তমানেও এসব সমস্যা বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য এসব সমস্যার সমাধান, যা আমি আগে উল্লেখ করেছি।

গ্রামীণ ঋণের জন্য বঙ্গবন্ধু সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, যে ধারণাটি মূলত প্রয়াত আখতার হামিদ খান কুমিল্লায় প্রথম প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

খাদ্য নিরাপত্তা, মানব উন্নয়ন, কাজের স্বাধীনতা - এই যে কথাগুলো বঙ্গবন্ধু সংবিধানে বলেছেন, বহু বছর পর অধ্যাপক অমর্ত্য সেন ও ড. মাহাবুবুল হক ইউএনডিপি'র মাধ্যমে এ বিষয়গুলো বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। এগুলো সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু কত আগে চিন্তা করেছেন আপনারা ভেবে দেখুন। আর্টিকেল ১৭ - The state shall adopt effective measures for the purpose of - (a) establishing a uniform, mass oriented

and universal system of education and extending free and compulsory education to all children to such stage as may be determined by law.

আমরা আগেই বলেছি বঙ্গবন্ধুর সময় ৩০ শতাংশ প্রাথমিক স্কুল সরকারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখনো মাধ্যমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে বর্তমান সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতা দূর করতে পারি।

আর্টিকেল ১৮ - The state shall regard the raising of the level of nutrition and the improvement of public health as among its primary duties.

আজ আমরা শুনতে পাই এমডিজি, এসডিজি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদির কথা। এই যে কথাগুলো আছে, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জন্য ১৭টি গোল, ১৭৯টি টার্গেট, আরো বেশকিছু বাস্তব অর্জন, যেগুলো সম্পর্কে আজ সারা বিশ্বের চিন্তা হচ্ছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা, বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য নির্মূল এবং কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না; এ কথাটি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন। লক্ষ্য করুন, পুষ্টির কথা, যেটি এসডিজি'র অগ্রাধিকার অনুসারে দুই নম্বরে রয়েছে, বঙ্গবন্ধু সেটি ১৯৭২ সালেই বলে গিয়েছিলেন।

আর্টিকেল ১৯ - The state shall endeavor to ensure equality of opportunity to all citizens.

অমর্ত্য সেন ১৯৯৮ সালে এ বিষয়গুলো উন্নয়নের মূলধারা হিসেবে প্রকাশ করেন এবং ঢাকা এসে সে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

সর্বশেষে আমি বলব আর্টিকেল ২০-এর কথা - 'Work is a right, a duty and matter of honor for every citizen, who is capable of working and everyone, should be paid for his work on the basis of the principle, from each according to his ability to each according to his work.'

এখানেও প্রতিবন্ধীদের জন্য বলা আছে বলে আমি মনে করি। আমরা এখনো সম্পূর্ণরূপে তা করতে পারিনি। উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত: সুশাসন ও দুর্নীতি হ্রাস, উন্নয়নের জন্য সম্পদ সংগ্রহ। এটিই বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথা।

১৯৭৫ সালের শুরু থেকে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বাড়তে শুরু করল, কারণ আমরা যে সাহায্য পেয়েছিলাম তার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। জনগণ সক্রিয় ছিল, একটি স্বাধীন দেশ ও এর উন্নতির দিকে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। কৃষি উৎপাদন ও রফতানি বাড়ছিল, বৈদেশিক সাহায্যের সঠিক ব্যবহার বাড়ছিল, মূল্যস্ফীতি কমে আসছিল। ১৯৭২ সালে মূল্যস্ফীতি ছিল ২০ শতাংশ, যা ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সালে বেড়ে হয়েছিল ৬০ শতাংশ, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে কমে হয়েছিল ৩৫ শতাংশ। এবং ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সেটি আরো কমে এসেছিল। সত্যি কথা বলতে, আমাদের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছিল।

১৯৭৫ সালে মে মাসের শেষ দিকে জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগুলোর সরকার প্রধানদের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু এসব তথ্য তুলে ধরেছিলেন। আমি সেই মিটিংয়ে ছিলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে, বঙ্গবন্ধু যেখানে এ কথাগুলো বলেছিলেন এবং সবাইকে প্রশংসা করে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তোমরা আমাদের সহায়তা করেছিলে বলে আমরা আজকে এগিয়ে যাচ্ছি, এভাবে এগোচ্ছি।' কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ধাক্কা ও দুর্ভাগ্য যে সবকিছুর দুঃখজনক পরিণতি ঘটল ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্ট, যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়।

৭ অক্টোবর ২০১৮
বণিকবার্তা

গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের রেকর্ড ভালো নয়

রেহমান সোবহান

রেহমান সোবহান গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান। বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিআইডিএস-এর সাবেক মহাপরিচালক। বিজয়ের ৪৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে প্রথম আলোর সঙ্গে তিনি কথা বলেন অর্থনীতি, রাজনীতি, আগামী নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সোহরাব হাসান।

প্রথম আলো: বিজয়ের ৪৬ বছর পর আপনার অনুভূতি জানতে চাইছি। যে স্বপ্ন নিয়ে আপনারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন, সেই স্বপ্ন থেকে আমরা কত দূরে আছি?

রেহমান সোবহান: এই প্রশ্নের উত্তরে আমার সংক্ষিপ্ত জবাব হলো আমার প্রজন্মের মানুষের মধ্যে এই স্বপ্ন এখনো আছে - এটি অনস্বীকার্য। তবে নতুন প্রজন্মের স্বপ্ন আমার প্রজন্মের স্বপ্নের চেয়ে একেবারেই আলাদা। আমার স্বপ্নের কথা যদি বলি তাহলে বলতে হয়, কিছু কিছু স্বপ্ন আংশিকভাবে পূরণ হয়েছে। সব স্বপ্ন পূরণ হওয়াটা বিরল ব্যাপার। আর তাই এই ৮৩ বছর বয়সে আমি এখনো স্বপ্ন দেখে যাই।

প্রথম আলো: মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল একটি মানবিক মর্যাদাশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেটি থেকে আমরা এখন কত দূরে আছি? কেন এই অবনতি?

রেহমান সোবহান: অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভালো করেছি। হেনরি কিসিঞ্জার (সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী) যে বলেছিলেন আমরা তলাবিহীন ঝুড়ি হব, সেই ভাবমূর্তি আমরা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। কথিত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমাদের অর্থনীতি অধিকাংশ

দেশের চেয়ে ভালো করেছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় আমাদের অসমতাও বেড়েছে। অন্যদিকে আমাদের সহিষ্ণুতা কমেছে। সে কারণে আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও বেশি সহিংস হয়ে পড়েছি। সুদৃঢ় আইনের শাসনসহ যে পূর্ণ গণতান্ত্রিক ও ন্যায্য সমাজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি আমাদের ছিল, সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে সরে আসার কারণেই এমনটা হচ্ছে।

প্রথম আলো: মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রত্যয় ছিল গণতন্ত্র। আমরা এখনো সেই গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত দিতে পারিনি কেন?

রেহমান সোবহান: স্বাধীনতাযুদ্ধের যেসব স্বপ্ন থেকে আমরা দূরে সরে এসেছি, এটি তার মধ্যে চোখে পড়ার মতো। অধিকাংশ উত্তর-ঔপনিবেশিক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের পূর্বশর্ত অধিকতর শক্তিশালী ছিল, দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের প্রতিবেশীদের তুলনায়। গণতন্ত্রের জন্য ২৪ বছরের সংগ্রাম করে আমরা স্বাধীন হয়েছি, যার নেতৃত্বে ছিলেন অনুপ্রেরণাদায়ী নেতারা। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা অনেকাংশে সমরূপ ও সমতাবাদী সমাজ পেয়েছিলাম। এখানে যেমন সামন্তীয় অভিজাত শ্রেণি থেকে আসা সুনির্দিষ্ট শাসক শ্রেণি ছিল না, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও দৃঢ়ভিত্তিসম্পন্ন পুঁজিবাদী শ্রেণিও ছিল না। নব্বই দশক থেকে আমরা শক্তিশালী দ্বিদলীয় ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে সক্ষম হই, যেখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তুলনামূলক অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক যে দুই দলই এটি বোঝার তেমন চেষ্টা করেনি যে নির্বাচনে জেতা মানেই রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগের উপর একচেটিয়া আধিপত্য নয়। এর প্রতিক্রিয়ায় বিরোধীপক্ষ সংসদ বয়কট করেছে এবং রাস্তায় সহিংসতা করেছে। এতে আমাদের নির্বাচিত সংস্থাগুলো কার্যকর হয়নি। ফলে সরকারের জবাবদিহিও অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এর ফলে সংসদীয় গণতন্ত্র নির্বাচনী একনায়কতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রথম আলো: আগামী নির্বাচন নিয়ে ক্ষমতাসীন দল ও প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান পরস্পরবিরোধী। সমাধান কী?

রেহমান সোবহান: আগামী নির্বাচন নিয়ে আশাপ্রদ কিছু দেখছি না। এর কারণগুলো দৃশ্যমান, কিন্তু আমার পক্ষে তা বোঝা কঠিন। দেখা যাচ্ছে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ আট বছরের বেশি সময় ধরে বিরোধী দলের কার্যকর বিরোধিতা ছাড়াই ক্ষমতায় আছে। শক্তিশালী এক নেতা আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তিনি সমস্যাগুলো ভালোভাবেই বোঝেন, আর কীভাবে তা সামাল দিতে হয়, তাও জানেন। এ ছাড়া বর্তমান নেতৃত্বের

জমানায় অর্থনীতি ভালো করেছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দৃশ্যমান। আর নিজেদের সম্পদে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তও প্রশংসিত হয়েছে। এর বিপরীতে বিএনপি তিন বছর ধরে আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে আছে। দলটির অনেক নেতা-কর্মী কারাগারে বা পালিয়ে আছেন। দলটির অধিকাংশ নেতা গ্রেপ্তারের আশঙ্কায় আছেন। দলটিকে জনসভা করার অনুমতিও তেমন একটা দেওয়া হয়নি। সে কারণে তারা জনসমক্ষে তেমন একটা দৃশ্যমান নয়। এ ধরনের ভারসাম্যহীন পরিস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের এই আশঙ্কার কারণ নেই যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে তারা জিততে পারবে না। ক্ষমতাসীন দলকে এগিয়ে গিয়ে বিএনপি ও তার মিত্রদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা উচিত। যতটা সম্ভব হয় তাদের উদ্বেগ আমলে নিতে হবে; তাদের উৎসাহ দিতেই এটি করতে হবে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনে বিরোধী পক্ষের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই ফলাফল নিয়ে যেন কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, তাও নিশ্চিত করতে হবে। যে দলের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার ঐতিহ্য আছে, যারা সব সময় প্রতিযোগিতাপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসায় বিশ্বাসী, তাদের এমন নির্বাচনী বিজয় অর্জন করতে হবে, যার গ্রহণযোগ্যতা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে।

প্রথম আলো: দুই প্রধান দলের মধ্যে মতৈক্য না হলে কী হবে? আমরা কি ২০১৪ সালের ধরনের আরেকটি নির্বাচন পেতে যাচ্ছি?

রেহমান সোবহান: আমি এটি কল্পনা করতে পারি না যে বিএনপি ২০১৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ভুল থেকে শিক্ষা নেয়নি। বর্তমানে তারা সাংগঠনিকভাবে ২০১৪ সালের চেয়েও দুর্বল, ফলে যে কোনো পরিস্থিতিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছাড়া তাদের উপায় নেই। আর নির্বাচনে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এমন কিছুও ঘটে থাকে। তাই যে দলের গণভিত্তি আছে কিন্তু আন্দোলন করার ক্ষমতা নেই, তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত।

প্রথম আলো: ১৯৯৫ সালে রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে আপনিসহ পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দুই দলের প্রধানদের সঙ্গে বসেছিলেন। এবারও সেই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেবেন কি না?

রেহমান সোবহান: কখনোই নয়। আজ রাজনৈতিক বিভাজন এত বড় হয়ে উঠেছে যে একই রকম জি-৫ (পাঁচ বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্যোগ) উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, তা চিন্তাও করা যায় না। সে রকম সাহসী বা সম্ভবত বোকা মানুষ পাওয়া যাবে না, যারা এত কিছুর পরও দলগুলোর অপমান ও ক্রোধ মাথা পেতে নেবে।

প্রথম আলো: বলা হয় বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে অনেক উন্নতি করেছে। কিন্তু উন্নয়নের সঙ্গে সুশাসনের প্রশ্নটি জড়িত। সুশাসনের যে মারাত্মক ঘাটতি রয়েছে, তাতে উন্নয়নের সুফল তো সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না।

রেহমান সোবহান: আমাদের কিছু চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি আছে, দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে আমি যেমনটা বলেছি। সাধারণভাবে আমরা একমত যে প্রশাসনিক দক্ষতা, সহজে ব্যবসা করার সূচক, দুর্নীতির বিস্তার - এসব মানদণ্ডে আমাদের শাসনব্যবস্থা দুর্বল। আমরা যদি শাসনব্যবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি ঘটাতে পারি বা দুর্নীতি হ্রাস ও উন্নয়নের অনুঘটকের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিতে পারি - যারা আমাদের উন্নয়নের শক্তি, তাহলে আমরা যে শুধু প্রবৃদ্ধির হার দুইয়ের ঘরে নিয়ে যেতে পারব তা নয়, বরং সেটার আরও ব্যাপক ও সমতাভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করতে পারব।

প্রথম আলো: পাকিস্তান আমলে আপনি দুই অর্থনীতি তত্ত্ব দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এখন যে অর্থনীতিতে প্রকট বৈষম্য রয়েছে, তার প্রতিকার কী?

রেহমান সোবহান: আমি আগে অন্য কোথাও লিখেছি যে বাংলাদেশ দুই অর্থনীতি থেকে দুই সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে। এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বিপজ্জনক, এমনকি এতে আমাদের অর্থনৈতিক অর্জনগুলোও বিপন্ন হতে পারে। আমাদের সৌভাগ্য, দেশে খুবই সক্ষম ও কঠোর পরিশ্রমী এক শ্রমিক শ্রেণি আছে। আছে কৃষক, শ্রমিক, প্রবাসী শ্রমিক - অর্থনৈতিক সফলতার পেছনে তারাও আমাদের ব্যবসায়ী নেতাদের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই শ্রেণির পেছনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য খাতে যতটা বিনিয়োগ করা যায় তা নিশ্চিত করা, যাতে তারাও অভিজাত শ্রেণির মতো অগ্রগতির সুযোগ পায়। আমাদের এমন নীতি থাকা উচিত, যাতে করে শ্রমিকেরা, বিশেষ করে পোশাক শ্রমিকেরা তাদের শ্রমলব্ধ মুনাফার ভাগ পায়; অর্থাৎ তারা যেখানে কাজ করে, সেই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহোল্ডার হওয়া উচিত তাদের, কৃষকেরা কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মুনাফার ভাগ পায় এবং সমাজের কম সুবিধাপ্রাপ্ত অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরাও যেন একই সুযোগ পায়।

প্রথম আলো: মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আছে বলে বলা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের নীতি-আদর্শ বিশেষ করে চার মূল নীতি কতটা রক্ষিত হয়েছে?

রেহমান সোবহান: আমি এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করব না যে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বাধীন সরকার সেই উত্তরাধিকারী, যদিও তারা একমাত্র উত্তরাধিকারী নয়। কিন্তু আমাদের এটি মনে রাখা দরকার যে জনগণের বিপুল অংশ ও রাজনৈতিক শক্তি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। যে যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ রক্ত দিয়েছে, সেই যুদ্ধের যথার্থ উত্তরাধিকারী হওয়াটা বংশপরম্পরার অধিক কিছু দাবি করে। উত্তরাধিকারী হতে গেলে তার কাজ ও মূল্যবোধে সেই প্রতিফলন থাকতে হবে। আমি একমত যে এই জমানা বহুদিন ঝুলে থাকা যুদ্ধাপরাধের বিচার শুরু করেছে, আগের সরকারগুলো তা পারেনি। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণের চেষ্টা করেছে। তা সত্ত্বেও এই সরকার মৌলবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে সুবিধাবাধী আপস করেছে। সংখ্যালঘুরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং তাদের সম্পত্তির উপর হামলা হচ্ছে। আমরা বিদেশি সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছি। ফলে আমাদের নীতি প্রণয়নে বিদেশিদের প্রভাব কমেছে। তবে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আমাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। অন্যদিকে আমাদের মূল আদর্শ অর্থাৎ সমাজতন্ত্র, যেটা এখন সামাজিক ন্যায্যতা; এর অস্তিত্ব কার্যত নেই।

প্রথম আলো: আপনারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই জাতিকে বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনা দিত। এমনকি স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও উজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে। এখন পারছে না কেন?

রেহমান সোবহান: বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুঃখজনকভাবে দলীয় প্রভাবের খপ্পরে পড়েছে। বিগত কয়েকটি সরকারের আমলে একাডেমিক উৎকর্ষ নয়, রাজনৈতিক পরিচয়ই অগ্রগতির নিয়ামক হয়ে উঠেছে। ছাত্র কর্মীরা একসময় আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করলেও এখন তাদের জীবনে নীতির ভূমিকা কম। বস্তুগত প্রাপ্তিই এখন তাদের আরাধ্য। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহিংসতার মধ্য দিয়ে তা আরও তীব্র হয়েছে। সব রাজনৈতিক দলের উচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পেশাগত উন্নতির জন্য একাডেমিক উৎকর্ষকে প্রাধান্য দেওয়া। ছাত্রদের পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী করতে তাদের নানা প্রণোদনা দিতে হবে - পেশিবহুল মানুষেরা যেন তাদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে না পারে। আমাদের লক্ষ্য হবে ছাত্রদের তৎপরতা দলীয় প্রভাবমুক্ত করা, রাজনৈতিক প্রভাব নয়।

প্রথম আলোঃ এই মুহূর্তে বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী?

রেহমান সোবহানঃ আজ বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো এ রকমঃ

- উন্নয়নের যে গতিশীল অনুঘটক আছে, তার পূর্ণ সম্ভাবনা কাজে লাগানো।
- বিশ্বায়নের সুযোগগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানো, বিশেষত এশিয়ায় উদীয়মান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে আমাদের নৈকট্য কাজে লাগাতে হবে। এশিয়া একুশ শতকের অর্থনৈতিক বিশ্বের কেন্দ্র হতে চলেছে।
- চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে সামাল দিতে আমাদের কার্যকর গণতন্ত্র দরকার, যেখানে রাজনৈতিক শক্তি ও অর্থের জায়গায় সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও মতামত গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- অর্থনৈতিক সুযোগ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে। আমাদের সামাজিক সম্পর্কে আরও সহিষ্ণুতা আনতে হবে। আর সংখ্যালঘুদের ক্ষমতায়িত করে তাদের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকে রূপান্তরিত করতে হবে।
- রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে নারীদের শক্তি ও সম্ভাবনা কাজে লাগাতে হবে। কর্মক্ষেত্রে অংশীদারির মাধ্যমে নারীদের ব্যষ্টিক থেকে সামষ্টিক অর্থনীতিতে আসতে উৎসাহিত করতে হবে। আইন ও সমাজ যেখানে নারীদের সমান নাগরিক হিসেবে শ্রদ্ধা ও সুরক্ষা উভয়ই দেবে।
- আইনের শাসনে বিশ্বাস স্থাপনে আমাদের আবারও দৃঢ় হতে হবে, যেখানে আইন সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হবে; আইন সেখানে অন্যায্যভাবে দলীয় ও ক্রয়যোগ্য হাতিয়ার হবে না।

প্রথম আলোঃ বাংলাদেশের উপর নতুন সমস্যা চেপে বসেছে - রোহিঙ্গা শরণার্থী। উত্তরণের উপায় কী?

রেহমান সোবহানঃ রোহিঙ্গা সংকটে আন্তর্জাতিক মহল যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে, তাতে এ কথা স্বীকার করতে হবে যে মিয়ানমারের উপর চাপ বাড়ছে এবং বাংলাদেশ সঠিক পথেই আছে। যুক্তরাষ্ট্রে থাকতে দেখেছি নিউইয়র্ক টাইমস এক দিন পরপর রোহিঙ্গাদের নিয়ে উপসম্পাদকীয় ছেপেছে। কিন্তু সমস্যা হলো মিয়ানমারের প্রতিবেশী চীন মিয়ানমারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করছে। অন্যদিকে ভারত সতর্ক পা ফেলছে। মিয়ানমারে দু'টি দেশেরই প্রচুর বিনিয়োগ আছে। তারপরও চীন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ঢাকা সফর করেছেন। আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে। রোহিঙ্গা সংকটে আমাদের অর্থনীতিতে যে

চাপ পড়ছে সেটি হয়তো সামাল দেওয়া যাবে। আমাদের অর্থনীতি খুব ছোট নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপদের শঙ্কাই বেশি। অতএব মিয়ানমারের উপর চাপ বাড়াতে হবে, যাতে তারা রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

রেহমান সোবহান: আপনাকেও ধন্যবাদ।

১৬ *ডিসেম্বর* ২০১৭
প্রথম আলো

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বিরাট চ্যালেঞ্জ

রওনক জাহান

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর সম্মাননীয় ফেলো রওনক জাহান ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে কর্মরত ছিলেন। ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। বাংলাদেশের উইমেন ফর উইমেন-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, এশিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া প্রোগ্রামের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য রওনক জাহান আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত বেশকিছু গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের লেখকও।

অধ্যাপক রওনক জাহান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও রাজনীতিকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সংকট ও এর সমাধান নিয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎকার পাঠকদের কাছে তুলে ধরা হলো।

আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যা 'winner takes all'। এখানে নির্বাচনে যে দল হারছে তারা প্রায় সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে আমাদের নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসকগণ সামরিক শাসকদের অনেকের অগণতান্ত্রিক চর্চা পরিত্যাগ তো করেইনি বরং এগুলোকে তারা লালন করে নিয়মে পরিণত করেছেন। সংসদে একটি কার্যকর বিরোধী পক্ষের অভাবে আমরা সরকার প্রক্রিয়ার ভেতর কোনোরকম 'ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ' (check and balance) পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি। যা গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আগামীর বাংলাদেশ আর আমাদের

চলমান সংকটের নেপথ্যে কি? এমন নানা প্রশ্নে খোলামেলা কথা বলেছেন অধ্যাপক রওনক জাহান।

আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যা কোথায়?

১৯৯১ এর পর থেকে আমরা নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা করছি। নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর। নির্বাচনে এক দল হারবে, এক দল জিতবে। যারা একবার হারল তারা এর পরের বার আবার জিততেও পারে। নির্বাচনী গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতে পারে, তবে সেই প্রতিযোগিতা কখনো সংঘাতে পরিণত হওয়া উচিত নয়। আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যা হলো আমাদের নির্বাচনী প্রতিযোগিতা একটি প্রচণ্ড সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি করেছে। যারা নির্বাচনে জিতছেন তারা যারা হারছেন তাদের প্রতি অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক আচরণ করছেন। বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মী জেলে যাচ্ছেন, কিংবা মামলায় পড়ছেন। আমাদের এই 'winner takes all' রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে দল হারছে তারা প্রায় সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। সংঘাতের রাজনীতির ফলে দুই প্রধান দলের মধ্যে বাদানুবাদ কখনই রাজনৈতিক সংলাপের মধ্যে দিয়ে সমাধান করা যাচ্ছে না। রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু একটি ব্যবস্থা সকল দলকেই মানতে হবে যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে এই সব মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং সমাধানের বিভিন্ন পথ খুঁজে বের করা যায়। আমাদের দেশের রাজনীতির মূল সমস্যা হলো সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিভেদগুলোর সমাধান করতে পারা যায় এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়।

আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায়?

গত ৪৭ বছর ধরে আমরা রাজনীতি চর্চা এবং শাসনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু রীতিকে নিয়মে পরিণত করেছি যেগুলো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। এর মধ্যে কিছু রীতি সামরিক শাসন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি; দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসকগণ সামরিক শাসকদের অনেক অগণতান্ত্রিক চর্চা পরিত্যাগ তো করেইনি, বরং এগুলোকে তারা লালন করে নিয়মে পরিণত করেছেন।

রাষ্ট্রপুষ্ট দল গঠন করা সামরিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। যখন কোনো সামরিক শাসক নিজেদেরকে বেসামরিক করে তোলার চিন্তা করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন তারা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠন করে। জিয়াউর রহমান গঠন করেছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আর এরশাদ গঠন করেছিলেন জাতীয় পার্টি। দুঃখের বিষয় সামরিক শাসনের অধীনে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবহার করে জনসমর্থন ধরে রাখার সংস্কৃতিটি সামরিক শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশ দলীয়করণ করার মাধ্যমে এবং বিজয়ী রাজনৈতিক দল বা জোট সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে ১৯৯১ এর পর থেকে নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রে এই চর্চা আরো শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারগুলো জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন এবং নিম্ন আদালতসমূহকে রাজনীতিকরণের প্রয়াস চালিয়ে গেছে। ক্ষমতাসীন দল বা দলগুলোর সমর্থকদের পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং যাদেরকে বিদায়ী সরকারের অনুগত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে বা বর্তমান সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করছে বলে মনে করা হয়েছে তাদেরকে শাস্তির মুখোমুখি করা হয়েছে। আইন প্রয়োগ ব্যবস্থাকেও দলীয় করার চেষ্টা হয়েছে।

বর্তমান সংসদের আগ পর্যন্ত সংসদীয় বিরোধীপক্ষ সবসময় দাবি করে এসেছে যে, সংসদে তাদের কথা বলার যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয় না, ফলে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জন করেছে এবং এর পরিবর্তে রাজপথে নির্বাচিত সরকারের পদত্যাগ বা নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দিয়েছে। সংসদে একটি কার্যকরী বিরোধীপক্ষের অভাবে আমরা সরকার প্রক্রিয়ার ভেতরে কোনো রকম 'ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ' (check and balance) পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি, যা গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নির্বাহী বিভাগের কার্যক্রম খুঁটিয়ে দেখা এবং এটিকে জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান হলো জাতীয় সংসদ। সংসদীয় তদারকির অভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের অধীনে নির্বাহী বিভাগ উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। প্রশাসন, পুলিশ ও নিম্ন আদালতসমূহ প্রতিনিয়ত দলীয় রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হয়, ফলে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েছে।

রাজনীতি আবারো সংকটে - বারবার দেশ একইরকম পরিস্থিতির দিকে কেন ফিরছে?

আমি আগেই বলেছি যতদিন পর্যন্ত না সব রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐকমত্যে না পৌঁছাতে পারবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বারে বারে এই সংকটে পড়বো।

অনেকেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের কথা বলে থাকেন - আপনি কি এতে কোনো সমাধান দেখেন?

না, আমি এতে কোনো সমাধান দেখি না। আমাদের বিরোধী দলের সাংসদরা ১৯৯৪ সালের পর থেকে ২০১৪ প্রায় বিশ বছর, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম - চার চারটি সংসদে ক্রমাগত একই ব্যবহার করেছেন। তারা নির্বাচিত হয়েও সংসদ বর্জন করেছেন এবং সংসদকে কার্যকর করার চেষ্টা করেননি। রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে একপক্ষ বিশিষ্ট সংসদ কার্যকরী হতো। দ্বিকক্ষ হলেই যে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। উপরন্তু আর একটি কক্ষের সাংসদরাও নিজেদের সুযোগ-সুবিধা এবং প্রভাব বিস্তারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারেন। তাতে আমাদের রাজনীতির গুণগত কোনো পরিবর্তন হবে না।

উন্নয়ন আগে, গণতন্ত্র পরে - এ কথাটি নানাভাবে আলোচনায়। আপনার কি মনে হয়?

এই আলোচনা একেবারেই অবান্তর এবং যুক্তিহীন। দু'টিই একে অপরের সম্পূরক। দু'টিই জনগণ চায় এবং এক সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

দেশ আবারো একদলীয় শাসনের দিকে এগুচ্ছে বলে আপনি বলেছেন - কেন এমনটা মনে হচ্ছে?

দেশ একদলীয় শাসনের দিকে এগুচ্ছে এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় আমাদের দেশে বহুদলের মধ্যে একটি মাত্র দল (আওয়ামী লীগ) প্রধান ছিল যেমন ভারতে স্বাধীনতার পর বহু বছর কংগ্রেস এরকম অবস্থায় ছিল। ১৯৯১ এর পর থেকে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে দু'টি প্রধান দল (আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি) পালা বদল করে ক্ষমতায় এসেছে। তখন মনে হচ্ছিল আমরা যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাজ্যের মতো দুই প্রধান দল বিশিষ্ট দলীয় ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ২০০৮ এর পর থেকে বিএনপি আর ক্ষমতায় আসেনি। বর্তমানে তাদেরকে অনেক দুর্বল মনে হয় এবং দেশে এখন আবার বহুদলের মধ্যে একটি দল (আওয়ামী লীগ) প্রধান হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। একদলীয় শাসন এবং বহুদলের মধ্যে একটি প্রধান দলের শাসন দু'টি দুই রকম দলীয় ব্যবস্থা।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যেদিকে এগুচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে বলে মনে করেন?

স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এখনো আমাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

২৭ মার্চ ২০১৮
মানব জমিন

বাংলাদেশের ‘উন্নয়ন’ উড়োজাহাজের দুই ইঞ্জিনের একটি প্রায় বিকল

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

অর্থনীতিবিদ ও নীতি বিশ্লেষক। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো। জাতিসংঘসহ জেনেভা ও ভিয়েনাস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়নসংক্রান্ত সংস্থা আঙ্কটাডের (ইউএনসিটিএডি) গভর্নিং বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আঙ্কটাড মহাসচিবের স্বল্পোন্নত দেশসংক্রান্ত বিশেষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। জেনেভায় জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমন্বয়কও ছিলেন। আন্তর্জাতিক জার্নালে তার বহু গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়। বাংলাদেশের উন্নয়ন বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, প্রবৃদ্ধির গুণগত মান, আয় ও ভোগবৈষম্য বৃদ্ধি, সুশাসন সূচকের অবনতি, সামাজিক সুসঙ্গতির অভাবসহ বিভিন্ন বিষয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে এ অর্থনীতিবিদের কথা হয়।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা।

বলা হয় স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি অর্জন করেছে। অথচ আমরা অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছি। উন্নয়নের এ বিশ্লেষণকে আপনি কীভাবে দেখেন?

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তিন দশক ধরে প্রতিটি দশকে ১ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করতে আমরা

সক্ষম হয়েছি, যা একটি অনন্য ঘটনা বটে। সাম্প্রতিক পাঁচ বছরে এটি আরো ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের কিছু লক্ষণও আমরা দেখেছি। চার দশক আগে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ ছিল আমাদের দেশজ আয়ের প্রায় ৮ শতাংশের উপর। এখন সেটি ২ শতাংশের নিচে নেমে গেছে। একসময় বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রায় ১৪ দশমিক ৫ শতাংশই যেত বিদেশি সংস্থাগুলোর দায়দেনা পরিশোধ করতে। এখন সেটি রেমিট্যান্স ও রফতানির মোট আয়ের ২ শতাংশের নিচে নেমে এসেছে। পাকিস্তান শাসনামলে আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ ছিল, বর্তমানে তা আমরা ১ দশমিক ৩ শতাংশে নামিয়ে আনতে পেরেছি। একটা সময় ছিল যখন দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের দু'বেলা আহারের ব্যবস্থা করা যেত না। এখন ১৬ দশমিক ২ কোটি মানুষকে তিনবেলা খাওয়ানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গত দুই দশকে খাদ্য উৎপাদনে বড় ধরনের অর্জন আছে আমাদের। পৃথিবীর বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশ যেখানে প্রাথমিক পণ্য রফতানি করে, সেখানে আমরা সব রফতানি পণ্য প্রক্রিয়াকরণ করছি। তাছাড়া শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে আমাদের বড় ধরনের অর্জন রয়েছে। আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছি, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসছি।

এখন বিষয় হলো, উন্নতির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ তুলনার মাপকাঠি কী? আমরা যদি অতীতের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে আগের চেয়ে আমরা অনেক ভালো করেছি - এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যদের সঙ্গে যদি তুলনা করি, তাহলে কোন দেশ ও কোন সময়ের সঙ্গে তুলনা করছি তা বিবেচ্য। দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, তাহলে একটা সময়ে তাদের চেয়ে আমাদের মাথাপিছু আয় বেশি ছিল। এখন আমরা দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় মাথাপিছু আয়ে অনেক পিছিয়ে আছি। আবার আফ্রিকার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্জন অত্যন্ত ঈর্ষণীয়। আবার যদি সমসাময়িক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে নিজেদের তুলনা করি, তাহলে দেখা যাবে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। আমরা ৩০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করছি অথচ আমাদের চেয়ে ছোট দেশ প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার রফতানি করে। এখানে তুলনীয় মাপকাঠিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশ যখন নিজেদের অর্জনকে বড় করে দেখাতে চায়, তারা দুর্বলতরদের সঙ্গে অথবা বিগত কালের সঙ্গে তুলনা করে।

আমরা যারা পেশাদার অর্থনীতি বিশ্লেষক, তারা বেশি গুরুত্ব দেই সম্ভাবনার কত অংশ রূপায়ণ করতে পারলাম আর কী সুযোগ রূপায়ণ করতে পারলাম না তার উপর।

বাংলাদেশের এ উন্নয়নকে কি আমরা বিস্ময়কর বলব? বিস্ময়ের ব্যাপারটা উঠেছে এজন্য যে, নব্বইয়ের দশক থেকে বিদেশি দাতাগোষ্ঠী জোর দিচ্ছিল যে, সুশাসন যদি

না থাকে তাহলে প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন তথা উন্নয়ন হবে না। বাংলাদেশের সুশাসনের সূচকগুলো খুব আশাব্যঞ্জক নয়, এটি সবাই জানে। তার পরও দুই দশক ধরে বাংলাদেশ ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের মানব উন্নয়নের সূচকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু সুশাসনের সূচকে অনুরূপভাবে উন্নতি হয়নি। সুশাসন ছাড়া বাংলাদেশ কীভাবে উন্নয়নের সূচকে এগিয়েছে, এটাই বিস্ময়। কীভাবে শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতি সাধন হলো! কীভাবে শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ল! সুশাসন না থাকলে দুর্বল জনগোষ্ঠীর কাছে এগুলো পৌঁছানোর কথা নয়। দারিদ্র্য বিমোচন হওয়ার কথা নয়। এ বিষয়গুলো কীভাবে সম্পাদিত হলো, এটিই বিস্ময়।

এক্ষেত্রে আপনার ব্যাখ্যা জানতে চাইছি -

এক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। একটি হলো, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোয় সুশাসনের যে সূচক দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়, বিশেষ করে বিশ্বব্যাংকের যে সূচকটি রয়েছে, সেটা যথোপযুক্ত কিনা? কিংবা সুশাসনের মূল ভূমিকাটি তারা ধরতে পারে কিনা? এখানে নাগরিক সমাজ ও মিডিয়ার ভূমিকা যদি যথাযথভাবে ধরা না হয়, তাহলে আমাদের যে অগ্রগতি হয়েছে, তা ধরা সম্ভব হবে না। কারণ বাংলাদেশে সুশাসন কম থাকলেও সাধারণভাবে মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো এক ধরনের জোরদার ভূমিকা পালন করে এসেছে, যেটি ওই সূচকে ধরা পড়ছে না। সুশাসনের ঘাটতির পরও উদ্যোক্তা শ্রেণি এক ধরনের 'রাজনৈতিক বন্দোবস্তের' (পলিটিক্যাল সেটলমেন্টের) মাধ্যমে অর্থনীতি সচল রাখে। তাই প্রথম ব্যাখ্যাটা হলো, সূচকটির ভেতরে কোনো সমস্যা রয়েছে কি না। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হলো, দেশের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য আছে কিনা। ইংরেজিতে যাকে আমরা বলি 'কন্টেক্সচুয়াল পিকিউলারিটিস'। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশগুলো তুলনীয় কিনা, ঔপনিবেশবাদের যে অবশিষ্টাংশ রয়েছে, সেটি তারা কীভাবে করেছে, ওই দেশের ভেতরে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ক্ষেত্রেও যে মাত্রার তফাত রয়েছে, সেই মাত্রার পার্থক্যগুলোকে আমরা ধরতে পারি কিনা এ সূচকের মাধ্যমে। সে দেশের বৈশিষ্ট্য যেমন - শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য ইত্যাদিও বিবেচনায় আনতে হবে।

তৃতীয়ত, সুশাসনের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও আমরা বেশ ভালো করছি। কিন্তু সুশাসনের সূচকটা যদি ভালো হতো তাহলে আমরা আরো অনেক ভালো করতাম, অনেক বেশি অবদান রাখতে পারতাম। আমরা বলি যে, দুর্নীতি যদি চলে যেত তাহলে বাড়তি ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হতো। তবে প্রবৃদ্ধি ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেত কি পেত না, এটা নিশ্চিত করে আমি বলতে পারব না। তবে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সূচক সেটা হলো, কয়েক দশক

ধরে মোটামুটিভাবে যে শোভন প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তার ফলে দেশের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলোর কতখানি উন্নয়ন হলো, তা দেখতে হবে। আমরা জানি যে, দেশে সাম্প্রতিককালে আয়বৈষম্য বেড়েছে ভোগবৈষম্যের চেয়ে বেশি। আর সম্পদের বৈষম্য বেড়েছে আয়বৈষম্যের চেয়ে বেশি।

বাংলাদেশ এখন একটা সন্ধিক্ষণে রয়েছে, সেখানে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ নিয়ে আলোচনা না করে প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। এখন বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির গুণগত মান নিয়ে আলোচনা করার মতো অর্জন বা ভিত্তি রয়েছে। বলা হয়ে থাকে, কেকটা আগে বড় করে তারপর ওটা কীভাবে কাটা হবে তা নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এখন আমরা বলতে চাই, কেকটা এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে, এখন ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়টি আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। কারণ এটা বড় করার জন্য যে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তার কাছে ওটা আমরা পৌঁছে দিতে পারছি কিনা, তা এখন আমাদের জন্য একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্যই সাম্প্রতিককালে যেটি আমাদের সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে তা হলো, পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৬ সালের খানা জরিপ। এর সঙ্গে রয়েছে সর্বশেষ শ্রম জরিপের ফলাফল। শ্রম জরিপে আমরা দেখছি, প্রবৃদ্ধি হচ্ছে কিন্তু আগের মতো কর্মসংস্থান হচ্ছে না। গত বছর আমরা যখন এটি বলেছি, তখন কেউ তা স্বীকার করতে চায়নি। এখন সরকারি তথ্য - যে তথ্য নিয়ে বহু সংশয়, বহু বিতর্ক রয়েছে - আমাদের দেখাচ্ছে যে, উপাদানের একক প্রতি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আমরা দুর্বল হয়ে গেছি। তার মানে কোথাও প্রবৃদ্ধির অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রের পরিবর্তন আসছে এবং প্রশ্ন হলো, আগামীতে এটি কোন অবস্থায় যাবে। দেখতে হবে আগামীতে কোন খাতে আমরা প্রবৃদ্ধির জন্য জোর দেব। সেবা খাত প্রাধান্য পাচ্ছে, শ্রমঘন প্রক্রিয়াজাত খাতের দিকে বেশি মনোযোগী হচ্ছি না। এ প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তি কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে, সে প্রযুক্তির কারণে কর্মসংস্থানের হার কমে যাচ্ছে কি না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে কিন্তু সে হার হয়তো এখন শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন যে, দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আপনি যত অবশিষ্টাংশের দিকে এগোবেন, তত এর হার কমবে। ২০ শতাংশকে ১০ শতাংশ করা যত সহজ, ৫ শতাংশকে আড়াই করা তত সহজ নয়। বিষয় হলো, বাংলাদেশ সেই পর্যায়ে পৌঁছেছে কি না। তার পরও যে প্রশ্নটি থাকে তা হলো, দারিদ্র্য বিমোচনের হার যেভাবে কমছে, হতদরিদ্রদের অবস্থা সে অনুযায়ী বিমোচন হচ্ছে কি না? এর পরে আসছে দারিদ্র্যের ভৌগোলিক চেহারা। এ ছোট দেশের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করছি, উন্নয়নের অসক্ষমতা মাধ্যমে এক ধরনের ভৌগোলিক বিভাজন সৃষ্টি হচ্ছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি আরো বেশি আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে তা হলো, যত ভোগবৈষম্য বাড়ছে, তার চেয়ে দ্রুততর হারে আয়বৈষম্য বাড়ছে এবং তার চেয়ে আরো অনেক বেশি হারে বাড়ছে সম্পদের বৈষম্য। প্রশ্নটি আসছে, তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চরিত্র কী? যার ফলে সবক্ষেত্রে এ রকম বৈষম্য বাড়ছে? বিষয়টি মারাত্মক। কিছু ব্যাখ্যা চটজলদি দিতে পারি। যেমন বড় ধরনের কর ফাঁকি দেওয়া হয়েছে। আর ওই লোকগুলোর কিছু নামই পানামা বা প্যারাডাইস পেপারসে রয়েছে। এরা সরকারকে নিয়ম অনুযায়ী কর দেয়নি, হয়তো টাকাটাই ছিল কালো, সরকারও গরিব মানুষের পক্ষে টাকা খরচ করতে পারেনি। হতে পারে, ব্যাংক থেকে যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লুটপাট করা হয়েছে, সেই টাকা তাদের বৈভবকে আরো স্ফীত করেছে কিংবা হাজার হাজার কোটি টাকার বড় বড় সরকারি অতি অর্থায়িত প্রকল্পের তছরুপকৃত টাকা এটি।

এ ছাড়া আরো একটি বিষয় ঘটতে পারে। যেভাবে আমরা প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি, এ প্রবৃদ্ধির চরিত্রটিই এ রকম যে, এটা কেবল উচ্চবিত্ত মানুষদের আয় বৃদ্ধি করে না, তাদের সম্পদের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। এ জায়গাটায় গভীর বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে। আমাদের দেশের নীতিনির্ধারকরা প্রবৃদ্ধির গুনগত মান নিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত নন। তারা এটাকে খুবই সংকীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন। আমরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি, পৃথিবীর ইতিহাস বলে, যে দেশে বৈষম্য বাড়ে, সেই দেশে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো দুষ্কর। লাতিন আমেরিকার দেশগুলো এখানে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আয়বৈষম্য রয়েছে লাতিন আমেরিকার মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় এবং তারা 'মধ্যম আয়ের ফাঁদে' আটকে থেকে উচ্চ আয়ের দেশ হতে পারছে না। বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। লাতিন আমেরিকার যা বর্তমান, বাংলাদেশের ভবিষ্যতে তা হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি বলব, যদি বাংলাদেশের ভবিষ্যেক দেখতে চান, তাহলে লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর দিকে তাকান। ২০১০ থেকে ২০১৫ - এ সময়কাল প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের যে বিরাট অবনতি হয়েছে, তা নিয়ে আমরা চিন্তিত।

বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন?

২০০৫ থেকে ২০১০ সাল সময়কালে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সম্পদবৈষম্য, আয়বৈষম্য ও ভোগবৈষম্যের হারে তেমন কোনো বড় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ২০১০ পরবর্তী সময়কালে এ বৈষম্যগুলো দ্রুততার সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৫ থেকে ২০১০ এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ - এ সময়কালে এ বৈষম্যের ভিন্ন চিত্র লক্ষণীয়। দু'টি সময়কাল কিন্তু প্রায় একই সরকারের আমলে। আগের পাঁচ বছরের সঙ্গে

পরের পাঁচ বছরের কী পার্থক্যটা হলো যে, বৈষম্য এই পরিমাণে বেড়ে গেল! বিষয়টিতে কিন্তু সরকারেরই দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত, কারণ সরকারি তথ্যই বৈষম্য বাড়ার কথা বলছে। আমরা দেখছি, বর্তমানে নিম্নতম ৫ শতাংশ মানুষের আয়ের চেয়ে বিত্তশালী ৫ শতাংশ মানুষের আয় ১২১ গুণ বেশি আর তা সম্পদের ক্ষেত্রে প্রায় ২ হাজার ১০০ গুণ! ফলে যে বিষয়টি সামনে আসছে তা হলো, বাংলাদেশের আগামী দিনের চেহারা কী? এটা কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, সাধারণভাবে বাংলাদেশ কি ক্রমান্বয়ে এ বৈষম্যক্লিষ্ট, অসম সুযোগের সমাজে পরিণত হলো? পিছিয়ে থাকা মানুষগুলোর কি আরো তুলনামূলক প্রান্তিকীকরণ হবে? আরো চিন্তার বিষয় হলো, প্রবৃদ্ধিকে পরবর্তী ধাপে নেওয়ার জন্য অর্থনীতিতে যে ধরনের কাঠামোগত ও নীতি সংস্কার দরকার, যে ধরনের গুণমানসক্ষম প্রতিষ্ঠান দরকার, তা আমরা করতে পারছি না। ২০০৫ থেকে ২০১০ এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ - এ সময়কাল দু'টির পার্থক্যের একটি বড় ব্যাখ্যা হলো, প্রতিষ্ঠানিক অবক্ষয়। আর অন্য ব্যাখ্যাটি হলো, সমাজে বিকল্প মত প্রকাশের জায়গাটা সংকুচিত হয়ে যাওয়া। এ পরিস্থিতি ও প্রবণতার পরিবর্তন না হলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রগতি নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দিতে পারে।

স্মরণ করা যায়, নব্বইয়ের পর বেশকিছু সংস্কার হয়েছে। আমাদের ভ্যাট আদায়ে প্রচলিত টাকার ভাসমান বিনিময়হার পেয়েছি। ব্যক্তিখাতের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশকিছু ক্ষেত্রে আইন, নীতি ও প্রবিধানের সংস্কার করা হয়। ফলে অর্থনীতির ছাদটা একটু উঁচু হয়েছিল। আমরা নিচে থেকে উপরের দিকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাই। সাম্প্রতিক কালে জায়গাটা আমরা ব্যবহার করে ফেলেছি বা নিঃশেষ করেছি। এখন যদি আমরা উপরে উঠতে চাই, তাহলে নীতি-প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের মাধ্যমে ছাদটাকে আরো উপরে তুলতে হবে। বৈষম্য বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের পাশাপাশি আমরা একটা বৈরী বৈশ্বিক পরিস্থিতির ভেতরে প্রবেশ করেছি। বর্তমান বিশ্বে উন্নয়ন সহমর্মিতা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য আগামীতে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার ফলে বাংলাদেশ যে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তাকে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতির ব্যাপার রয়েছে। এক কথায় আমাদের বড় অর্জন আছে, গর্ব করার মতো সাফল্য আছে কিন্তু সাম্প্রতিক কালে সেই অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর সুফল বিতরণ এবং সামাজিক ন্যায়নীতির বিষয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন উঠছে। এবং এ কারণেই আগামী দিনের প্রবৃদ্ধির মাত্রা ও মান রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো স্বল্পমেয়াদি হয়। পাঁচ বছর ব্যাপ্তি ধরে একটি পরিকল্পনা করতে পারলেও তা ফলপ্রসূ হতে পারে, কিন্তু আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো হয় কয়েক মাসের জন্য -

বাংলাদেশের জীবনচক্রটা এখন অনেক পরিমাণে স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক চক্র দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়, সেহেতু কেউই ভবিষ্যতের জন্য সামাজিক প্রথা, রাষ্ট্রীয় নীতি ও প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা রাখতে পারছে না। এ মনোভঙ্গিতে দীর্ঘমেয়াদে উন্নয়ন চিন্তার সুযোগ কম। তবে অর্থনৈতিক বিষয়ে এক ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা দেখা যায়। আগে সরকার বদল হলে নীতি বদল হতো, তারপর সরকার বদল হলে নীতি ঠিক থাকত কিন্তু প্রকল্প বদল হতো। এখন নীতিও বদল হয় না, প্রকল্পও বদল হয় না; বদল হয়ে যায় ঠিকাদার।

বর্তমান অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিটা রেমিট্যান্স ও পোশাক শিল্পনির্ভর। ভবিষ্যতে এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হব। এটা যদি আমরা টিকিয়ে রাখতে না পারি, সেক্ষেত্রে কী ধরনের পরিণতি হবে?

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্যাগুলোকে দু'ভাবে দেখা যায়। একটি হলো, কাঠামোগত মধ্যমেয়াদি সমস্যা। পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন বাজার সৃষ্টি করা, রফতানি পণ্য বৃদ্ধি, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এক ধরনের কাঠামোগত সমস্যা। অন্য সমস্যাটি হলো, স্বল্পমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যদি দুর্বল হয়ে যায়, রাজস্ব আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকে, সুদের হার বেড়ে যায় ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে চলতি হিসাব নেতিবাচক হয়ে গেছে। এর কারণ কি মধ্যমেয়াদি সমস্যা প্রকট আকারে দেখা দিচ্ছে, নাকি চলতি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা? আমরা বলছি দু'টোই সঠিক। বাংলাদেশ নামক উড়োজাহাজটি এখনো এক ইঞ্জিন তথা সরকারি বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে, অপর ইঞ্জিন ব্যক্তিবিনিয়োগে রয়ে গেছে নিরুদ্যম। এক ইঞ্জিনে কি প্লেন ওড়ে?

প্রথমে এক পায়ে হাঁটার কথায় আসি। রফতানি ও রেমিট্যান্সের উপর জোর দিয়ে দেশের ১৬ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে মূল প্রতিবন্ধক হলো, আমাদের প্রতিযোগিতাসক্ষম গুণগত মানসম্পন্ন মানবসম্পদ নেই। ডিগ্রিধারী লোক হলেই কেউ শিক্ষিত হয় না। এজন্য পোশাক শিল্পে দেশের বাইরে থেকে কর্মকর্তা-কর্মচারী আনতে হচ্ছে। গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব, এটি কাঠামোগত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। তবে মূল বিষয় হলো, রফতানির পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ বাজারের সম্প্রসারণে জোর দিতে হবে। এজন্যই প্রয়োজন বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে রাখা, অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি।

আরেকটি উদাহরণ দিই। উড়োজাহাজের প্রথম ইঞ্জিনের শক্তি ছিল সরকারি বিনিয়োগ। রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি হলো। দ্বিতীয় ইঞ্জিনের শক্তি বেসরকারি বিনিয়োগ। কিন্তু দশ

বছর ধরে ব্যক্তিবিনিয়োগের একটি ইঞ্জিন প্রায় বিকল। তাহলে কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। এটা কি স্বল্প, মধ্য, নাকি দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা? বাংলাদেশে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি সমস্যাগুলো ক্রমান্বয়ে প্যাঁচ খেয়ে যাচ্ছে। যদি আগামী দিনের উন্নয়ননীতি চিন্তা করতে হয়, তাহলে অনেক বেশি অভ্যন্তরীণ বাজারমুখী চিন্তা করতে হবে।

এখন যে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি হচ্ছে, তারা ব্যক্তিখাতে, করপোরেট সেক্টরে চাকরি করছে। তারা কিন্তু দেশের স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে খুশি নয়। আবার সিঙ্গাপুর কিংবা ব্যাংককে গিয়ে দীর্ঘমেয়াদে নিজের চিকিৎসা করানোর সামর্থ্যও তাদের নেই। দেশের ভেতরে তারা একটি মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা চায়। একই সঙ্গে দেশের ভেতরে মানসম্পন্ন গণপরিবহন, মানসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চায়। নতুন এ চাহিদাটাকে বুঝতে হবে। কারণ নতুন এ চাহিদাই কিন্তু নতুন বাজার। কিন্তু আমাদের যে প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়, সামাজিক পুঁজির অবক্ষয়, সেখানে নতুন বিকাশমান মধ্যবিত্তকে স্থান করে দেওয়া সম্ভব হয় না। আগে বলা হতো, সর্বহারা হলো সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। এখন নতুন তত্ত্ব হচ্ছে, বিকাশমান মধ্যবিত্ত সমাজ পরিবর্তনের নিয়ামক শক্তি। এ মধ্যবিত্ত বিশ্ব সম্পর্কে ধারণা রাখে, নিজের অর্জন সম্পর্কে আস্থাবান। সে কেবল বেতন পেয়ে শান্তি পায় না; সে কথা বলতে চায়, মতামত প্রকাশ করতে চায়, পৃথিবীর সঙ্গে তার অবস্থার তুলনা করতে চায়। এটিই হলো বাংলাদেশে আগামী দিনের বড় শক্তি। এ শক্তিটাকে স্বীকার করতে হবে। তাকে জায়গা করে দিতে হবে। বিকাশমান মধ্যবিত্তকে ধরে রাখার জন্য অভ্যন্তরীণ বাজারভিত্তিক উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, সামাজিক পুঁজি ইত্যাদির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মধ্যম আয়ের দেশের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো, বিকাশমান মধ্যবিত্তকে সে সবসময় জায়গা করে দিতে পারে না। সে অপরিকল্পিত নগরায়ণ করে, আয় ও সম্পদবৈষম্য সৃষ্টি করে; গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা দিতে পারে না, ঠিকমতো অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে পারে না, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সে তার কথা বলার জায়গাটার প্রতিফলন দেখতে পায় না। আরব বসন্তের নেপথ্যেও ওই একই বিষয় কাজ করেছে। তাই বিকাশমান মধ্যবিত্তের রোষ থেকে সাবধান!

দুই যুগ ধরে সৎভাবে ব্যবসা করে একজন ব্যবসায়ী যে অবস্থানে এসেছেন, এখন একটি ব্যাংক কিংবা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে অনেকেই অল্প সময়ে সমপরিমাণ আয় করছেন -

ব্যক্তিখাতে পুঁজির মধ্যমেয়াদি সমস্যা হলো, তারা বিশ্বাস করে না যে, বাংলাদেশে একটি নিয়ম-নীতিভিত্তিক বাজার ব্যবস্থা চালু থাকবে। মেধার ভিত্তিতে সে স্বীকৃতি পাবে। তারা

বুঝে গেছে প্রভাব বলয়ের বা রাজনৈতিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেই কাজ হবে। এটি আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য খুবই ভুল সংকেত দেয়। একটি বাজার অর্থনীতি সঠিকভাবে গড়ে উঠতে হলে তার যেমন রাজনীতি দরকার, তেমনি দরকার নৈতিক ভিত্তি। এটি কিন্তু চতুর্থ উপাদান। আর নৈতিক ভিত্তিটা হলো, পরিশ্রম করলে আমি মূল্য পাব। আমি যদি মেধাবী হই, তাহলে দেশের কাজে লাগতে পারব। আমার উদ্যম, উদ্যোগ আমাকে সামনে নিয়ে যাবে। মেধা, সৃজনশীলতা, উদ্যম, উদ্যোগ- এগুলো বাধাগ্রস্ত হবে না। সামাজিক নিয়মনীতি এগুলোকে সমর্থন করবে। সমাজের ভেতরে যদি সততা, মেধার দাম না থাকে, তাহলে তা ঠিক প্রতিযোগিতামূলক বাজারভিত্তিক সমাজের ভিত্তি হয় না; আদিম পুঁজি হরণের যুগে চলে যায়। আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাকরণ বলে, এ প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদে থাকার ফলে এমন একটি দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে, যে দ্বন্দ্ব অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অনেক অর্জনকে আবার খর্ব করে দিতে পারে।

শ্রুতিলিখন: রুহিনা ফেরদৌস

১৭ এপ্রিল ২০১৮
বণিক বার্তা

অস্থির রাজনীতি সুস্থির অর্থনৈতিক চিন্তার অন্তরায়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

আপনি বলেছেন, ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এক ধরনের এবং ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। এর পেছনে রাজনীতির পরিবর্তনের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করেন কি?

এ পর্যায়ে আবারো সুশাসনের বিষয়টি আসবে। আমরা তো প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার অর্থনীতি নিয়ে এগোতে চাইছি। বাজার অর্থনীতিকে যদি পরিপূর্ণ করতে হয়, তার অন্যতম পরিপূরক হলো প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি। প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি না থাকলে আপনি বাজার অর্থনীতিকে প্রতিযোগিতাপূর্ণ করতে পারেন না। তখন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষ সম্পদের উপরে এক ধরনের একচেটিয়া অধিকার আরোপ করতে পারে। তাই প্রশ্ন হলো, আমরা কি বাংলাদেশে ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি? এটি স্বজনপ্রীতির চেয়েও বড় বিষয়; ক্রোনি ক্যাপিটালিজমের মানে দাঁড়ায় ঘনিষ্ঠ তোষণ। অর্থাৎ এখানে আপনি এমন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেন, যার মাধ্যমে সম্পদের অভিগম্যতাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ অবস্থায় প্রতিযোগিতাপূর্ণভাবে সবাই সমান সুযোগ পায় না; শুধু যারা এ প্রভাব বলয়ের সঙ্গে যুক্ত, তারা এর দ্বারা নিয়মবহির্ভূতভাবে উপকৃত হয়। এরাই ব্যাংকের লাইসেন্স পায়; আবার ঋণখেলাপি হয়েও পার পেয়ে যায়। যে দেশে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে দমন করা হয়, মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, আমলাতন্ত্রের রাজনীতিকীকরণ হয়, বিচার ব্যবস্থা চাপের মুখে থাকে এবং নাগরিক সমাজের কণ্ঠস্বর সীমিত হয়ে যায়, সেখানে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ থেকে শুরু করে ব্যাংকঋণ গ্রহণ- সব ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির বিষয়টি ঘটছে বলে অভিযোগ রয়েছে...

এমনটা অব্যাহত থাকলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বহু সমস্যা তৈরি হবে। প্রথমত, এটি উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে সংকুচিত করবে এবং প্রবৃদ্ধির মাত্রার উপর কুপ্রভাব ফেলবে। প্রবৃদ্ধির গুণগত মানকেও প্রভাবিত করবে, গরিব শ্রেণির কর্মসংস্থান ও আয় কমবে। দেশ থেকে অর্থ পাচার হবে। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের যে সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল, তা রুদ্ধ হবে। দেশের ভেতরে এমন ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হবে, যার ফলে সামাজিক সংহতি দুর্বল হবে; যা সামাজিক অসন্তোষের দিকে যায়। এটিই উন্নয়নের ব্যাকরণ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য এমন একটি পরিণতি অসম্ভব নয়।

আমরা এমন পরিণতিকে এড়িয়ে যেতে পারব কি?

নব্বইয়ের দশক থেকে আমরা দেখছি, যখনই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত সমাজের জীবনমানের ক্ষতি হয়েছে। আগামী দিনে এ জায়গাটায় খুব বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাংলাদেশের আগামী দিনের উন্নয়ন ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক অবকাঠামোর শক্তিমত্তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে আমরা যেভাবে ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামোর দিকে মনোযোগ দিতে পেরেছি, সেভাবে রাজনৈতিক অবকাঠামোয় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয়নি। আর সেটি নিয়ে আলোচনা করার সুযোগও সীমিত হয়ে গেছে, সেটিই চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশের সীমিত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ, বিপুল জনসংখ্যা, প্রযুক্তির নিম্ন প্রসার ইত্যাদি নিয়েও চিন্তা আছে কিন্তু রাজনৈতিক পুঁজি যদি কমে যায় এবং সেটি যদি উন্নয়ন বৈরী হয়ে যায়, তাহলে দুশ্চিন্তার কারণ রয়েছে।

তবে এর মানে এই নয়, বাংলাদেশের কোনো উন্নতি হয়নি বা হবে না। বিষয়টা হলো, এ উন্নতিকে আগামী দিনে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের পক্ষে কীভাবে আমরা উচ্চপর্যায়ে নিয়ে যাব। এটিই আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে সবার অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। কারণ দেশের ভেতরে যদি মৌলিক উন্নতি না হয়, তাহলে ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দল করেন, সেটা আর প্রাসঙ্গিক থাকবে না। যানজট, দূষিত বায়ু, সুপেয় পানির অভাব আমাদের সমানভাবে আক্রান্ত করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সেবা না থাকলে সবচেয়ে বিত্তশালী উদ্যোক্তাও কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত হবেন তার কর্মচারীদের ভেতর দিয়ে। একই সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যদি শান্তিপূর্ণ অবস্থান না থাকে, যদি এর

সঙ্গে জঙ্গিবাদ থাকে, তাহলে এটিও আমাদের সবাইকে সমানভাবে আক্রান্ত করবে। বাংলাদেশের যে অভিন্ন স্বার্থগুলো রয়েছে, আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও এগুলো নিয়ে যে খুব বেশি দ্বিমত আছে তা নয়। কিন্তু সমস্যাগুলোকে অনুধাবন করে একটি জাতীয় ঐকমত্য তৈরির মাধ্যমে একটি টেকসই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একে ধারাবাহিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করব, সেই জায়গাটায় একটি বড় ঘাটতি আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাজনৈতিক নেতারা একই কথা বলেন, একমত হওয়ার মতো ভিত্তি বা জায়গা আমাদের নেই। এর একটি বড় জায়গা হতে পারত জাতীয় সংসদ। এজন্য সংসদের ভেতরে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বারবার অর্থনীতির কথা বলি কিন্তু জিম্মি থাকি রাজনীতির কাছে।

সামাজিক সুসঙ্গতির ক্ষেত্রেও ভাঙন দেখা দিচ্ছে -

সোস্যাল ক্যাপিটাল বা সামাজিক পুঁজির ভেতরে বড় ধরনের অবক্ষয় হচ্ছে, যা সাদা দৃষ্টিতে প্রতিদিন দেখা যায় আর প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত অনুভব করা যায়। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উদ্ভবের কারণ খুঁজলে দেখব, এটি সামাজিক পুঁজির অবক্ষয়ের একটি কারণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরিবার, সমাজ থেকে শুরু করে নীতি, আদর্শের জায়গাগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, তবে এটিও একটি বড় কারণ। একটি বিকাশকামী সমাজকে এগোতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়ম-নীতির ভেতরে থাকতে হবে - এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করা তথা বিচারহীনতার সংস্কৃতি সামাজিক সম্পদ নষ্ট করবে।

সামাজিক পুঁজি ছিল না কিন্তু উন্নয়ন হয়েছে - পৃথিবীতে কোনো দেশে এমনটি আমরা দেখতে পাই না। রাজনৈতিক পুঁজি ও অর্থনৈতিক পুঁজি এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে সামাজিক পুঁজি। এ সেতুটি যদি ভেঙে যায়, তাহলে চেষ্টা করেও রাজনৈতিক পুঁজি বাড়ানো সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, বাংলাদেশে এখন উন্নয়ন আলোচনা হয় খুবই স্বল্পমেয়াদি কাঠামোতে। সিপিডি থেকে যদিও একটি রূপকল্প বা ভিশন ২০০৭ সালে আমরা তুলে ধরেছিলাম, যেখানে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করি। তবে মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের চিন্তাটা অনেকটাই এখন প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা। নতুন বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি বা এসডিজি'র আলোকে সবাই মানবসম্পদভিত্তিক উন্নয়নের চিন্তা করেছি। সেখানে আর্থ-সামাজিক অভীষ্টের সঙ্গে রয়েছে মানবাধিকার, আইনের শাসন, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়। অর্জিত উন্নয়নকে সুষমভাবে ধারণ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির প্রয়োজন। এটি হয়তো আমাদের মতো পেশাজীবীদের ব্যর্থতা, আমরা একে যথেষ্ট

জোর দিয়ে দেশ, জাতি ও নেতাদের বোঝাতে অক্ষম হয়েছি, উন্নয়নটা শুধু মাথাপিছু আয়ের বিষয় নয়। উন্নয়নের মাপকাঠি হলো, যে লোকটি সবচেয়ে বেশি পেছনে পড়ে আছে, তার জীবনমানের পরিস্থিতি। আর এটি বুঝতে হবে তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। আর এ জায়গাটায় আমরা কত দিনে, কীভাবে পৌঁছতে পারব, তা যৌথভাবে চিন্তা করার বিষয় রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যদি শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থিতিশীলতা না থাকে, অস্থির রাজনীতি আমাদের সুস্থির অর্থনৈতিক চিন্তা করতে সাহায্য করে না।

অনেকে বলবেন চার কিংবা পাঁচ বছর ধরে রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও এ অবস্থার সৃষ্টি কেন হলো?

জনমানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজির সৃষ্টি হয়। সামাজিক পুঁজির ঘাটতির একটি বড় জায়গা হলো, সমাজের ভেতরে যেসব প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান থাকে যেমন - ক্লাব ও সমিতি, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান, সংসদ ইত্যাদি - প্রায় সব জায়গা থেকে নির্বাচন উঠে গেছে। এক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে গেছে। ফলে এসব জায়গায়ও সামাজিক পুঁজির বিকাশের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। কেউ যদি এ অবস্থাকে স্থিতিশীলতা বলে, আমি বলব তর্ক-বিতর্কের অভাব, আলোচনার অভাব। আগে ঘর বন্ধ থাকলে, গুমোট লাগলে আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম, এখন আমাদের বারান্দাগুলোও ভেঙে পড়ছে। বারান্দা যদি ভেঙে পড়ে, তাহলে ঘরেও ফাটল ধরবে।

নীতিনির্ধারকরা কেন এটা অনুধাবন করতে পারছেন না? দীর্ঘমেয়াদে এ ক্ষতিটা তো সবাইকেই ভোগ করতে হবে -

এ জায়গাটাতেই বিকাশমান মধ্যবিত্ত আর উচ্চবিত্তের তফাত। বিকাশমান মধ্যবিত্ত এখনো বহুলাংশে বাংলাদেশের ভেতরে তার জীবনটাকে গুছিয়ে নিতে চায়, এখানেই থিতু হতে চায়। আমার দেশের উচ্চবিত্ত অনেক বেশি বৈশ্বিক হয়ে গেছে। সে তার সুযোগটা শুধু দেশের ভেতরে দেখে না। সেজন্য সে স্বল্পসময়ের ভেতরে পুঁজি আহরণ দেখে, অনেক সময় বিনিয়োগ দেখে না। বিনিয়োগ দেখলেও সেটা থেকে পুনর্বিনিয়োগ দেখে না। মধ্যমেয়াদি পরিবর্তনের অংশীজন হয় না। এটি দেশের একটি অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব।

কিন্তু মধ্যবিত্ত তো উচ্চবিত্তকে অর্থ উপার্জনের সুযোগটা করে দিচ্ছে -

আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত তো জিম্মি হয়ে আছে। এখানে আমি যে মধ্যবিত্তের কথা বলছি, সে তো সুশাসনের অভাবের ভুক্তভোগী। সে সরকারি হাসপাতালে গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা পাবে

কি না, তা নিয়ে চিন্তিত। তার আত্মীয়স্বজন ডাক্তার থাকলেও ওয়ার্ডের বিছানার অভাব পূরণ করতে পারছে না। কিন্তু উচ্চবিত্তের ব্যক্তিটি ৬ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে আসতে পারে। চোখের সামনে বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি এ বৈপরীত্য ঘটতে দেখছে, যা সামাজিক অসন্তোষের উৎসমুখ। যে দেশে প্রতি চারজন যুবকের মধ্যে একজন বেকার, বাকি দু'জন পূর্ণভাবে কর্মসংস্থানের মধ্যে নেই, সেখানে সামাজিক অসন্তোষের রূঢ় প্রকাশ অবধারিত। সাধারণভাবে বাংলাদেশ উন্নয়নের একটি উত্তরণ পর্ব পার করে এসেছে কিন্তু দ্বিতীয় উত্তরণের দিকে যেতে হলে প্রথম উত্তরণের অমীমাংসিত যে বিষয় রয়েছে, তার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আর পরবর্তী উত্তরণের নতুন চ্যালেঞ্জগুলোকেও বিবেচনায় নিতে হবে। অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা ও নতুন চ্যালেঞ্জগুলোকে উল্লেখ করা মানে এই নয় যে, পূর্ববর্তী অর্জনকে খাটো করা হচ্ছে; বরং আমাদের অর্জনকে রক্ষা করার চিন্তা থেকেই এ কথাগুলো বলা প্রয়োজন।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এম এম মুসা।

শ্রুতিলিখন: রুহিনা ফেরদৌস

১৮ এপ্রিল ২০১৮
বণিক বার্তা

নির্বাচনী বিতর্কের জন্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

গত দশ বছরের সময়কালে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উচ্চ পর্যায়ে ছিল। এই সময়কালে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা মোটামুটি রক্ষিত হয়েছে, ভৌত কাঠামোতে বড় ধরনের বিনিয়োগের ফলে জ্বালানি সঙ্কট অনেকখানি নিরসন হয়েছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতের ব্যাপকতাও বেশ বিস্তৃত হয়েছে । এর সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষার প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে এক ধরণের রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে এই সময়কালে বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় নিঃসন্দেহে এক মাত্রার বড় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

এখন যে প্রশ্নটি উঠছে, সেটি হলো এর ভেতর কি কোন সীমাবদ্ধতা ও বাঁধা-বিপত্তি নেই? অবশ্যই আছে। এখানে এই সময়কালের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে চাই। একটা বৈশিষ্ট হল, বর্তমান সরকারের মেয়াদ কালের প্রথম ভাগের (২০০৮-২০১৩) থেকে দ্বিতীয় ভাগে (২০১৩-২০১৮) অনেক ক্ষেত্রে কাঠামোগত সংস্কার, নীতি পর্যালোচনা এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে কিছুটা শ্লথ গতি লক্ষ করি। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণগত মানেরও পতন ঘটেছে বর্তমান সরকারের মেয়াদকালের প্রথম অংশ থেকে দ্বিতীয় অংশে। দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে চাই সেটি হলো, দ্বিতীয় ভাগে এসে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক অসাম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিকীকরণের প্রক্রিয়া থামেনি। এই সব নেতিবাচক প্রবণতা বাংলাদেশে সর্বদাই ছিল, কিন্তু ২০১৪-১৫ এর পরের থেকে বৈষম্যের ও অসাম্যের এই ধারা দ্রুততর হয়েছে। আর তৃতীয় বৈশিষ্ট হলো, এই সময়কালে নতুন ধরনের বা মৌলিক কোন নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না। সরকার নতুন উদ্যোগে

যাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যমের কিছুটা ঘাটতি পরিলক্ষীত হয়। ব্যাঙ্কিং খাত, কর ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ব্যয়ের গুনগত মান, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতির আলোকে কোন বাঁক ফেরানো পদক্ষেপ নিতে দেখি না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটির সাথে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্পর্ক আছে কি না।

তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের উদ্দ্যোক্তা শ্রেণির নীতি কাঠামোতে যথেষ্ট স্বাধীন, সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা রাখে না। এই অনুপস্থিতির কারণ হলো উদ্যোক্তাদের নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অভাব। আর দেশের ভেতর রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কমে যাবার কারণে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মাত্রাও কমে গেছে। সিপিডি'র বিভিন্ন প্রতিবেদনে বৈষম্য বাড়া, নীতি উদ্দ্যোগ শ্লথ হয়ে যাওয়া, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গুণগত মানের অবনতি হওয়ার সাথে এ সময়কালে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা হ্রাস পাওয়া এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা যে দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্পর্ক রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আলোচনার বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশে এই মুহূর্তে নির্বাচনী প্রচারণা যেভাবে এগুচ্ছে, তাতে নির্বাচন কি ভাবে হবে, কারা করবে, কীভাবে করবে এই সব বিষয় প্রাধান্য পাচ্ছে। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবন জীবিকার বিষয় এই নির্বাচনী বিতর্কে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেনি। এটি আশঙ্কার বিষয় যে রাজনৈতিক বিষয়াদি আমাদের বাংলাদেশের মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের বিষয়কে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলছে। অসুবিধাগ্রস্থ মানুষগুলোর জীবন সংগ্রামের বিষয়াদি যেন নির্বাচনী আলোচনায় দৃশ্যমান হয় এটিই আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, মূল ধারার বড় দলগুলোর অর্থনৈতিক কর্মসূচি বেশ সমধর্মী। এরা সবাই সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অগ্রগতি, ভৌত অবকাঠামোর বিকাশ, শিল্প-উন্নয়ন ও কৃষি খাতে উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, এবং সামাজিক সুরক্ষার কথা বলে। উদ্দেশ্য প্রায় এক হলেও পার্থক্যটা লক্ষ্য করা যায় কি পদ্ধতিতে এসব বাস্তবায়িত হবে সে সব নির্ধারণের ক্ষেত্রে। মূল ধারার দলগুলো নির্বাচনী ইস্তেহারে কি ধরণের অর্থনীতি তারা দেখতে চায় তা বলার সাথে সাথে কীভাবে তারা সে লক্ষ্য অর্জন করবে - সেটি স্পষ্ঠভাবে বলতে হবে। এই অর্জন করার ক্ষেত্রে যে সম্পদ লাগবে সেই সম্পদের উৎস কি হবে, অর্থায়নের পদ্ধতি কি হবে এবং সেটি যথেষ্ট দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারবে কি না সেই বিষয়টিকে পরিষ্কার করতে হবে। ইশতেহারের আলোচনায় যে গগনস্পর্শী আকাঙ্খা তুলে ধরা হয় সেটি অর্জন করার বাস্তব সম্মত পদ্ধতি কি তা স্পষ্ট করতে হবে। এটি যে বাস্তবায়ন হবে

সেটির নিশ্চয়তা দেবার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কি থাকবে? গণতান্ত্রিক জবাবদিহির প্রক্রিয়া কি থাকবে? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

আমাদের জীবনমানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে খুব পরিষ্কারভাবে যেটি এসেছে সেটি হলো সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভাজিত বৈষম্যের বৃদ্ধি। এটি হলো উন্নয়ন হয়েছে সামগ্রিকভাবে, কিন্তু বিভাজিত ভাবে দেখলে বোঝা যায় বৈষম্যও বেড়েছে। এই বৈষম্য নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে, শিশু-প্রবীণদের ক্ষেত্রে, প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে, ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে আছে ধনী-গরিবের ক্ষেত্রে। আগামী দিনে আমরা চাই, প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকুক এবং একই সাথে বৈষম্য কমুক। এখন প্রশ্ন দাঁড়াবে এটি কীভাবে করা যাবে?

আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির তথা উন্নয়নের কথা বলছি। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারা শক্তিশালী করতে হলে কয়েকটি মৌলিক উপাদান, যেমন কর্মসংস্থান, আয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমঘন শিল্পায়ন লাগবে এবং সেই শ্রমঘন শিল্পায়ন শুধুমাত্র রফতানিমূলক হলে হবে না। তাকে অভ্যন্তরীন বাজারের জন্যও উৎপাদন করতে হবে। অভ্যন্তরীন চাহিদা এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটির সাথে অবশ্যই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে যুক্ত করতে হবে। কৃষি খাতে কৃষি পণ্যের বিশেষ করে শস্যখাত যেটি আছে তাতে উৎপাদনে প্রণোদনা দিতে হবে। কৃষিপণ্যের মূল্যের প্রণোদনা যদি ঠিক না থাকে তাহলে আমাদের যে গ্রামীণ অর্থনীতি,খাদ্য নিরাপত্তা এবং গরিব কৃষকের উন্নতি হবে না। আরেকটি বিষয় হল মানসম্পন্ন শিক্ষা। শুধু শিক্ষা বললে চলবে না, এখানে মানসম্মত শিক্ষা কীভাবে নিশ্চিত হবে সেই বিষয়ে বলতে হবে। স্বাস্থ্য খাতে কেবল বরাদ্দ বৃদ্ধি করলেই চলবে না। স্বাস্থ্য খাতে বৈষম্য এখন প্রকট। আসলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অর্থাৎ মানবসম্পদ উন্নয়নে যে সমস্ত উপাদান প্রয়োজন সেখানে অভিগম্যতার ক্ষেত্রে কিন্তু বৈষম্য আরো বেশি। ঐ ক্ষেত্রে বৈষম্য কমাতে না পারলে অন্যান্য সুযোগ মাটি হয়ে যাবে।

আমাদের যে ভৌত অবকাঠামোর কথা বলা হচ্ছে, এই ভৌত অবকাঠামোর ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আন্তঃখাত সমন্বয়টা বড় বিষয়। অর্থাৎ আমরা দেখছি যে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে অথচ এর বিতরণের জন্য ব্যবস্থা সেভাবে হচ্ছে না। সেই সাথে বড় ভাবে যুক্ত হচ্ছে মূল্যনীতি। ভোক্তারা কি মূল্যে গ্যাস, বিদ্যুৎ, এলএনজি পাবেন এটি একটি তর্কিত বিষয়। পরবর্তী একটি বিষয় হলো ব্যাংকিং খাত এবং পুঁজিবাজার। এ খাতের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে, বিশেষ করে আমানতকারী এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রবাসী আয় বাংলাদেশে একটি বড় ভূমিকা রাখে। শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে। আর একটি বিষয় হলো, পরিবেশ সুরক্ষা। পরিবেশের বিষয়কে অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের সাথে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সম্পদ আহরণের পদ্ধতি। বাংলাদেশে কর আহরণ বাড়াতে হবে, প্রতক্ষ কর ব্যবহার করতে হবে, বৈদেশিক বিনিয়োগ আনতে হবে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হল গুণগতমানের উন্নয়ন করা। গুণগতমানের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটি এই সুবিধা পাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।

বিভিন্ন বড় বড় প্রকল্পের কথা বেশ আলোচিত বিষয়। সিপিডি থেকে বার বার বলা হয়েছে যে, এই প্রকল্পগুলোর মধ্যে অতিঅর্থায়ন করা হচ্ছে। তাই প্রকল্পগুলোর পুনর্বিবেচনা করা জরুরি যাতে দক্ষতার সাথে এই সম্পদগুলোর ব্যবহার হয় এবং গরিব মানুষ এর থেকে উপকৃত হয় । উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে বিগত সময়কালের যেসব বিচ্যুতি আছে, সেগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে। এইগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে আমাদের সামনে খুব স্পষ্টভাবে আসতে হবে এবং এই ইশতেহার কীভাবে আগামী দিনে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে, সেখানে মিডিয়ার ভূমিকা কি হবে, নাগরিক সমাজের ভূমিকা কি হবে, ব্যাক্তি খাতে উদ্যোক্তাদের ভূমিকা কি হবে এগুলো আমাদের সামনে আরো স্পষ্ট করতে হবে।

একটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় হলো নির্বাচনী ব্যয়। দেখা গেছে যে, নির্বাচন অনেকাংশে বিনিয়োগের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয় এখন অনেক যোগ্য ও সৎ প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করছে। নির্বাচনী ব্যয় এখন গণতান্ত্রিক বিকাশের প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হচ্ছে, সেটি আমাদের মনোযোগে আনতে হবে। নির্বাচনী ব্যয়ের পরিমাণ নিয়ন্ত্রনই শুধু নয়, এ ক্ষেত্রে আরো বেশি স্বচ্ছতা আনা যায় কি না তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি দৃশ্যমান যে, সবচেয়ে বড় বড় ঋণ গ্রহীতারা যারা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তারা বহু আগেই তাদের খেলাপি ঋণের সুরাহা করে ফেলেছেন। প্রভাব বা সংযোগ খাটিয়ে ঋণ সমন্বয় করেছেন অথবা নতুন একটি ঋণ সুবিধা নিয়ে পুরনো ঋণ সমন্বয় করেছেন। অর্থাৎ লোক দেখানো একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেটির যথার্থ মূল্যায়ন করবার জায়গা হয়তো নির্বাচন কমিশন না। এর মূল্যায়ন করার কথা ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের।

সাধারণভাবে আমাদের বক্তব্য হলো এখন পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারণায় জীবন-জীবিকার উল্লেখ যৎসামান্য। নির্বাচন পর্যন্ত যেটুকু সময় আছে এই সময়ের ভেতরে আমাদের রাজনীতিবিদ ও জনপ্রতিনিধিদের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে বৈষম্য কমানোর

প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। গুণমানসম্পন্ন প্রবৃদ্ধি আগামীতে অর্জন করার পথ দেখাতে হবে, তাহলেই সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষটিও উপকৃত হবে। গত দশ বছরে দেখা গিয়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সুযোগ সমভাবে বণ্টিত হয়নি, বরঞ্চ ভোগ-আয়-সম্পদ বৈষম্য বৃদ্ধির হার আরো তরান্বিত হয়েছে। এই প্রবণতাকে মোকাবেলা করতে হলে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অবাধ সুযোগ থাকতে হবে। নাগরিক সমাজ নিরাপদে মত প্রকাশ করতে পারে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য (ইউটিউবে প্রকাশিত)

২২ নভেম্বর ২০১৮
ইউটিউব লিঙ্কঃ https://youtu.be/DqMn16-Jglo

প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতির পূর্বশর্ত

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণই উন্নয়নের শেষ কথা নয়। এটি হল উন্নয়নের কাহিনীর বা নাটকের একটি অঙ্ক মাত্র। এই অঙ্ক থেকে একটি দেশের আরও উন্নততর নাটকীয় অঙ্কে যাওয়ার জন্য নিঃসন্দেহে প্রস্তুতি দরকার। এবং এই যে অন্তবর্তীকালীন সময় - প্রায় ছয় বছর (২০১৮-২০২৪) তার জন্যও একটি মসৃণ, সুগম পথ আমাদের তৈরি করতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মসৃণ উত্তরণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল অর্থনীতির ভেতরে কাঠামোগত পরিবর্তন। অর্থাৎ, যেমন শিল্প খাতের ভূমিকা বাড়বে - কৃষি আরও উৎপাদনশীল হবে - কৃষকরা অধিকতর উৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত হবেন - আমাদের সেবা খাত উন্নতমানের সেবা দিতে পারবে, সর্বোপরি বিনিয়োগ বাড়বে। একই সাথে দেশের ভেতরে বৈষম্য কমবে; সুবিধাবঞ্চিত মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও প্রয়োজনীয় সুবিধা পাবে। সুদীর্ঘ উন্নয়ন-যাত্রায় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হলে তার পূর্বশর্তগুলো হল, উন্নততর ও উৎপাদনশীল খাতগুলোতে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক সুশাসন নিশ্চিত করা। যেহেতু ঐ বিষয়গুলো এখনও বিকাশের প্রক্রিয়ার ভেতরে রয়ে গেছে, সেহেতু স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে আমরা আত্মপ্রসাদ পেলেও উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই। কারণ সুদীর্ঘ উন্নয়ন-যাত্রায় আমাদের সামনে এখনও পথ বাকি আছে।

উদ্যোক্তা শ্রেণির ভূমিকা

এখন প্রশ্ন হল, দেশের উন্নয়ন-যাত্রায় অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিকাশের শর্তগুলোকে পূরণ করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কে বা কারা নেতৃত্ব দেবে? এই প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তিটি কি হবে? বিভিন্ন দেশের উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহী যে শ্রেণি থাকে তারাই এই প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের মতো দেশে, যেখানে উদ্দ্যোগ এবং বাজার বিকাশ প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, সেখানে সেই চালিকা শক্তি হিসেবে উদ্যোক্তাদের একটি বড় ভূমিকা থাকার কথা। সঙ্গত কারণে উদ্যোক্তারা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধিতে, বিনিয়োগে, উৎপাদনশীলতায়, মুনাফাতে তথা অর্থনীতির সার্বিক বিকাশে আগ্রহী হওয়ার কথা। আজকের আলোচনার যে প্রশ্নটি জরুরি তা হল আমাদের উদ্যোক্তা শ্রেণি এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত কি না। দুঃখজনকভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের যে ঐতিহাসিক সম্ভাবনা আছে সেটিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে কোন কার্যকর লক্ষণ আমরা সেভাবে এখনও দেখতে পাচ্ছি কি না।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলতে হয় উদ্যোক্তা শ্রেণির সম্ভাব্য ভূমিকাকে রূপায়িত করার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতির উপস্থিতি। একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতিতে ঘোষিত নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীনভাবে ব্যবসায়িক সুবিধা লাভ করা যায়। যদি তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং তারাই উদ্যোক্তাদের নেতৃত্ব দেয়, তাহলে সেই অর্থনীতি প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও কর্মক্ষম হয় না।

অপরদিকে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি সৃষ্টি করার জন্য পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি। এখন লক্ষ্য করা যাক, এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি আনার জন্য তাহলে উদ্যোক্তা শ্রেণি কি ভূমিকা পালন করতে পারে। উদ্যোক্তা শ্রেণি বাংলাদেশে প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতি ও রাজনীতি সৃষ্টিতে এই মুহুর্তে যে প্রস্তুত নয় তার একটি বড় লক্ষণ হল উদ্যোক্তা শ্রেণি বর্তমানে নিজের শ্রেণি স্বার্থ রক্ষা করে না। লক্ষ্য করুণ উদ্যোক্তা শ্রেণি আমাদের দেশে এতো প্রভাবশালী, তারা এতো ধরণের ভূমিকা রাখে সরকারের সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে, কিন্তু তারা তো বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে তুলনামূলক বেশি ব্যয় সেটি কমাতে পারে না। তারা নিজ স্বার্থে একটি কার্যকর ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না। এই যে বন্দরে অব্যবস্থাপনা, সেটি দূর করতে পারে না। তারা পারে না কেন? এতো বড় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী আমাদের মধ্যে থাকার পরেও বাণিজ্য-বিনিয়োগে অনিয়ম দূর্নীতি দূর করতে না পারার একটি বড় কারণ হল, তারা শ্রেণি স্বার্থ না দেখে গোষ্ঠী অথবা ব্যক্তি স্বার্থের ভিত্তিতে কাজ করে।

তারা নীতির ভিত্তিতে কাজ না করে, বিষয় ভিত্তিতে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করে। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ভেতরেও প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি অনেক সময় থাকে না। যেহেতু তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ নির্বাচন পদ্ধতি থাকে না সেহেতু তাদের অভ্যন্তরীন শ্রেণি জবাবদিহিটিও দুর্বল থাকে। ফলতঃ তারা নিজস্ব শক্তি নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার সাথে দর কষাকষি করতে পারে না।

পূর্বের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থনীতির জন্য প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি প্রয়োজন। আবার প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতি সৃষ্টি করার জন্য উদ্যোক্তার যে ভূমিকা দরকার সেজন্য তাদের ভেতরেও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একধরনের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আছে। প্রতিযোগিতা ও প্রতিনিধিত্বের এই চক্র যতক্ষণ না সম্পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্যোক্তারা শ্রেণি স্বার্থের বদলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সুবিধার ভিত্তিতে কাজ করবে বলে আমাদের আশংকা।

আসন্ন জাতীয় নির্বাচন

আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, আসন্ন নির্বাচনের চালচিত্রে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর দৃশ্যমান উপস্থিতি। মাঝে মাঝে মনে হয় বর্তমান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ধ্রুপদী রাজনীতিবিদের চেয়ে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি দৃশ্যমান। অর্থাৎ, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা এখন প্রয়োজন বোধ করছেন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়ার। তাদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রয়োজন বোধ করার কারণ হল, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা পেয়েছেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যায়ে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য দ্বারাই সেগুলোকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। কারণ অনেকক্ষেত্রে সেগুলো সার্বজনীন সুবিধা নয়। এটি এমন না যে সমস্ত উদ্যোক্তা বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা পুরো শ্রেণিই সেগুলো পেয়েছে। বিশেষ সুবিধাগুলো যেমন, কর অবকাশ, আমদানী সুবিধা, কোন একটি লাইসেন্স, হয়তো একটি নতুন ব্যাংক - এগুলো বিশেষ সম্পর্ক ও আনুকূল্যের ভিত্তিতে পেয়েছে। সে জন্য তারা রাজনীতি দিয়ে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে এসব বিশেষ সুবিধাকে সুরক্ষা দিতে চায়। অপরদিকে দেখা যায়, পেশাদার রাজনীতিবিদরাও এখন অনেক বেশি বাণিজ্য-ব্যবসায় যুক্ত হচ্ছেন। যার ফলে ব্যবসা এবং রাজনীতির ভেতর একটি কলুষ সম্পর্ক গড়ে উঠছে। কে রাজনীতিবিদ আর কে ব্যবসায়ী - নাগরিকরা এই পার্থক্য আর বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বুঝতে পারছে, বাংলাদেশে এখন রাজনীতি সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ী বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ। তাহলে এখন এখানে কি করার আছে?

দু'টি পরামর্শ

আমি দু'টি পরামর্শের কথা বলবো, একটি নির্বাচনের আগে ও একটি নির্বাচনের পরে প্রয়োগ করা উচিত। আমরা, নাগরিক সম্প্রদায়, অনেক আন্দোলন করে নির্বাচনের প্রার্থীদের জন্য একটি হলফনামা এবং কতিপয় বিষয়ে ঘোষণা দেওয়ার বাধ্যবাধকতার ব্যবস্থা করেছি। এই হলফনামাতে বা ঘোষণায় উল্লেখ করা হবে প্রার্থীদের বিগত পাঁচ বছরের আয় এবং সম্পদ বৃদ্ধির হিসাব। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রার্থীদের বিগত পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে কয়েক গুণ, কিন্তু সম্পদ বেড়েছে তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। এ ধরণের পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ বা ফলোআপ করার কোন ব্যবস্থা নেই। নির্বাচন কমিশনের এ বিষয়ে ফলোআপ করার সক্ষমতা নেই। অন্য কেউ কি তাহলে এই বিষয়ে ফলোআপ করতে সক্ষম? যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গত পাঁচ বছরে প্রার্থীদের যে আয় ও সম্পদ বাড়লো তার আইনি ভিত্তি এবং এটি কর প্রদত্ত সম্পদ কি না সেটি যাচাই করতে পারে। দ্রুততার সাথে তারা নির্বাচনের আগে প্রার্থীদের সম্পর্কে এসকল তথ্য যাচাই এর কাজটা করতে পারে যাতে ঋণ খেলাপি, বিলখেলাপিদের সাথে করখেলাপিদের চিহ্নিত করে তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রাখতে পারে। প্রয়োজনে দূর্নীতি দমন কমিশন এ উদ্যোগ নিতে পারে। আমার প্রথম পরামর্শ হচ্ছে, নির্বাচনের আগে যারা হলফনামা জমা দিচ্ছেন সেই হলফনামাগুলো দ্রুততার সাথে রাজস্ব বোর্ড দেখে প্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি মূল্যায়ন জনগণের সামনে দেবে এবং নির্বাচন কমিশন সেটি প্রার্থিতা চূড়ান্ত করার সময় বিবেচনায় নেবে।

আরেকটি বিষয় হল, আমাদের রাজনীতিতে প্রচলিত একটি সংস্কৃতি আছে তা হলো, যখন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো তৈরি হয় তখন যিনি পরিবহন খাতের সাথে যুক্ত তাকে পরিবহণ সংসদীয় কমিটিতে দেওয়া হয়, যিনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বানিয়েছেন তাকে শিক্ষা বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতে রাখা হয়। বিদেশে ঠিক উল্টোটা করা হয়। কারণ হলো আপনার যেখানে ব্যবসায়িক স্বার্থ আছে সেখানে আপনি নীতি প্রণয়নের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন না। এটি হলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। আমরা নাগরিকদের পক্ষ থেকে সব সময় বলছি, সংসদরা যখনই শপথ নেবেন তখনই তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থগুলোকে ঘোষণা দিয়ে নিবন্ধন করতে হবে। তাদের একটি রেজিস্ট্রি তৈরি করতে হবে যেখানে লিপিবদ্ধ থাকবে যে কোন খাতে তার ব্যবসায়ীক স্বার্থ আছে, বিনিয়োগ আছে, এবং পরিবারের ঘনিষ্ট কেউ যুক্ত আছে। তাহলে আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে যখন সংসদ সদস্য মতামত দেবেন, তখন বোঝা যাবে তিনি কতখানি নীতির ভিত্তিতে বলছেন, আর কতখানি ব্যক্তি স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলছেন। এই স্বচ্ছতা যদি আমাদের সাংসদদের ভেতরে না আসে তাহলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও কিন্তু এর আগে

যে বিশেষ সরকারি সুবিধা দেওয়ার কথা বলেছি সেগুলো চলে আসবে। নির্বাচনের আগে এবং পরে উভয় সময়ের জন্য এই দু'টি পরামর্শ আজ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জন্য উল্লেখ করতে চেয়েছি।

আমি বলতে চাই, আমাদের উদ্যোক্তা শ্রেণি সার্বজনীন ও সার্বভৌম স্বার্থের ভিত্তিতে নিজেদের যতক্ষণ পর্যন্ত না দাঁড় করাবেন ততক্ষণ পর্যন্ত দেশে যথোপযুক্ত উদ্যোক্তা নেতৃত্ব গড়ে উঠাটা জটিল হবে। আজকে উপস্থাপিত গবেষণার ফলাফলে দেখা গেল আমাদের দেশে বর্তমানে উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছোট পর্যায়ের উদীয়মানরা আছেন, উচ্চ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিতরা আছেন, কিন্তু মধ্যম সারির উদ্যোক্তারা খুবই কম। পরিস্থিতি বলছে যে উদ্যোক্তারা এই মুহূর্তে কষ্ট করে বাজারে ঢুকছে, তাদের বিকাশ এবং টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। মধ্যম বা ছোট উদীয়মান উদ্যোক্তাদের বিকাশ যেহেতু বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে, সেহেতু ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের কাঠামোগত রূপান্তর শ্লথ হয়ে যাবে। তাই নাটকের পরবর্তী অঙ্কে আমরা নায়কের বদলে পার্শ্ব চরিত্রে পর্যবসিত হতে পারি।

আঙ্কটাডের স্বল্পোন্নত দেশ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১৮) প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য (ইউটিউবে প্রকাশিত)

১২ *ডিসেম্বর* ২০১৮
ইউটিউব লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=Z66gi0CM0SE

অধ্যায় ২

অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

চাহিদার তুলনায় প্রাপ্যতা কম হওয়ার কারণেই ঢাকায় চাপ বাড়ছে

ফাহমিদা খাতুন

আন্তর্জাতিক জরিপে ঢাকা পৃথিবীর অন্যতম ব্যয়বহুল নগরী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। যদিও জীবনযাত্রার মান কিংবা বসবাস যোগ্যতার ভিত্তিতে ঢাকার অবস্থান একেবারে নিচের দিকে। তারপরও প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ ঢাকায় আসছে। এতে একদিকে যেমন শহরে মানুষের চাপ বাড়ছে তেমনি বাড়ছে আয় বৈষম্যও। ঢাকায় মানুষের ছোটার কারণ, জীবনযাত্রার ব্যয়, আয়ব্যয় বৈষম্য কমানোর পরামর্শ নিয়ে সমকাল অনলাইনের সঙ্গে কথা বলেছেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তাসলিমা তামান্না।

যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ম্যাগাজিন দি ইকোনমিস্টের গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের এ বছরের মার্চের জরিপ অনুযায়ী দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর ঢাকা। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা মার্কারের জরিপ বলছে, বিশ্বের বড় বড় শহর যেমন - টরোন্টো, বার্লিন, মেলবোর্ন, পার্থ কিংবা ওয়াশিংটন থেকেও ব্যয়ের দিকে ঢাকা এগিয়ে। বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

ফাহমিদা খাতুন: সব খাতে খরচ একরকমভাবে বাড়েনি। ঢাকায় সবচেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে বাসা ভাড়ায়। এর একটি কারণ হলো - বাংলাদেশ আকারে ছোট কিন্তু জনবহুল একটি দেশ। এখানকার বেশিরভাগ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এ কারণে ঢাকার উপর চাপ বাড়ছে। কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে

ভারসাম্য যেখানে হয়, তার মূল্যটা সেখানেই নির্ধারিত হয়। এখানে মানুষ বাড়ছে কিন্তু জমি বাড়ছে না। ঢাকায় একটি ফ্ল্যাটের ভাড়া আর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যানহাটনের বাসা ভাড়া প্রায় সমান।

এরপরেই বলা যেতে পারে সেবাগুলোর কথা। যেমন - শিক্ষা খাত, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি। যদি কেউ গুণগত শিক্ষা পেতে চান তাহলে তাকে ব্যক্তি খাতের স্কুলগুলোতে যেতে হচ্ছে। ঢাকায় কিছু সরকারি স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু শিক্ষার্থীর তুলনায় তা অনেক কম হওয়ায় অনেকেই প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে ছুটছে। আর প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের যেহেতু চাহিদা বেশি তাই তারা দামটাও সেরকম রাখছে। একই অবস্থা স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও। প্রাইভেট ক্লিনিক বা হাসপাতালগুলো সরকারি হাসপাতালের তুলনায় সেবা ভালো দেবে, কিন্তু দামটাও রাখবে অনেক বেশি। এখানে কারণটি হলো, দেশে এখনও রোগীর তুলনায় চিকিৎসকের স্বল্পতা আছে, হাসপাতালের সংখ্যাও অনেক কম। বিশেষ করে মানসম্মত চিকিৎসা সেবার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে অনেক প্রাইভেট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেশি বেতনে ভালো চিকিৎসক রাখার চেষ্টা করছে। উন্নত প্রযুক্তি এনে চিকিৎসা করছে। সেসব হাসপাতালে গেলে সরকারি হাসপাতালে যতটুকু খরচ হয় তার চেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জিনিসপত্রের দামও অসহনীয় পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এর কারণেও কী ঢাকাকে ব্যয়বহুল শহর বলা হচ্ছে...

ফাহমিদা খাতুনঃ আমাদের কৃষি উৎপাদন আবহাওয়া কিংবা পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। আমাদের দেশে যেহেতু নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় সে কারণে অনেক সময় উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই বছরটি এমনই একটি বছর যেখানে লম্বা সময় ধরে প্রবল বর্ষণ ছিল। যার ফলে ফসলের যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ ছাড়া দেশে এবার দুইভাগে বন্যা হয়েছিল। একবার এপ্রিলের শুরুর দিকে অগ্রিম একটি বন্যা হয়। তখন ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেই ক্ষতিটা পূরণ হতে না হতে জুনের দিকে আবার একটি বন্যা হয়। সেটির ক্ষতিপূরণ এখনও চলছে। এ কারণে শুধু চাল নয়, সব ধরনের কৃষিপণ্যের উপর এর প্রভাব পড়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি হলে উৎপাদন যেমন ব্যাহত হয়, তেমনি পণ্য চলাচলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ছাড়া ঢাকা শহরের সব ধরনের খাদ্য, জিনিসপত্রের চাহিদা পূরণ হয় অন্যান্য জেলা থেকে আসা পণ্য থেকে। এবার প্রথমত উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। আবার যাও বা উৎপন্ন হয়েছে তাও ঢাকায় আসতে দেরী হয়েছে। সুতরাং চাহিদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি থাকায় মূল্য বেড়ে গেছে। তবে

এখন সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে এলেও ঊর্ধ্বমুখী দামের প্রবণতা রয়ে গেছে। আসলে আমাদের দেশে একবার যেটির দাম বেড়ে যায় সেটি আর সহজে কমে না।

একদিকে বৈশ্বিক বসবাসযোগ্যতার সূচকে ঢাকা বিশ্বের চতুর্থ নিকৃষ্ট শহর, অন্যদিকে জীবনযাত্রাও অনেক ব্যয়বহুল। তারপরও মানুষ ঢাকামুখী হচ্ছে কেন?

ফাহমিদা খাতুন: মানুষ সেখানেই যায় যেখানে সে কাজের এবং আয় করার সুবিধা পায়। আমাদের দেশটা এমনভাবে গড়ে উঠেছে যেখানে সব জেলা একইভাবে উন্নয়ন করতে পারেনি। অন্য জেলাগুলোতে ঢাকার মতো অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়নি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিপনি কেন্দ্র, বাজারব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধা নেই। তাই সবাই ঢাকায় আসছে। কিন্তু মানুষের চাপ বাড়ার সঙ্গে বিভিন্ন সেবার পরিমাণ বাড়ছে না। তারপরও সবাই ঢাকায় আসছে, কারণ অন্যান্য শহরে এতটুকুও তো নেই।

ঢাকায় মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বস্তিতে বসবাস করে; যাদের অনেকের আয় ৫ হাজার টাকার কম। তারা এ পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করবে। তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

ফাহমিদা খাতুন: ঢাকা শহরে যারা থাকেন তাদের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় বাড়ি ভাড়ার পেছনে। নিম্ন-আয়ের মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। দেখা যাচ্ছে, কেউ ৫ থেকে ৬ হাজার টাকা আয় করলে এক কামরার জন্য ভাড়ার পেছনেই তিন হাজার টাকা চলে যায়। অনেকেই বাঁচার তাগিদে এখন আয় বাড়ানোর চেষ্টা করছে। যেমন ধরুন, কেউ যদি কোনো অফিসের নিম্ন-আয়ের কোনো কর্মচারি হয়, অফিস শেষে আরেকটা কাজে নিজেকে নিযুক্ত করছে। হতে পারে সেটি ছোট একটি দোকান,কিংবা নিজের উদ্যোগে করা ছোট অন্য কোনো ব্যবসা। সবাই একটির বেশি অন্য কোন কাজ করার চেষ্টা করছে। এতে সেই ব্যক্তির উপর চাপ বাড়ছে। তাতে হয়তো তার শরীর-মন দুই-ই খারাপ থাকছে। তাছাড়া এখানে বাজারপণ্য মনিটরিংয়ের ভালো ব্যবস্থা নেই। উন্নত দেশগুলোতে কোনো ভোক্তা যদি কোন পণ্যের মান, দাম নিয়ে খুশি না থাকে তাহলে তার অভিযোগ করার সুযোগ থাকে ভোক্তা অধিকারের আওতায়। আমাদের দেশে ভোক্তা অধিকার আদায়ের জন্য একটি সংগঠন থাকলেও এর কার্যকারিতা নেই। এখানে একজন ভোক্তা পণ্য নিয়ে সন্তুষ্ট না হলেও বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারে না।

ঢাকায় নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য ভাসানটেকে ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছিল। তাও এখন দখলে চলে গেছে। তাদের অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কী করা যেতে পারে?

ফাহমিদা খাতুন: বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করা হয় সরকারি বেসরকারি দুই খাত থেকেই। এটি আমাদের দেশেও করা যেতে পারে। যারা নিম্ন-আয়ের সরকারি চাকরি করেন কিংবা যারা শিল্পকারখানায় কাজ করেন তাদের জন্য স্বল্প খরচে বাসস্থান তৈরি করা যায়। সরকারি কিছু জায়গায় যদি নিম্ন-আয়ের মানুষের জন্য বাসস্থান তৈরি করা যায় তাহলে তাদের বাসস্থান সংকট কিছুটা কাটানো যাবে, জীবনযাত্রার মানও কিছুটা উন্নত করা যাবে। কারণ বস্তিতে বসবাস করা স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

সরকারি উদ্যোগেই কিন্তু ভাসানটেক প্রকল্প তৈরি হয়েছিল...

ফাহমিদা খাতুন: এই ধরনের প্রকল্পের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা জরুরি। নইলে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে নীতিমালা বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ রাজনীতির নাম ভাঙ্গিয়ে অনেকে যে দখলদারিত্ব করে থাকে এটি থেকে মুক্তি পাওয়া না গেলে কোনো পদক্ষেপই কার্যকর হবে না।

গ্রামে দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য নানা কর্মসূচি আছে; যা অনেকের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন করেছে। কিন্তু শহরে এ ধরনের কর্মসূচি কার্যকর বলে মনে হয় না। এ ব্যাপারে কিছু বলুন**?**

ফাহমিদা খাতুন: আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ হয়েছে বিগত কয়েক বছরে। সেখানে কৃষি বহির্ভূত অনেক কার্যক্রম হচ্ছে। ছোট ছোট উদ্যোক্তা যেমন বাড়ছে, তেমনি ছোট ছোট সেবা খাতও গড়ে উঠছে। এতে আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে। অর্থনীতির বিভিন্ন কার্যক্রমও বাড়ছে। যারা কাজ করতে পারে না কিন্তু অতি দরিদ্র, সরকার থেকে তাদের বিভিন্ন ভাতা দেওয়া হচ্ছে। যেমন - বিধবা, বয়স্ক, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী তাদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে। আবার শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে ছেলেমেয়েদের উপবৃত্তিও দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া যেকনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে ত্রাণের ব্যবস্থাও করা হয় গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য। শহরকে কেন্দ্র করে আমাদের সেরকম সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি নেই। কিন্তু এটি লক্ষ্য রাখা দরকার, যারা শহরে আসছে তারা সবাই কাজ পাচ্ছে না। ফলে সব পরিবার তাদের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এতে করে সৃষ্টি হচ্ছে নগর দরিদ্র।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ এ যে লক্ষ্যগুলো আছে তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা। নগর দরিদ্রদের অবস্থা পরিবর্তন না করে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কি আদৌ সম্ভব?

ফাহমিদা খাতুন: না, সেটি মোটেই সম্ভব না। এখানে শহর এবং গ্রাম - উভয় এলাকায়ই সব ধরনের দারিদ্র্য দূর করতে হবে। গ্রামের মতো নগর দরিদ্রদের অবস্থা পরিবর্তনে নগরমুখী কিছু কিছু কার্যক্রম শুরু করা যেতে পারে। যারা কাজ করতে পারে অথচ কাজ পাচ্ছে না এরকম সক্ষম যুবকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। তাদের ভোকেশনাল কিংবা টেকনিক্যাল কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়। মোটকথা, তাদের উপার্জনকারী কাজের উপযোগী করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারা উদ্যোক্তা হতে পারে। তাদের ছোট ছোট ঋণ দেওয়া যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে, অন্যদিকে তাদের মধ্যে অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রবণতা কমে আসবে। স্বল্প শিক্ষিতদের উৎপাদনমুখী, সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে বেসরকারি বা ব্যক্তিখাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

ফাহমিদা খাতুন: আমাদের অর্থনীতির শতকরা ৮০ ভাগই হচ্ছে বেসরকারি খাত। সরকারের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব নয়। সরকারের কাজ হচ্ছে নীতিমালা নির্ধারণ ও প্রণয়ন করা, ব্যক্তিগত খাতে যারা কাজ করবে তাদের জন্য উপযোগী অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। এসব সুবিধা পেলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়বে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি আর ব্যক্তিগত খাতের ভূমিকা অনেকটা পরিপূরকের মতো। সরকারের সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তিখাতের বিকাশ হবে না। আবার ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়নে গতিময়তা আনা যাবে না।

জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও বড় বড় শপিংমল কিংবা রেস্টুরেন্টে আগের তুলনায় মানুষের উপস্থিতি কিন্তু বেড়েছে...

ফাহমিদা খাতুন: এর কারণ হলো,সমাজের একটি শ্রেণির হাতে প্রচুর অর্থ আছে। ব্যক্তিখাতের অনেকে আছেন যারা বিনিয়োগ করছেন। তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। তারা অন্যদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তার বাইরেও কিছু কিছু লোকের সহজলভ্য টাকা হচ্ছে। এখন ব্যাংকগুলোতে অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা চলছে। কেউ কেউ হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিচ্ছে কিন্তু ফেরত দিচ্ছে না। ঋণ নিয়ে তা ফেরত না দেওয়াটা যেন একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। এই শ্রেণির

মানুষও দ্রব্যমূল্য বাড়ার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রাখছে। সমাজে আয় বৈষম্য বাড়াচ্ছে। তাদের হাতে প্রচুর সহজলভ্য টাকা থাকলেও কোথাও তারা সেই টাকা বিনিয়োগ করছে না। কেউ কর ফাঁকি দিচ্ছে, কেউ বা ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছে না। কেউ বড় বড় কন্ট্রাক্টে কমিশন পাচ্ছে, অনেকে ঘুষ নিচ্ছে। সুতরাং তাদের তো সেই অর্থব্যয় করতে হবে। তবে পাশাপাশি এটিও সত্যি যে বাংলাদেশের মানুষের আয় আগের তুলনায় বেড়েছে। তাদের মধ্যে কনস্যুমারিজম বা ভোগ করার প্রবণতাও বাড়ছে। বিশ্বায়নের ফলে অনেক পণ্যও মানুষের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে।

আয়ব্যয়ের বৈষম্য কমাতে আপনার পরামর্শ কী?

ফাহমিদা খাতুন: অনেকে এখন কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারছেন না। সবার জন্য আমাদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। আমাদের বিনিয়োগ এবং জিডিপি'র অনুপাত এখনও ২৮ শতাংশের মতো। সেটাকে ৩২ শতাংশে নিতে হবে। বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান তৈরি হবে। আর বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য সরকারকে উপযোগী নীতিমালা এবং অবকাঠামোগত সুবিধা তৈরি করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, নীতিমালা সহজীকরণ এবং নীতিমালার ধারাবাহিকতা রক্ষা করাটাও জরুরি।

২৫ নভেম্বর ২০১৭
সমকাল

কেন ঢাকা এত ব্যয়বহুল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

বাংলাদেশের যে অর্থনীতি, মানুষের যে গড়পড়তা আয়, এবং ঢাকা শহরের যে ধরনের দুর্বল অবকাঠামো এবং বিনোদন সুবিধা, সেখানে ঢাকা যে বিদেশিদের জন্য এতটা ব্যয়বহুল হয়ে পড়ছে, তা অনেকের কাছেই অবাক লাগবে।

এর একটি ব্যাখ্যার জন্য বিবিসি বাংলা কথা বলেছে অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

কেন ঢাকা নগরী এত ব্যয়বহুল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছেন, এর একটি কারণ বাংলাদেশে বিদেশিদের সংখ্যা বাড়ছে, সুতরাং তাদের জন্য চাহিদাও বাড়ছে। তাদের সবচেয়ে বড় চাহিদার জায়গা হলো এখন বাসস্থান। বিদেশিদের অনেকে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে চান না। তারা আলাদা বাড়িতে থাকতে চান। সেটার খরচ ঢাকা শহরে অত্যন্ত বেশি। আর এখন যেসব বিলাসবহুল নতুন অ্যাপার্টমেন্ট তৈরি হচ্ছে, সেগুলোর ভাড়াও অন্য যে কোন নগরীর তুলনায় বেশি। যাতায়াত খরচ, অন্যান্য খরচও তুলনামূলকভাবে বেশি। সব মিলিয়ে ঢাকা বিদেশিদের জন্য ব্যয়বহুল হয় পড়ছে।

আবাসন, পরিবহনের খরচ বেশি সেটা নাহয় বোঝা গেল। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় আরও যেসব জিনিসের দাম বিবেচনায় নিয়ে এই সূচক তৈরি, সেটার দামও কি ঢাকায় বেশি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ঢাকায় বসবাসরত বিদেশিরা প্রাত্যহিক জীবনের যেসব জিনিসপত্র কেনেন, তার সবটাই আমদানি করা। বাংলাদেশি পণ্যের মান নিয়ে বিদেশিদের সন্দেহ আছে। তারা মানসম্মত বিদেশি পণ্য কিনতে চান। যার পুরোটাই ডলারে আমদানি করতে হয়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

আগে বিদেশিরা সংখ্যায় কম ছিলেন, চাহিদা কম ছিল, শহরও ছোট ছিল। তারা এক ধরণের নিয়ন্ত্রিত বাজারে ডিউটি ফ্রি কেনাকাটার সুযোগ পেতেন। এখন বিদেশিরা সংখ্যায় যেমন বেশি, তাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতিও অনেকে বেশি। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে শুরু করে ভারত পাকিস্তান, ইউরোপ, আমেরিকা থেকে শুরু করে এমনকি আফ্রিকা থেকেও অনেকে এসে এখন ঢাকায় থাকেন। ব্যবসা বাণিজ্য করেন। এদের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে পণ্য এবং সেবার সরবরাহ কম।

ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভাব

বাংলাদেশ যদি বিদেশিদের জন্য এতটা ব্যয়বহুল হয়, সেটা বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রভাব ফেলবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলছেন, এটি একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। "কারণ ঢাকা শহরে আগের চেয়ে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য বেড়েছে। বিদেশিরা আসছেও বেশি। কেউ স্থায়ীভাবে, কেউ সাময়িকভাবে। ঢাকা কিন্তু সেই অর্থে সাংস্কৃতিভাবে সেরকম আকর্ষণীয় জায়গা নয়। অনেকে সাম্প্রতিকালে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশংকার মধ্যে আছেন। একদিকে সাংস্কৃতিক বিনোদনের অভাব, আরেকদিকে নিরাপত্তার অভাব। এর সঙ্গে যদি এটি ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, তুলনামূলকভাব ঢাকার আকর্ষণ কমে যাবে। সেজন্যেই আমরা লক্ষ্য করছি, অনেকে ব্যাংককে বসে, বা দিল্লি বসে বা এমনকি কাঠমান্ডুতে বসে ঢাকার সঙ্গে ব্যবসা করতে চান। বা ঢাকা এসে মিটিং করে আবার চলে যেতে চান। কাজেই বিষয়টি আমাদের জন্য মধ্য মেয়াদে সুখকর নয়।"

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে যে নতুন বিকাশমান মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হচ্ছে, তারাও এখানে একটা চাপ তৈরি করছে। কারণ বিকাশমান মধ্যবিত্ত এখন মানসম্পন্ন পণ্য চায়, মানসম্পন্ন সেবা চায়।

"লোকের হাতে টাকা গেলে চাহিদা বাড়ে। বিদেশিরা বিনিয়োগ করতে আসলে চাহিদা বাড়ে। এই চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি সরবরাহ না বাড়ে, তাহলে অবশ্যই এটি সমস্যা সৃষ্টি করবে। আমাদের দেশে যদি ট্রাফিক জ্যামে সবাই আটকে থাকে, তখন আমি যদি হেলিকপ্টারে যাতায়াত করতে চাই, তখন হেলিকপ্টারের দাম বেড়ে যাবে। কারণ এটিই তখন বিকল্প হিসেবে অনেকে দেখবেন।"

২৬ জুন ২০১৮
বিবিসি বাংলা

অধ্যায় ৩

বাজেট প্রসঙ্গ

অর্থনীতিতে হঠাৎ চাপ

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে হঠাৎ করে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরপর কয়েকটি বছর আমরা সামষ্টিক অর্থনীতিতে যে স্থিতিশীলতা দেখে আসছি, হঠাৎ করেই যেন তাতে ছেদ পড়ার শঙ্কা। এর শুরু এপ্রিল মাসে হাওরাঞ্চলে অকাল বন্যা থেকে। প্রতি বছরই সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার ও কিশোরগঞ্জের হাওরগুলোতে অকাল বন্যা ও পাহাড়ি ঢলে বোরো ফসলের কিছু না কিছু ক্ষতি হয়। তবে এবারে ক্ষতির মাত্রা ছিল অভাবনীয়। একের পর এক হাওর তলিয়ে যেতে থাকে। কেবল প্রকৃতির রোষের কারণে এমনটি হয়নি। অভিযোগ ওঠে যে, বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ সময়মতো হয়নি কিংবা কাজ হয়েছে নিম্নমানের। দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠে। দুদকের মামলায় দেখা যায়, ঠিকাদারদের সঙ্গে পানি উন্নয়ন বোর্ডের পদস্থ কর্মকর্তারাও এসব আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে যুক্ত।

হাওরের এ বন্যায় ফসলহানি যতটা ঘটেছে, তার চেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে খাদ্যশস্যের বাজারে। এ সময়ে মোটা ও সরু সব ধরনের চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। বহু বছর ধরে আমাদের খাদ্যশস্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে সরকারি খাদ্যভাণ্ডারে চালের মজুদ বড় ভূমিকা রেখে আসছে। বাজার অস্বাভাবিক চড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিলে সরকার এ ভাণ্ডার থেকে তুলনামূলক কম দামে চাল বিক্রি করে। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে সরকারের গুদামে চালের মজুদ স্বাভাবিক মাত্রার তুলনায় কম ছিল। একদিকে খাদ্য সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়া এবং পাশাপাশি আমদানির পদক্ষেপ গ্রহণ করায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বন্যা ও ব্লাস্টের আক্রমণে বোরো চাল উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ লাখ টন কম হবে - এমন একটি ধারণা দায়িত্বশীল মহল থেকে দেওয়া হয়। আমাদের চাল, গম ও ভুট্টা উৎপাদন বছরে প্রায় চার কোটি টন। এর মধ্যে সাড়ে

তিন কোটি টনের মতো চাল। কেবল বোরো চাল উৎপাদনই এক মৌসুমে এক কোটি ৯০ লাখ টনের মতো। কিন্তু সরকারের গুদামে আপদকালীন চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত মজুদ বাজারে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজারে কারসাজি করছে, এমন অভিযোগ উঠছে।

বাংলাদেশে আর্থিক বছর জুলাই থেকে জুন পর্যন্ত। প্রতি বছর জুনের প্রথম দিকে সংসদে বাজেট পেশ করা হয় এবং প্রায় এক মাস আলোচনা চলে। এবারে অর্থমন্ত্রী চার লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেন। এ বাজেট উচ্চাভিলাষী এমন অভিমত বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বলেছেন। বাজেটে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সূত্রে কর আদায়ের লক্ষ্য ধরা হয় দুই লাখ ৪৮ হাজার কোটি টাকার কিছু বেশি। এর মধ্যে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আদায়ের লক্ষ্য ছিল ৯১ হাজার কোটি টাকা। গত বছর ভ্যাট আদায়ে মূল টার্গেট ছিল প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা। নতুন বছর থেকে মাল্টিপল হারের পরিবর্তে একক ভ্যাট হার চালু করা হলে রাজস্ব আয় বাড়বে, এটিই ছিল অর্থমন্ত্রীর প্রত্যাশা। কিন্তু শুরু থেকেই ব্যবসায়ীরা এতে আপত্তি প্রকাশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এ নতুন পদ্ধতি চালু দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়। ফলে নতুন বছরের বাজেটে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে হয়। ভ্যাট থেকে ২০ হাজার কোটি টাকার মতো বাড়তি আদায় হবে, এমন প্রত্যাশা ছিল। অর্থমন্ত্রী বাজেট পাসের সময় প্রদত্ত সমাপনী ভাষণে ভ্যাট আদায় কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় না হওয়ার কারণে বাজেটে যে রদবদল করতে হবে, সে বিষয়ে ধারণা দিয়েছিলেন। এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম হলে সরকারের ব্যয়ও সেই পরিমাণে কম করতে হবে। নতুবা ব্যয় ঠিক রাখার জন্য সরকারের ধার বাড়াতে হবে।

বাজেট পাস হতে না হতেই আসে বন্যা। আশঙ্কা ছিল, ১৯৮৮ বা ১৯৯৮ সালের মতো বড় ধরনের বন্যা হবে। সে বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু বন্যার কারণে অনেক জেলায় আমন চাষ বিঘ্নিত হয়েছে। কৃষকদের দ্বিতীয়বার চারা রোপণ কিংবা বীজ ফেলার কারণে ব্যয় বেড়ে যাবে। বিলম্বে চাষের কারণে ধানের ফলন কম হতে পারে, এমন শঙ্কাও রয়েছে। বোরো মৌসুমের ক্ষতির পর আমনেও উৎপাদন কম হবে, এমন শঙ্কা থেকে চালের বাজার আরও ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে। এটি সামাল দিতে সরকারের নিজস্ব মজুদ থেকে যে বাজারে কম মূল্যে চাল ছাড়া হবে, তারও উপায় নেই। কারণ সরকারের আমদানি পরিকল্পনা শুরু হয় বিলম্বে। বেসরকারি খাতেও চাল আমদানি তেমন গতি পায়নি। ব্যবসায়ীরা চালের উপর সব মিলিয়ে ২৮ শতাংশ শুল্ককরকে এ জন্য দায়ী করেন। সরকার বাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং দুই ধাপে শুল্ককর কমিয়ে মাত্র দুই শতাংশে নামিয়ে আনে। কিন্তু চালের বাজারের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা তাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি।

সরকারের নিজস্ব মজুদ বাড়ানোর লক্ষ্যও এখন পর্যন্ত তেমন পূরণ হয়নি। তদুপরি ভারতে বন্যা হওয়ায় সেখানেও চালের দাম বেড়েছে। বাজারে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে, এমন শঙ্কা রয়েছে।

বন্যার কারণে কেবল ধানের উৎপাদন বিঘ্নিত হয়নি, সবজির ফলনও কম হয়েছে। যোগাযোগ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েক ধরনের পণ্যের দামও ঊর্ধ্বমুখী। এর ফলে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে, বিশেষ করে খাদ্যপণ্য খাতে। সরকার সাধারণভাবে বন্যার্তদের জন্য কম দামে কিংবা ত্রাণ সাহায্য হিসেবে চাল প্রদান করে থাকে। কিন্তু এবারে নিজস্ব মজুদ কম থাকায় এ ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া বন্যার কারণে অনেক এলাকায়, বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি কর্মসংস্থানের সমস্যা বেড়েছে। একদিকে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী, অন্যদিকে আয়ের সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা বাড়বে - এটিই স্বাভাবিক। সরকার গত বছর কয়েক লাখ লোককে ১০ টাকা কেজি দরে চাল সরবরাহ করেছে। এবারেও এ পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, মজুদের পরিমাণ পর্যাপ্ত না থাকা। একই কারণে ওপেন মার্কেট সেলও চালু করা যাচ্ছে না।

এবারে বন্যা ও অতিবৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এ সমস্যা নিয়ে বিশ্বের সর্বত্র আলোচনা চলছে। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দেশ হিসেবে আমাদের জন্য সমস্যা জটিল এবং এ জন্য আগামী দিনগুলোতে মানবসম্পদ ও অর্থ বরাদ্দে বিশেষভাবে মনোযোগী হতে হবে। বন্যায় কেবল কৃষি নয়; সড়ক, সেতু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য অবকাঠামোর ক্ষতি হয়েছে। এসব সংস্কার-মেরামতে সরকারকে বাড়তি ব্যয় করতে হবে। অথচ অর্থবছরের শুরুতে এ জন্য বরাদ্দ রাখা ছিল না।

বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সমস্যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের উপস্থিতি। আগস্টের শেষ দিকে দলে দলে শরণার্থী বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। এরা স্বল্প সময় অবস্থান করে মিয়ানমারে নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে পারবে - এমন সম্ভাবনা কম বলেই বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞের ধারণা। যখন এক লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল, তখন জাতিসংঘ প্রায় আট কোটি ডলার ত্রাণ সাহায্য প্রয়োজন বলে হিসাব করেছিল। এখন এর চার-পাঁচ গুণ কিংবা বেশি সহায়তা প্রয়োজন পড়বে। কয়েক মাসে ১০ লাখের মতো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক সহায়তা যা-ই পাওয়া যাক না কেন, বাংলাদেশের বাজেটে যে বাড়তি চাপ পড়বে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কীভাবে মিলবে সেই অর্থ? কেবল বাজেটের উপর

চাপ নয়, বাংলাদেশকে আরও সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। কক্সবাজার-পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাতেই রোহিঙ্গারা আশ্রয় নিচ্ছে। ওই এলাকাই আমাদের প্রধান পর্যটন এলাকা। রোহিঙ্গাদের চাপ যেভাবে বাড়ছে তাতে পর্যটন খাতে বিরূপ প্রভাব পড়বেই। পরিবেশের উপরও চাপ পড়বে। পাহাড়-বনাঞ্চলের গাছ কাটা হবে। স্বাস্থ্যঝুঁকি আছে। নিরাপত্তা নিয়েও কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। স্বল্প মেয়াদে আমাদের উপর চেপে বসা অনাকাঙ্ক্ষিত এ সমস্যার সমাধান হবে - এমন আশা খুব কম পর্যবেক্ষকই করতে পারেন। এমনটি যাতে না হয় সে জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা যেমন বাড়াতে হবে, তেমনি চাই দেশের ভেতরে সমন্বিত উদ্যোগ।

সবকিছু মিলিয়ে অর্থনীতিতে এক ধরনের অশুভ সংকেত। অর্থমন্ত্রী এ পরিস্থিতিতে বাজেট মেলাবেন কী করে? খাদ্য আমদানির জন্য বাড়তি চাপ পড়বে। ইতিমধ্যেই আমাদের চলতি হিসাবে নেতিবাচক প্রবণতা ছিল। এখন তা আরও বাড়বে। চাল আমদানিতে বেশি ব্যয় পড়বে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের প্রবাহ আগের মতো নেই। রফতানিতেও ওঠানামার চিত্র। অর্থমন্ত্রী কি বাজেটের আয়-ব্যয় নিয়ে তার পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন? দ্রুতই এ কাজটি করা ভালো। তাতে বছরের বাকি ৯ মাসের জন্য এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হওয়া যাবে।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৭
সমকাল

অঙ্ক মেলানো সহজ হবে না
বাজেট ২০১৮-১৯

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

নতুন একটি অর্থবছরের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। আগামী ৭ জুন বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য বাজেট ঘোষণা করবেন। বাজেট কেমন হবে, সমাজের বিভিন্ন অংশের কী প্রত্যাশা, সেটি জানার জন্য তিনি ইতিমধ্যে অনেক বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। শুনেছেন দাবি ও সুপারিশ। আমরা ধরে নিতে পারি যে, ইতিমধ্যে বাজেট চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। এ বাজেট বাস্তবায়নে বর্তমান মহাজোট সরকার জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় পাবে। ডিসেম্বর নাগাদ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। যদি এ সরকারই ক্ষমতায় ফেরত আসে, তাহলে ধরে নিতে পারি যে, অর্থমন্ত্রীর ঘোষিত বাজেট বাস্তবায়নে তেমন সমস্যা হবে না। বরং ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। অন্য কোনো দল বা জোট নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারে। অর্থমন্ত্রী এটিও বলেছেন, বর্তমান দায়িত্বে তিনি আর থাকতে ইচ্ছুক নন। নতুন কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে এমনকি একই দল বা জোটের সরকার হলেও অগ্রাধিকারে কিছু ভিন্নতা থাকতেই পারে। অর্থমন্ত্রীকে এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই নতুন অর্থবছরের বাজেট তৈরি করতে হবে। বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে, ক্ষমতায় পরিবর্তন হোক বা না হোক, বাজেটে যেন বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে না হয়।

আমাদের অর্থনীতি ভালো হচ্ছে, এটি নিয়ে দ্বিমত করার অবকাশ নেই। তবে প্রত্যাশামাফিক সব সূচক সঠিক স্থানে নেই। তিনি টানা প্রায় দশ বছর অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন। তবে সম্ভবত আগের বছরগুলোতে যতটা স্বস্তি ছিল, এবারে

অঙ্ক মেলাতে খানিকটা কষ্টই হওয়ার কথা। এখন আমরা বেশ কিছু অস্বস্তির জায়গা চিহ্নিত করতে পারি। রফতানি আয়ে স্বস্তি আছে। প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণে মাঝে কিছুটা টান পড়লেও স্বাভাবিক ধারা ফিরেছে। তবে অস্বস্তির তালিকা বড়। ব্যাংক ঋণে সুদের হার বাড়ছে, যা বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। মূল্যস্ফীতির চাপ রয়েছে। গত বছর বোরো মৌসুম থেকেই চালের দাম বাড়তে শুরু করে, যা ভোক্তাদের কষ্ট দিয়েছে কয়েকটি মাস। গ্যাস-বিদ্যুতের দাম আরও বাড়ানোর প্রস্তাব বিবেচনাধীন, যা সাধারণ নাগরিক থেকে শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তা সবাইকে উদ্বিগ্ন রাখছে। জ্বালানি তেলের দাম বিশ্বব্যাপী বাড়ছে। সস্তায় তেল - এটি এখন অতীতের বিষয়। জ্বালানির মূল্য সমন্বয়ের দায়িত্ব এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অর্থনৈতিক বাস্তবতার পাশাপাশি অর্থনীতিতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় রাখতে হয়। বাংলাদেশের মুদ্রা টাকার অবমূল্যায়ন ঘটছে। ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে না। বেসরকারি খাত ও দৈনন্দিন বাজারের ক্রেতা, কারও জন্য এ অবস্থা সুখকর নয়। ডলারের মূল্য বাড়লে আমদানি পণ্যের দাম বাড়ে। বাংলাদেশের ভোগ্যপণ্যের বাজারে জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল, নানাবিধ ইলেকট্রনিক সামগ্রী, শিল্পের মেশিন ও কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্যসহ অনেক কিছুই আমদানির মাধ্যমে মেটাতে হয়। ডলারের মূল্য বাড়লে বাজারে এর প্রভাব পড়ে।

বাজেটের শৃঙ্খলা বজায় রাখাও অর্থমন্ত্রীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। সংসদে অর্থমন্ত্রী প্রতি বছর যে বাজেট ঘোষণা করেন, তার শতভাগ বাস্তবায়ন হয় না। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের ৭৯ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছিল। এর আগের বছরগুলোর পরিস্থিতি এর তুলনায় কিছুটা ভালো ছিল। এ ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হচ্ছে বাস্তবায়নের দুর্বলতা। রাজস্ব বাজেটে অনেক সময় প্রাক্কলন অনুযায়ী ব্যয় সম্ভব হয় না। তবে মূল সমস্যা দেখা যায় উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রে, যার প্রভাব আবার রাজস্ব বাজেটে পড়ে। রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনায় যুক্তদের সক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়টির প্রতি এখন বাড়তি মনোযোগ দিতেই হবে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকার কয়েকটি বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট রয়েছে। বিপুল ব্যয়ের এসব প্রকল্প রয়েছে সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায়। দেখা যাচ্ছে, এসব প্রকল্পের কারণে বাজেটে চাপ বাড়ছে, ঘাটতিও বাড়ছে। কিন্তু সরকার চাইলেই তো আয় বাড়াতে পারে না। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড রাজস্ব আয় আগের বছরের তুলনায় ৪২ শতাংশ বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বাস্তবে এমন অর্জন সম্ভব নয়, সেটি এনবিআর স্বীকার করে নিয়েছে। প্রবৃদ্ধি রাজস্ব আয়ে অর্জিত হতে পারে ১৬-১৭ শতাংশ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ-এর অনুমান, এ বছর রাজস্ব আয় হবে প্রাক্কলনের অন্তত ৫০ হাজার টাকা কম।

এমন বাস্তবতাতেই অর্থমন্ত্রী আগামী অর্থবছরের জন্য বর্তমান বছর থেকেও অনেক বড় অঙ্কের বাজেট ঘোষণা করতে চলেছেন, যা চার লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা হতে পারে। আমাদের জানা আছে, চলতি অর্থবছরের জন্য সংসদে চার লাখ ২৬৬ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, কাটছাঁটের পর এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন লাখ ৮৫ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় না বাড়িয়ে কীভাবে চার লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকার বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব হবে, সেটি কেউ স্পষ্ট করছেন না। বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই রাজস্ব আদায়ের নতুন উৎস খুঁজতে হবে। চলতি অর্থবছরে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট আদায়ের নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যায়নি ব্যবসায়ীদের আপত্তির কারণে। নতুন অর্থবছরেও এ ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ আসার কথা নয়। কারণ এটি যে নির্বাচনের বছর!

বাজেটের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের আকার সাধ্যের মধ্যে রাখা উচিত বলে মনে করি। রাজস্ব আয় বাড়ানো উচিত এবং সম্ভবও, এটি মেনেই বলছি - যতটা আদায় করার মতো প্রশাসনিক সক্ষমতা রয়েছে, ততটাই লক্ষ্যমাত্রা ধরা উচিত। উন্নয়ন বাজেটের ক্ষেত্রেও একই কথা - যেসব প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের জন্য যতটা অর্থ বরাদ্দ দরকার, ততটাই রাখা চাই।

রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও রাজস্ব আয়ের সক্ষমতা বিবেচনায় রাখতে হবে। শোনা যায়, নতুন বছরের বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মীদের বিভিন্ন ধরনের সুবিধা প্রদান করা হবে। আমাদের জানা আছে, তিন বছরও হয়নি সরকারি কর্মীদের জন্য পে কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে প্রায় সবার বেতন-ভাতা দ্বিগুণ হয়েছে। মূল্যস্ফীতি বাড়লেও সরকারি কর্মীদের বেতন-ভাতা বাড়ানোর সময় আসেনি। এটিও মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান বাড়ছে। শিল্প-বাণিজ্য-সেবা খাতের প্রসার ঘটছে বেসরকারি খাতে। সরকারি খাতে বেতন বাড়লে বেসরকারি খাতেও চাপ বাড়ে একই ধরনের সুবিধা প্রদানের। যদি বেসরকারি খাত সরকারি খাতের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারে, তাহলে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হয়, যা কাম্য হতে পারে না। উৎপাদনশীল খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপরেও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

অভিজ্ঞতা আমাদের এটিই বলছে যে, সরকার অনুন্নয়ন খাতের ব্যয় অপরিকল্পিতভাবে বাড়ালে পরিকল্পিত উন্নয়নও ব্যাহত হয়। সরকার অনেক প্রকল্পের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে সমস্যায় পড়ে। এ ঘাটতি পূরণে ব্যয়বহুল উৎস থেকে সরকার ঋণ গ্রহণ করছে।

উদাহরণ হিসেবে সঞ্চয়পত্র বিক্রির কথা বলা যায়। বাজেটে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে দায় বেশি এমন আয়ের উৎস সীমিত রাখা আবশ্যক। সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশি সূত্র থেকে ঋণ বেড়েছে। এ সূত্র থেকে অর্থের সুদহার দেশীয় সূত্রের ঋণের তুলনায় কম। পরিশোধের মেয়াদও দীর্ঘ হয়ে থাকে। বাজেট বাস্তবায়নে বিদেশি ঋণের উপর নির্ভরতা দূষণীয় নয়। বরং এভাবে প্রাপ্ত অর্থ বাজেটের উপর চাপ কমানোয় সহায়ক হয়।

নির্বাচনী বছরের বাজেটে ভর্তুকির চাপ বাড়তে পারে, এমন শঙ্কা করা হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে রাখতে ভর্তুকি দিলে আপত্তির কিছু নেই। এতে খাদ্যশস্যের বাজারও নিয়ন্ত্রণে থাকে। জ্বালানি খাতে ভর্তুকির ক্ষেত্রে মূল্য সমন্বয়ের দিকে নজর রাখা চাই। ব্যাংকের মূলধনজনিত সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন সময়ে যে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে, তা থেকে সুফল মেলেনি। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এ বাবদ প্রায় ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এটি ব্যয় হয়েছে মূলত বেসিক ব্যাংক ও সোনালী ব্যাংকের পেছনে। কিন্তু এ দু'টি ব্যাংকের পরিস্থিতির উন্নতি ঘটেনি। এখন দেখা যাচ্ছে, বেসরকারি ব্যাংকও সরকারের কাছ থেকে সুবিধা চাইছে এবং সেটি দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু সুদের হার কমানোর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হচ্ছে না।

সরকারের বড় বড় বা মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন হার সব ক্ষেত্রে সন্তোষজনক নয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ার কথা। কিন্তু প্রকল্প সময়মতো সমাপ্ত না হলে কিংবা বাস্তবায়ন ব্যয় প্রাক্কলনের চেয়ে বেড়ে গেলে অর্থনীতিতে চাপ বাড়ে। মেগা প্রকল্প সময়মতো বাস্তবায়িত না হলে তার রিটার্ন আসাও বিলম্বিত হবে। উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ রাখার ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন সক্ষমতাও বিবেচনায় রাখা দরকার। বরাদ্দ রাখা হলো, অথচ ব্যয় করা গেল না - এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেখা গেছে, ফার্স্ট ট্রাকের জন্য চিহ্নিত প্রকল্পগুলোর জন্য বরাদ্দ অর্থের ১৪ শতাংশ ফেরত গেছে। অথচ সামান্য অর্থ বরাদ্দ দিতে না পারায় ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পণ্য রাখার জন্য অপরিহার্য একটি শেড নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা যায়নি। আশা করব, নির্বাচনের বছর হলেও বাজেটে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক ও গুণমান বিবেচনা প্রাধান্য পাবে। বাজেট বাস্তবায়ন হবে নির্বাচনের আগে ও পরে সমানভাবে। আশা থাকবে, অর্থমন্ত্রী এ বাস্তবতা বিবেচনায় রাখবেন। অর্থনীতিতে যেসব সংস্কার অপরিহার্য বাজেট ভাষণে তার দিকনির্দেশনা থাকলে ভালো হয়। বিশেষ করে শুল্ক কাঠামো, ভ্যাট, কৃষি, ব্যাংক, পুঁজিবাজার - এসব বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট পরামর্শ-সুপারিশ থাকতে হবে। আরও নজর চাই কর্মসংস্থানমুখী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার প্রতি।

অর্থমন্ত্রীর সামনে চ্যালেঞ্জ অনেক। প্রত্যাশা বিপুল; কিন্তু সাধ্য সীমিত। কী করবেন তিনি, জানতে পারব ৭ জুন।

০৫ জুন ২০১৮
সমকাল

ভালো-মন্দ সবই অব্যাহত থাকবে

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এই বাজেটের সামগ্রিক মূল্যায়ন করলে বলতে হবে যে, বিগত দশক ধরে আমরা যেসব আর্থিক ব্যবস্থাপনাগত প্রবণতাগুলো দেখি, ভালো এবং মন্দ মিশিয়ে - সেগুলোরই একটি স্থিতাবস্থা অব্যাহত থাকবে বলে মনে হয়। সেভাবে এক কথায় এটি স্থিতাবস্থার বাজেট। কিন্তু ধারাবাহিকতার সমস্যা হলো, যেসব নতুন অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকাশ পাচ্ছে বা অর্থনীতিতে যে ধরনের নতুন চাপ সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা খুব বেশি সংবেদনশীলতা দেখি না। যেমন সাম্প্রতিককালে আমরা সিপিডি'র পক্ষ থেকে বলেছি আমাদের বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে একটি বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। ১১ বিলিয়ন ডলার ইতিমধ্যে এখানে ঘাটতির দিকে গেছে, এই ঘাটতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। তেলের দাম বাড়ছে পৃথিবীতে, খাদ্যশস্য এবং সারের দাম বাড়ছে। এর ফলে আমাদের রপ্তানি আয় এবং রেমিট্যান্সের প্রবাহ যদি ঠিক না থাকে তাহলে কী ধরনের চাপ পড়বে টাকার মূল্যমানেরর উপর, সুদের উপর এবং মূল্যস্ফীতির উপর। সেসব বিষয়ে আমরা কোনো ধরনের সংবেদনশীলতা দেখিনি। একই রকমভাবে আমরা মনে করি, বর্তমানে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সমস্যা একটি বড় সমস্যা। অর্থমন্ত্রী সঠিকভাবে উল্লেখ করেছেন, এখন পর্যন্ত অর্থনৈতিক চাপ খুব বেশি না, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে চাপ বাড়তে পারে। দু'টি মূল্যায়নই ঠিক। কিন্তু উনি একবারও রোহিঙ্গাদের বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ-পোষণের জন্য কী পরিমাণ অর্থ দেশে খরচ করতে হচ্ছে, যেসব সেবা দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ প্রশাসন কাজ করছে, সেনাবাহিনী কাজ করছে এদের যদি আর্থিকভাবে মূল্যায়ন করি তাহলে কত পড়ে সে রকম কিন্তু বাজেটে কোনো আর্থিক মূল্যায়ন দেখলাম না। তাই কোনো সংস্কারের কথা নেই, এমনকি একক পূর্ণাঙ্গ ভ্যাট চালুর পরিকল্পনার কথা। আরও যেমন ব্যাংকিং খাত যে বড় ধরনের জটিল সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, সে

সমস্যাটা পুরো পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। উপরন্তু ব্যাংকিং খাতে যেসব নতুন কর রেয়াত দেওয়া হয়েছে তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

আমরা যেটি বেশি দেখলাম যেহেতু ১০ বছরের একটি মূল্যায়ন করার চেষ্টা অর্থমন্ত্রী করেছেন, তাই অনেক ক্ষেত্রে রোমন্থনমূলক বক্তৃতা হয়েছে, পশ্চাৎমুখী বক্তৃতা হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে হয়তো এটিই স্বাভাবিক। এটিও তো ঠিক নির্বাচনকে সামনে রেখে একটি উদ্দীপনাময় কিন্তু বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক পথরেখা তুলে ধরা যেত।

পুরনো প্রবণতা অব্যাহত থাকেল অত বড় রাজস্ব আদায় হবে না, অত ব্যয় আমরা করতে পারব না। বাজেট ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পুরনো কাঠামো, পুরনো চিন্তা এবং সেটির ভিতরেই স্থিতাবস্থা।

আজকে একই সঙ্গে সম্পূরক বাজেট দেওয়া হয়েছে এবং সংশোধিত বাজেট প্রকাশ হয়েছে। কিন্তু সম্পূরক বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য বাড়তি বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আমরা দেখতে পারছি বিদ্যুৎ সম্পূরক বাজেটের চাহিদার ২১ শতাংশ ব্যয় বেড়েছে। এটি যে বাড়তি খরচের অনুমতি চাওয়া হয়েছে তার ২৬ শতাংশ। ২২ শতাংশের মতো যাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জন্য। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বৃদ্ধির পরিমাণ হলো ২৩০ শতাংশের মতো। এই দু'টি মিলিয়ে বর্ধিত টাকা চাওয়ার প্রায় ৫০ শতাংশ যাবে।

সামগ্রিক সামষ্টিক আর্থিক কাঠামো কী এবং কিছু আর্থিক পদক্ষেপের ব্যাপারে আমার মতামত দিতে পারি।

আর্থিক কাঠামো সম্বন্ধে সামগ্রিক মূল্যায়ন হলো অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয় বেড়েই চলেছে। অপর দিকে আগের বছরগুলোতে যতখানি অভিলাষী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ছিল; এবার কিন্তু অতখানি অভিলাষী দেখতে পাচ্ছি না। এটি হতে পারে হয়তো মেগা প্রকল্পগুলোর অর্থায়ন ইতিমধ্যে হয়ে যাওয়াতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বৃদ্ধির হার হয়তো কমে আসছে। যেহেতু ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ নেই, শুধু রাষ্ট্রীয় খাতের বিনিয়োগ দিয়ে মোট বিনিয়োগকে বেশি দূর নেওয়াতে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে স্থবিরতা অব্যাহত আছে। উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয়ের বাইরে অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে রাজস্ব বৃদ্ধির হার, ব্যয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি আছে। সেহেতু আমাদের আর্থিক ঘাটতি বড়ভাবে বাড়ছে না। এটি ইতিবাচক ব্যাপার। প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধির গতি যেন শ্লথ হয়ে এসেছে। পরোক্ষ করে বিরাট ভার আয় নির্বিশেষে নাগরিকদের বহন করতে হবে। আপনারা জানেন দেশজ

আয়ের ৪-৫ শতাংশের বাজেট ঘাটতি আমাদের থাকে - এটি বড় কিছু নয়। এই ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে ইদানীং ইতিবাচক একটি প্রবণতা আমরা দেখছি। বৈদেশিক অনুদান এবং ঋণ আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ছাড় হচ্ছে। তার মানে দেশজ অর্থায়নের উপর চাপ কমছে। আগামী বছরও এটি অব্যাহত থাকবে এটিই আমরা আশা করছি। কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অর্থায়নে। আমরা বলেছি জাতীয় সঞ্চয়পত্রের উপর চাপ কমিয়ে, ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ নেওয়া ভালো হবে। কিন্তু সেই ব্যাংকিং খাত যদি সমস্যাসংকুল থাকে, সেখানে যদি তারল্য সংকট থাকে - তাহলে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ঋণ ব্যাংকিং খাত থেকে নেওয়াটা সমস্যাসংকুল রয়ে গেল। তাহলে শেষ পর্যন্ত তো সরকারকে আবার হয়তো জাতীয় সঞ্চয়পত্রের কাছেই ফিরে আসতে হবে এবং তার ফলে রাজস্ব ব্যয়ের বড় অংশ সুদ পরিশোধে চলে যাবে। তাই বাজেটের ঘাটতির পরিমাণ নয়, ঘাটতির অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে কাঠামো দেওয়া হয়েছে আমরা সেটিকে সমস্যাসংকুল মনে করছি।

যেসব আর্থিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোতে এখন যাই। সিপিডি'র বহুদিনের দাবি ছিল চালের আমদানিতে শুল্ক আরোপ করা হোক। সরকার এবার চাল আমদানিতে ২৫ শতাংশ কাস্টমস ডিউটি এবং ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক মোট ২৮ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। এতে আমরা খুব খুশি। যদিও এত দেরি করা উচিত হয়নি। এতে কৃ ষকরা উপকৃত হবে। আরও বেশ কিছু আর্থিক পদক্ষেপে আমরা একমত হয়েছি। যেমন সামাজিক খাতে যে সুবিধাভোগী মানুষের সংখ্যা বাড়ানো, ভাতার পরিমাণ বাড়ানো, এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অনেকগুলো জায়গায় সম্পূরক এবং নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। যেমন পরিবেশের দিক থেকে পলিথিনের উপর বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবন্ধী মানুষের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়াতে যারা আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা করবে না তাদের উপর ৫ শতাংশ কর আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া বিড়ি তৈরি, হেলিকপ্টার ব্যবহার, মোবাইল ফোন প্রস্তুতের উপর কর বাড়ানো হয়েছে। মোটরসাইকেলের উপর কর কমানো হয়েছে। কারণ দেশে মোটরসাইকেল তৈরি হবে। এগুলো ঠিক আছে। একদিকে কর রেয়াত দেওয়াতে কর কম আসবে, আবার অন্য কিছুতে বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি দেশজ শিল্প এবং সামাজিক খাতে গুরুত্ব দেওয়ার প্রতিফলন আমরা দেখেছি।

তবে দু-একটি বিষয় আমাদের বিচলিত করেছে। যেসব নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানি আছে তাদের উপর করপোরেট করের পরিমাপ ৪০-৩৭.৫ এবং অনিবন্ধিত ৪২.৫-৪০ শতাংশ করা হয়েছে। এই কর কমানোর আমরা কোনো অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা দেখি না। এই করের সুবিধা কোনো অবস্থাতেই ঋণ গ্রহীতারা সুদের কম হারের মাধ্যমে পাবে না। এটি থেকে আমানতকারীরাও কোনো সুবিধা পাবেন না।

উপরন্তু যখন বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বড় ধরনের নৈরাজ্য বিরাজমান, তখন তাদের প্রতি কোনো ধরনের আচরণগত সংস্কারমূলক শৃঙ্খলা না দিয়ে, এই সুবিধা দেওয়া আমাদের কাছে নৈতিকতা বিবর্জিত মনে হয়। দ্বিতীয় বিষয় হলো করযোগ্য আয়ের মাত্রা আছে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য বিবেচনায় এটি বাড়ানো উচিত ছিল। যাতে করে করদাতার প্রকৃত আয় রক্ষা করা যায় কারণ মূল্যস্ফীতির কারণে সেটি তো ক্ষয় হয়ে গেছে। সরকার এটিতে কোনো পরিবর্তন আনেনি। অথচ উচ্চ আয়ের যারা আছেন তাদের আনুতোষিক ব্যয়ের মাত্রা ৭৫ হাজার টাকা আরও তাদের বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উচ্চবিত্ত মানুষের আনুতোষিক সুবিধা দেওয়া হলো, অথচ নিম্নবিত্ত মানুষের প্রকৃত আয় সংরক্ষণ দেওয়া হলো না। এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

আবাসন খাতে ১১শ বর্গফুট পর্যন্ত আগে ভ্যাট ছিল দেড় শতাংশ আর ১১শ-১৬শ পর্যন্ত ছিল আড়াই শতাংশ। এটিকে একত্রিত করে ১১শ-১৬শ এর ভিতরে সবার জন্য ২ শতাংশ করা হলো। আবারও নিম্ন-আয়ের ফ্ল্যাট ক্রেতাদের উপর চাপ বাড়ানো হলো, আয় সচ্ছলদের সুবিধা দেওয়া হলো। এগুলো কেমন আর্থিক পদক্ষেপ হলো সামাজিক সাম্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

৮ জুন ২০১৮
বাংলাদেশ প্রতিদিন

কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোই বাজেটের বড় চ্যালেঞ্জ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

উচ্চহারে জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ব্যক্তি বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনে আশানুরূপ ফল দেখা যাচ্ছে না। এজন্য আগামী বাজেটে বড় চ্যালেঞ্জ হবে প্রবৃদ্ধির গুণগতমান পরিবর্তন করে কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর কৌশল প্রণয়ন।

পাশাপাশি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যেসব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা মোকাবেলা করা। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন।

তার মতে, নির্বাচনী বছরে সংযত নীতিতে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। ফলে বাজেটের মধ্য দিয়ে এ বাস্তবতা কীভাবে মোকাবেলা করা হবে এর পথ বের করতে হবে। দেবপ্রিয়'র মতে নির্বাচন সামনে রেখে গণতান্ত্রিক উত্তরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় চিড় ধরেছে। বিশেষ করে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের ঘাটতি এবং বিদেশে টাকা পাচার বাড়ছে। এ অবস্থায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সংযত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে।

এ অর্থনীতিবিদের মতে, গত কয়েক বছরে বিশ্ব অর্থনীতির কারণে দেশের অর্থনীতি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। বিশেষ করে জ্বালানি তেল, চাল ও সারের দাম ছিল

নিম্নমুখী। এতে আমদানি ব্যয় এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে।

যা অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি তৈরি করবে। অন্যদিকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন ছাড়া ঋণের সুদের হার কমানো, অর্থপাচার রোধ করা এবং বিনিয়োগ বাড়ানো সম্ভব নয়। আর অর্থ পাচার বন্ধে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেন বিশিষ্ট এ অর্থনীতিবিদ।

এ ছাড়াও বাজেটে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে জোর দেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মনির হোসেন।

যুগান্তর: নির্বাচনের আগে শেষ বাজেটে সরকারের বড় চ্যালেঞ্জ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: গত কয়েক বছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি মোটামুটি শোভন অবস্থায় থাকার পরও সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতায় অল্প অল্প করে চিড় ধরছে। যে প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে, তাতে মানুষের কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আশানুরূপ ইতিবাচক ফল দেখছি না। ফলে আগামী অর্থবছরে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে প্রবৃদ্ধির গুণগতমান বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির উপর বিদ্যমান চাপ মোকাবেলা করা। একটি বিষয় লক্ষণীয়, চলতি বছরে ৭ দশমিক ৬৫ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এ হার এত উচ্চ হওয়া সত্ত্বেও কেন কর্মসংস্থান বা আয়ের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন আসছে না? অপরদিকে বৈষম্য বাড়ছে। ক্রমেই ভোগ বৈষম্য, আয় বৈষম্য ও সম্পদের বৈষম্য বাড়ছে। শিক্ষিত যুবকরা কর্মসংস্থান থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত। ফলে আগামী বাজেটে বড় একটি চ্যালেঞ্জ থাকবে, প্রবৃদ্ধির গুণগতমান পরিবর্তন করে মানুষের কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানোর কৌশল প্রণয়ন করা। তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি হলেও কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভালো কি না তা বিবেচনা করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ক্ষেত্রে যেসব চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা মোকাবেলা করা।

যুগান্তর: এ সমস্যার সমাধানে আপনার সুপারিশ কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: প্রথমটির ক্ষেত্রে সমাধান হল শিল্প খাতে ব্যক্তি বিনিয়োগ বাড়ানো। কারণ ব্যক্তি বিনিয়োগ না বাড়লে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি হবে না। বর্তমানে যে প্রবৃদ্ধি আমরা দেখছি তা অনানুষ্ঠানিক ও সেবামূলক খাতে। অথবা এমন কোনো উচ্চপর্যায়ের আধুনিক খাতে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে, যেখানে উচ্চপ্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নতুন কর্মসংস্থান হচ্ছে

না। কিন্তু শ্রমঘন শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে গতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এ গতি যতক্ষণ না আনা যাবে, ততক্ষণ সমস্যার টেকসই সমাধান হবে না। আর এ শ্রমঘন শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে দেশীয় শিল্পকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থনীতিতে রফতানি অব্যশই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হল অভ্যন্তরীণ যে বাজার গড়ে উঠছে, তাকে সমর্থন দেওয়া। ফলে আগামী বাজেটে রফতানিতে গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি দেশীয় বাজারমুখী শিল্পকে গুরুত্ব দিতে হবে।

যুগান্তর: সামষ্টিক অর্থনীতিতে কী ধরনের চাপ রয়েছে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বিশ্ব অর্থনীতির কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কিছু সুবিধা আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, চাল ও সারের দাম নিম্নমুখী ছিল। এতে আমদানি ব্যয় কম ছিল এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। এরই মধ্যে অশোধিত তেলের ব্যারেল ৭০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে। একইভাবে সার ও চালের দাম বাড়ছে। ফলে আগামী দিনে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত দুই খাতেই মূল্যস্ফীতির আশঙ্কা রয়ে গেছে। অন্যদিকে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে যে ঋণ নেওয়া হচ্ছে, সেটি অবশ্যই জাতীয় দায়দেনা পরিশোধের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। সামষ্টিক অর্থনীতির চাপের বড় একটি দিক হল সম্পদ আহরণ। এক্ষেত্রে গত বছর রাজস্বের প্রাক্কলন করা হয়েছে, আমরা বলেছি ৫০ হাজার কোটি টাকা ঘাটতি হতে পারে। তার মানে হল, এখানে অবাস্তব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল। আর এ লক্ষ্যমাত্রার উপর নির্ভর করেই ব্যয়ের কাঠামো ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ পরিমাণ আয় না হওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় মেটাতে সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ করতে হচ্ছে। প্রত্যক্ষ আয়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। আগামী বাজেটেও করের জাল বিস্তৃত করে হয়রানি কমিয়ে আয় বাড়াতে পারবে কি না, সেটি একটি চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে কর্পোরেট কর কমানোর কথা বলা হচ্ছে। এ কর কমানো হলে আয়করের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণের উপর চাপ আরও বাড়বে।

যুগান্তর: সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় সামনে চলে আসছে, তা হল টাকা পাচার। নির্বাচনী বছরে এ আশঙ্কা আরও বেশি। এক্ষেত্রে করণীয় কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ইংরেজিতে এ বিষয়ে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়, যা হল- লিকেজ, ইভেশন এবং মানি লন্ডারিং। লিকেজ হল কর আদায় দুর্বলতা। কিছু লোক কিছু কর দেয়। ইভেশন হল কিছু লোক কিছুই দেয় না। আর মানি লন্ডারিং হল কিছু লোক টাকা না দিয়ে তা দেশের বাইরে পাচার করে। দেশের ভেতরে অস্থিতিশীলতার কারণে নির্বাচনকালীন টাকা পাচার বৃদ্ধি পায়। টাকা পাচার বন্ধের ব্যাপারে সরকারের কোনো দৃঢ়

রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়নি। এ ধরনের সিদ্ধান্ত থাকলে পানামা পেপারস এবং প্যারাডাইস পেপারসে যাদের নাম আছে, তাদের বিষয়ে তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতো। পত্রিকায় নাম-ঠিকানাসহ বিস্তারিত ছাপা হয়েছে। কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। রাষ্ট্রীয় সংস্থা এত লোকজনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে কোনো খোঁজখবর নিল না। আর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত না থাকলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যতই বাহ্যিক তৎপরতার কথা বলুক না কেন, তাতে কোনো লাভ হবে না। টাকা পাচারে রোধে নির্বাচনের আগে কিছু করবে, অথবা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে তা উল্লেখ থাকবে কি না, সেটি দেখার বিষয়।

যুগান্তরঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সরকার কী কৌশল নিতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ একটি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা কতটা সংহত, তা তিনটি সূচক দিয়ে বোঝা যায়। এগুলো হল - মূল্যস্ফীতির হার, ব্যাংক ঋণের সুদের হার এবং মুদ্রার বিনিময় হার। সরকারকে সামষ্টিক অর্থনীতির ব্যবস্থাপনার জন্য এ তিনটি বিষয়ে নজর দিতে হয়। কিন্তু ব্যাংকিং খাতের সমস্যার কারণে সুদের হার বাড়বে। এ ছাড়াও রফতানি বৃদ্ধির হার ওঠানামা করছে। রেমিটেন্সে প্রবৃদ্ধি কম। এতে চলতি হিসাবের ভারসাম্য নেতিবাচক। ফলে রিজার্ভ বেশি থাকার পরেও টাকার মান কমছে। আগামী দিনে টাকার বিনিময় হার আরও দুর্বল হতে পারে। এ কারণে সরকারকে সংযত সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেতে হবে। কিন্তু নির্বাচনী বছরে রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা যায় না।

যুগান্তরঃ নির্বাচনী বছরে রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কা থাকে। এক্ষেত্রে বাজেট বাস্তবায়নে কী ধরনের পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হতে পারে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। কেউ কেউ মনে করতে পারেন, রাজনৈতিক প্রতিকূল পরিস্থিতি স্বল্পমেয়াদি সমস্যা। আর অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মধ্যমেয়াদি। ফলে নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করছেন। কিন্তু আমরা মনে করছি, এটি ক্যালকুলেটেড রিস্ক। এর মানে হল, হিসাব করে আপনি ঝুঁকি নিচ্ছেন। আর এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে অর্থনীতিতে ডামাডোল সৃষ্টি হবে। গণতান্ত্রিক উত্তরণের সঙ্গে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, আগামী অর্থবছরের বাজেটের মধ্য দিয়ে এটি কীভাবে পার হব, সেটি দেখার বিষয়।

যুগান্তর: ব্যাংকিং খাতে একধরনের বিশৃঙ্খলা চলছে। শৃঙ্খলা ফেরাতে বাজেটে কী ধরনের পদক্ষেপ আশা করছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাচন সামনে রেখে কোনো প্রগতিশীল সংস্কার আশা করছি না। ফলে এবারের বাজেটেও ব্যাংকিং খাতের জন্য ভালো কিছু দেখছি না। মন্ত্রী মাঝেমধ্যে বলেন কমিশন বানাবেন। বর্তমানে এ খাত থেকে যেসব তথ্য-উপাত্ত আসছে, এর কোনোটাই নির্ভরযোগ্য নয়। প্রকৃত সমস্যা আরও ভয়াবহ। তিনি বলেন, সমস্যা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে না। এক্ষেত্রে স্বাধীন কমিশন বানানোর জন্য তিন-চার বছর সিপিডি সুপারিশ করে আসছে। কিন্তু তার বাস্তবায়ন নেই। দীর্ঘমেয়াদি নয়, স্বল্পমেয়াদি একটি কমিশন বানাতে হবে। এ কমিশনের কাজ হবে ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনা। এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হবে ব্যাংকিং খাতের বাস্তব অবস্থা নির্ণয় করা। সুনির্দিষ্ট কিছু তথ্য তুলে ধরতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে - আসলে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ কত এবং সেখানে কত টাকা পুনঃতফসিলি করা হয়েছে। এ ঋণখেলাপি কারা, কত টাকা মাফ করে দেওয়া হয়েছে, কোন ব্যাংকের পুঁজি ঘাটতি কত, তার নিরাপত্তা সঞ্চিতির ঘাটতি আছে কি না।

যুগান্তর: সংস্কার কমিশন গঠন না করে উল্টো আইন সংশোধন করে ব্যাংকের পর্ষদে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: মনে হচ্ছে ব্যাংকের মালিকদের বা নিয়ন্ত্রণকারীদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে বলে কমিশন গঠন করা হয়নি। বর্তমানে এ খাতে যা করা হচ্ছে, তা রোগ নির্ণয় না করে রোগের উপসর্গের পেছনে দৌড়ানো হচ্ছে। ব্যাংকে তারল্য সংকটের কথা হচ্ছে। এরপর সিআরআর (বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ব্যাংকগুলোর নগদ জমার হার) কমানো হল। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে, তা একেবারে ভ্রান্ত। প্রকৃত সমস্যা হল - ব্যাংকের কোনো সুশাসন নেই, ভুয়া ঋণ দেওয়া হয়েছে, টাকা আদায় করা হয় না। বর্তমানে যত টাকা জমা হচ্ছে, তার চেয়ে বেশি ঋণ দেওয়া হচ্ছে। এটি রোগ। এ রোগের চিকিৎসা না করে উপসর্গ দিয়ে কতদিন পার করা যায়? অন্যদিকে এবারের বাজেটেও আবার সৎ করদাতাদের টাকা দিয়ে অসৎ ঋণগ্রহীতাদের ভর্তুকি দেওয়া হবে। এটি অনৈতিক এবং অর্থনীতির মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী এবং সুশাসনের ব্যত্যয়।

২৮ মে ২০১৮
যুগান্তর

বাজেটে বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে

মোস্তাফিজুর রহমান

আগামী অর্থবছরের বাজেটে দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে কৌশল প্রণয়নের তাগাদা দিয়েছেন বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। আসন্ন বাজেটে প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনা, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া, সঞ্চয়পত্রে সুদের হার নতুনভাবে নির্ধারণ, ব্যাংক খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে ব্যাংকিং কমিশন গঠন, করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোসহ একগুচ্ছ প্রস্তাবও করেছেন তিনি। তিনি অর্থবছরের শেষ সময়ে কাটছাঁট করে অর্থনীতিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা এড়াতে যৌক্তিক হারে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, নতুন রাজস্বের ভার না চাপানো, করদাতাদের ভোগান্তি এড়াতে প্রযুক্তিনির্ভরতায় রাজস্ব আদায়ে আগামী অর্থবছরে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন ফারজানা লাবনী।

কালের কণ্ঠ: আমরা উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছি। সামনে নির্বাচন। অর্থনীতির এমন প্রেক্ষাপটে আগামী অর্থবছরের বাজেটে কোন বিষয়গুলোর গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: এ দেশে সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধ সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতাগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর করতে হবে। দারিদ্র্য দূর করতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে দ্রুত অর্থছাড়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট এসব চাহিদার নিরিখে প্রণীত হওয়া উচিত। এ ছাড়া নির্বাচনকালীন বাজেট হওয়ায় ভবিষ্যতে ভোটার তুষ্টির চেষ্টা থাকবে। রাজনীতির সূত্রে শেষ পর্যন্ত

বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কি না তার বাস্তবসম্মত সমাধান না রেখেই অনেক প্রকল্প নেওয়ার নজির এ দেশে আছে। রাজনৈতিক সরকারের বাজেট প্রণয়নে নির্বাচনের প্রভাব পড়বেই। নির্বাচনের বছরে অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং বাস্তবায়নে গুরুত্ব না দিয়েই বড় বড় প্রকল্প বাজেটে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা থাকতে পারে। নির্বাচন সামনে রেখে বড় বড় প্রকল্প নেওয়া ঠিক হবে না। এতে নির্বাচনে চমক সৃষ্টি হলেও পরে মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, যা পরবর্তী সময় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তাই চলমান ব্যয়, রাজস্ব আয় ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়নে নজর দিয়ে আগামী বাজেট প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আগামী বাজেটে কালো টাকা ব্যবহারের সুযোগ বন্ধ করতে ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কালের কণ্ঠ: বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের গত ও বর্তমান মেয়াদে প্রতি অর্থবছরেই বাজেটের আকার বাড়ানো হচ্ছে। অনেক সময় অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, যা সরকারের সফলতা।

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটের আকার বাড়ানোর চেয়ে বাস্তবায়নে নজর দেওয়া উচিত। আকার বাড়িয়ে বাহবা নেওয়ার আগে ভেবে দেখতে হবে, বাজেটে যা করতে চাওয়া হয়েছে, তা করা সম্ভব হয়েছে কি না। শোনা যাচ্ছে আগামী অর্থবছরে চার লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রণীত হবে। ভেবে দেখতে হবে, 'বড় অঙ্কের বাজেটে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করতে পারছি কি না। যা ব্যয় করতে চেয়েছি, তা পারছি কি না। সম্পদের বণ্টন ও বাস্তবায়ন সব কিছু মানসম্মত হচ্ছে কি না।' এ দেশে বহুমাত্রিক চাহিদা আছে। সামাজিক বরাদ্দ, অবকাঠামো খাতের উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ কীভাবে করা যায় তা নিয়ে আগামী বাজেটে চিন্তা করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: বড় বাজেটে অর্থ জোগাড়ে কোন খাতে বেশি গুরুত্ব দিতে অর্থমন্ত্রীকে পরামর্শ দেবেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: সম্পদ আহরণে যে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের দরকার ছিল, সেখানে শ্লথ অগ্রগতি হয়েছে। ভ্যাট (ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স) বা মূসক (মূল্য সংযোজন কর) আইন ২০১২ স্থগিত করায় রাজস্ব আহরণের গতি কমেছে। অন্যদিকে আয়কর আইনও চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়নি। এখনো এ দেশে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর আদায়ে বড় ধরনের ব্যবধান আছে। বাজেটের বিনিয়োগ দর্শন, সম্পদ বণ্টন নীতির বিপরীতে কাজ করেছে। আয় বাড়াতে গেলে প্রত্যক্ষ কর আদায় ৫০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। ভ্যাট আইন ২০১২ পরে কার্যকর হলেও অনলাইনে ভ্যাট আদায়, ই-সাবমিশন, সব ধরনের

ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ই-ভ্যাট কালেকশন, আমদানি-রপ্তানি পর্যায়ে লিয়েন ব্যাংক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে অনলাইনে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এসব কার্যক্রম দিয়ে আয় বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা আগের চেয়ে বেড়েছে; কিন্তু আশানুরূপ নয়, এমন মত অনেকের। এ বিষয়ে আপনার পরামর্শ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: এনবিআরের সক্ষমতা বাড়ানোয় সবচেয়ে মনোযোগী হতে হবে। রাজস্ব ফাঁকি রোধে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। না হলে আর্থিক দুর্নীতি কমবে না। অর্থপাচার বাড়তে থাকবে। এনবিআরকে প্রযুক্তিনির্ভর কাজে অভ্যস্ত করতে হবে। শুধু পরিকল্পনা করলে হবে না। বাস্তবায়নও করতে হবে। আমদানি-রফতানিতে প্রযুক্তিনির্ভরতায় কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হলে হাজার হাজার কোটি টাকা আর্থিক অনিয়ম বন্ধ হবে। সঠিক হিসাবে ভ্যাট আদায় হবে। সারা দেশের লাখ লাখ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্যাট আদায় হবে। আয়করে কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। এমন সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে যে করযোগ্য আয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন ব্যক্তি প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে করদাতা হিসেবে চিহ্নিত হবে। এটি অসম্ভব কিছু নয়। পৃথিবীর অনেক দেশেই এসব ব্যবস্থা আছে। সময়ক্ষেপণ না করে আগামী বাজেটেই এসব কাজে অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলেও এনবিআরের আয় বাড়ছে। এনবিআরবহির্ভূত আয় বাড়ানোয় আরো নজর দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: অবশ্যই। আগামী বাজেটে এনবিআরের বাইরে কর ও করবহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত। ফি বাড়ানো ও আদায়ে নজরদারিতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

কালের কণ্ঠ: রাজস্বসংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর প্রয়োজন হচ্ছে। বড় অঙ্কের অর্থ রাজস্বসংক্রান্ত মামলা জটিলতায় আদায় হচ্ছে না। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনে বেশির ভাগ ব্যবসায়ী আসতে আগ্রহী হচ্ছে না।

মোস্তাফিজুর রহমান: আগামী বাজেটে যে বিষয়গুলোতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে অন্যতম বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি আইনে আসতে সবাইকে আগ্রহী করে তোলা।

অনিষ্পত্তি হওয়া মামলা নিষ্পত্তিতে সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের এক টেবিলে বসাতে হবে। কেন বিকল্প আইন কার্যকর হচ্ছে না, কেন ব্যবসায়ীরা আসছে না, সমস্যা কোথায় তা চিহ্নিত করে আগামী বাজেটে সমাধানে জোর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, আইনি জটিলতায় এনবিআর হাজার হাজার কোটি টাকা আদায় করতে পারছে না, যা সরকারের কোষাগারে জমা হলে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে। এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারলে আটকে যাওয়া অর্থ আদায় হবে।

কালের কণ্ঠ: প্রতি বছরই জতীয় বাজেটে বড় ধরনের ঘাটতি থাকছে। এ ঘাটতি কমাতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন?

মোস্তাফিজুর রহমান: ঘাটতি কমাতে আয় বাড়ানোর কৌশল নিতে হবে। সম্পদ আহরণ ও সম্পদ ব্যয়ের সঠিক প্রাক্কলন করতে হবে। বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সতর্ক থাকতে হবে। সম্পদ আহরণের সক্ষমতা বাড়িয়ে সম্পদ ব্যয় সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়াতে হবে। এনবিআর এবং এনবিআরবহির্ভূত ঘাটতির যে প্রাক্কলন করা হচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত হতে হবে। প্রতি অর্থবছর অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এনবিআরের করা হিসাবে গরমিল হয়। এ হিসাব যত কম হয় সে চেষ্টা করা উচিত। প্রতি অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা এমনভাবে বাড়ানো হয় যে বছর শেষে তা আবার সংশোধন করে কমিয়ে আনতে বাধ্য হতে হয়। এতে শুধু বাজেটের শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না, অর্থনীতির ভারসাম্যও নষ্ট হয়। রাজস্ব প্রবৃদ্ধি সর্বোচ্চ ২৫ শতাংশের বেশি হওয়া উচিত নয়। প্রযুক্তি ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে। তবে তা রাতারাতি হবে না। এ জন্য সময় প্রয়োজন। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ সম্পদ ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে বৈদেশিক ঋণ আনতেও বাজেটে নির্দেশনা থাকতে হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণ পরিষেবার রেকর্ড ভালো। বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার বেশি হলে অভ্যন্তরীণ ঋণের যে চাপ বাড়ছে, তা সামাল দেওয়া যাবে। অভ্যন্তরীণ সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। সঞ্চয়পত্রের সুদের দায় ও ভার বাজেটের অংশ হিসেবে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আগামী বাজেট প্রণয়নকালে এসব বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনি জোর দেওয়ার কথা বলছেন। এ বিষয়ে আপনার সুপারিশ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: সাধারণত প্রতি অর্থবছরে কিছু নতুন প্রকল্প শুরু করা হয়, কিছু চলমান থাকে, কিছু শেষ হওয়ার কথা থাকে। আগামী বাজেটে যেসব প্রকল্প শেষ

হওয়ার কথা, সেসবে দ্রুত অর্থ ছাড় করে প্রয়োজনে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সব ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি আনতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাড়লে ব্যয়ও বাড়ে। প্রকল্প বাস্তবায়নে গতি ধীর হলে অনেকে সুবিধাবঞ্চিত হয়। আগামী বাজেটে অবশ্যই প্রকল্পের পরিচালক নিয়োগে মনোযোগী হতে হবে। গতি আনতে হলে মেধাসম্পন্ন পরিচালক নিয়োগ করতে হবে। যোগ্য পরিচালক ঘন ঘন বদলি করা যাবে না। অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রকল্পের তহবিলে দ্রুত পাঠাতে হবে। তৃতীয় কিস্তির অর্থ প্রকল্পের তহবিলে স্থানান্তরের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে। চতুর্থ কিস্তির অর্থ রিসোর্স কমিটির মাধ্যমে দ্রুত সরবরাহে প্রস্তুত থাকতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কঠোর নজরদারির নির্দেশনা রাখতে হবে। ব্যক্তি খাত নির্ভরশীল প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে নজরদারি এবং খবরদারিতে আগামী বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশ থাকতে হবে। বড় প্রকল্পের সঙ্গে ছোট ও মাঝারি প্রকল্পেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, গতি আনতে গিয়ে উৎকর্ষ যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে জন্য বাজেটে দিকনির্দেশনা রাখতে হবে। প্রকল্পে ব্যবহৃত সামগ্রী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত নজর দিতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নে চাপ রাখতে হবে। এতে ভবিষ্যতে বৈদেশিক প্রকল্প পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।

কালের কণ্ঠ: আগামী বাজেটে ব্যাংকিং খাতে আর্থিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে আপনার সুপারিশ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: গত কয়েক বছরে কালো টাকা সাদা ও ব্যাংকের পূর্ণ পুঁজিকরণে অর্থের বরাদ্দ লক্ষ্য করছি। ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে আগামী বাজেটে ব্যাংকিং কমিশন গঠনের সুপারিশ করছি। আগামী অর্থবছরে অবশ্যই ব্যাংকিং খাতের চলমান সমস্যার পথনির্দেশনা থাকতে হবে। এসব নির্দেশ বাস্তবায়নে জোর দিতে হবে। ব্যাংক খাতের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থাকতে হবে। ব্যক্তিবিশেষের কর্মকাণ্ডের কারণে উদ্ভূত ক্ষতি গ্রহণযোগ্য নয়। তাই দোষীদের জন্য আগামী বাজেটে কঠোর আইন ও আইনি প্রয়োগ রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: শোনা যাচ্ছে, আগামী বাজেটেও অপ্রদর্শিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ থাকছে।

মোস্তাফিজুর রহমান: যাঁরা নিয়মিত কর দেন না, তাঁদের কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া অনৈতিক। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কোনোভাবে যৌক্তিক মনে করি না।

এসব ক্ষেত্রে কঠোর আইনের প্রয়োগ থাকা উচিত। দেশ এগিয়ে নিতে আর্থিক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন অত্যন্ত জরুরি।

কালের কণ্ঠ: সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বাড়ছে। ভবিষ্যতে এসব ক্ষেত্রে কী প্রস্তাব করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: নিরাপত্তা খাতে ব্যয় (পেনশন বাদে) জিডিপি'র ১.৭ শতাংশ। জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলের সঙ্গে সমন্বয় করে এ হার ৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। আগামী বাজেটে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমার কথা চিন্তা করতে হবে।

কালের কণ্ঠ: আশানুরূপ বিনিয়োগ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের প্রতিবন্ধকতাগুলোর বেশ কয়েকটি এখনো বিরাজমান। অনেক পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও বিনিয়োগ বাড়াতে কার্যকর পদক্ষেপ নেই বলে অনেক সময় অভিযোগ পাওয়া যায়।

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটে বিনিয়োগে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশেষভাবে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে। স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের মাধ্যমে বিদেশি বিনিয়োগ আসে। বিনিয়োগের বাধাগুলো দূর করতে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু সরকারের অন্য অনেক প্রকল্পের মতো এখানেও জটিলতা রয়েছে। বাস্তবায়নে ধীরগতি। গ্রহণ করা অনেক উদ্যোগ পরিকল্পনায়ই সীমাবদ্ধ আছে। এসব বহু পুরনো সমস্যা। আগামী বাজেটে এসব বিষয়ে নজর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

কালের কণ্ঠ: সরকারি নীতিনির্ধারকদের অনেকেই বিভিন্ন বৈঠকে করপোরেট করহার কমানোর কথা বলেছেন। এসব উদ্যোগে বিনিয়োগ বাড়বে বলে মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: করপোরেট করহার কমানোর একটি উদ্যোগ শোনা যাচ্ছে। করপোরেট করহার একবারে বেশি পরিমাণে কমানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। পর্যায়ক্রমে কমাতে হবে। এ হিসাবে আগামী অর্থবছরে কিছুটা হ্রাস করা যেতে পারে। আমি মনে করি না, করপোরেট করহার কমানো হলে বিনিয়োগ বাড়বে।

কালের কণ্ঠ: অর্থনীতিতে গতি আনতে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে স্বস্তি আনতে আগামী বাজেটে কোন কোন খাতে বেশি বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন?

মোস্তাফিজুর রহমান: বাজেটে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে গুরুত্ব দিয়ে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে নজর দিতে হবে। এ জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণে পদক্ষেপ নিতে হবে। কারিগরি শিক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে প্রণোদনামূলক বরাদ্দ রাখতে হবে। ভর্তুকি ও প্রণোদনা কাঠামো অর্থনীতির গতিধারার সঙ্গে সমন্বয় করে নতুনভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি খাতের সম্ভাবনা, রফতানির ক্ষেত্রে বাজার ও পণ্য বহুমুখীকরণে অগ্রাধিকার দিয়ে বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

কালের কণ্ঠ: করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানোর দাবি সত্ত্বেও এনবিআর তা বাড়ানোর পক্ষে নয়। আপনি কী মনে করেন?

মোস্তাফিজুর রহমান: জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে। এর সঙ্গে সমন্বয় করে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ানো হলে সাধারণ মানুষের জীবনে খানিকটা স্বস্তি আসবে। সবচেয়ে কম স্ল্যাবের কিছু মানুষ রাজস্বসীমার বাইরে চলে গেলে এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অনেক বড় মাপের করদাতাদের রাজস্ব ফাঁকি বন্ধ করতে সক্ষম হলে করমুক্ত আয়সীমা বাড়ালে যে অর্থ কম আদায় হবে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি এনবিআরের কোষাগারে জমা হবে।

কালের কণ্ঠ: আগামী বাজেটে সঞ্চয়পত্রের ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যুক্তিযুক্ত?

মোস্তাফিজুর রহমান: অনেক সময় বলা হয়ে থাকে সঞ্চয়পত্র কেনার সুবিধা সাধারণ জনগণ ভোগ করছে। এ বিষয়ে আমি ভিন্ন মত পোষণ করি, প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ সময় সঞ্চয়পত্র ধনীরা নামে-বেনামে কিনে সুবিধা নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্রের হার নতুনভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে।

কালের কণ্ঠ: দেশি শিল্পের সেফগার্ড হিসেবে রাজস্ব বাজেটে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়। চলতি ও বিগত বাজেটে ঢালাওভাবে অনেক পণ্যে সম্পূরক শুল্ক কমানো ও প্রত্যাহার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী বাজেটে আপনার সুপারিশ কী?

মোস্তাফিজুর রহমান: দেশি শিল্পের বিকাশে গুরুত্ব দিতে গিয়ে এবারের বাজেটে সম্পূরক শুল্ক যৌক্তিককরণের চেষ্টা করা হবে বলে ধারণা করছি। তা যেন বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও শিল্পের উন্নয়ন কৌশলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয় সেই দিকটি বিবেচনায় রাখতে হবে।

কালের কণ্ঠ: সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

মোস্তাফিজুর রহমান: কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।

৪ জুন ২০১৮
কালের কণ্ঠ

কর ফাঁকি বন্ধে জিরো টলারেন্স জরুরি

মোস্তাফিজুর রহমান

অর্থনীতি-বিষয়ক থিঙ্ক ট্যাংক সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, কর ফাঁকি বন্ধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জিরো টলারেন্স নীতিতে অবিচল থাকতে হবে। ব্যক্তি হোক কিংবা করপোরেট প্রতিষ্ঠান হোক, কর ফাঁকিবাজ যেই হোক তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। গত রবিবার ভোরের কাগজের সঙ্গে আলাপচারিতায় এসব কথা বলেন তিনি।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, কর নীতিতে সংস্কার আনা হয়েছে। তবে এর সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। রাজস্ব আয়ের অন্যতম উইং কাস্টমসে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাস্টমস আইন প্রণয়নের কথা থাকলেও তা পিছিয়ে গেছে, এ ছাড়া ভ্যাট আইন এই অর্থবছরে হচ্ছে না। সুতরাং রাজস্ব আদায় বাড়াতে ব্যক্তি করদাতা থেকে করপোরেট করের ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে হবে।

এই অর্থনীতিবিদ বলেন, বরাবরের মতো এবারও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এই অর্থ তো করদাতাদের অর্থ। এতে করদাতাদের উপর করের বোঝা বেড়ে যাবে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। ননপারফরমিং লোন আদায়ের ক্ষেত্রে জোর দেওয়া। তবে আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে ক্ষতিকে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে। অহরহ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ডিপোজিট ও হাইরিস্ক লোনের একটি আইন তৈরি করেছে। দেশের প্রেক্ষাপটে আইনের বাস্তবায়ন খুবই কম। অথচ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত ডিপোজিট এবং হাইরিস্ক লোনের ক্ষেত্রে যেসব কড়াকড়ি করা প্রয়োজন তা নেই। এসব অনিয়ম বন্ধে দুর্নীতি দমন

কমিশনের (দুদক) জোরালো কোনো পদক্ষেপ দেখছি না আমরা। বছরের পর বছর ধরে তা চলে আসছে, যা অর্থনীতির জন্য রং সিগন্যাল।

সিপিডি'র এই সম্মাননীয় ফেলো আরো বলেন, প্রকল্প নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভালোভাবে ফিজিবিলিটি স্টাডি হয় না। প্রকল্পের বিভিন্ন ফেজে এসে অর্থ ছাড়ের বিষয়ে একটি জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল থাকে। এতে নির্দিষ্ট সময়ে একদিকে যেমন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয় না, অন্যদিকে বাড়ে প্রকল্প ব্যয় এবং সময়। এতে সরকারের অর্থেও অপচয় হয়। বছরের পর বছর এসব সংস্কৃতি চলে আসছে। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বাজেট বাস্তবায়নের হার ক্রমশ কমে আসছে। বাজেট বাস্তবায়ন মানসম্মত হতে হবে। বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আইন সংস্কার করা হয়েছে, তবে এসব আইনের বাস্তবায়ন নেই। এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে মামলার জট খুলতে হবে। বিশাল অঙ্কের রাজস্ব এর সঙ্গে জড়িত। দ্রুত সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে। করের আওতা বাড়াতে হবে। নতুন নতুন খাতকে করের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আর কর আদায়ের ক্ষেত্রে মনোযোগ বাড়াতে হবে এবং যথাযথ আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

৫ জুন ২০১৮
ভোরের কাগজ

বাজেট বাস্তবায়ন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

মোস্তাফিজুর রহমান

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা না বাড়ালে বাজেট বাস্তবায়নের হার ক্রমশ কমবে। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ উল্লেখ নেই। এই অবস্থায় বাজেট বাস্তবায়নের বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে সক্ষমতা। প্রস্তাবিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট প্রতিক্রিয়ায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরের কাগজকে তিনি এ কথা বলেন।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ব্যাংকিং খাতে ঢালাওভাবে আড়াই শতাংশ কর্পোরেট কর কমানো ঠিক হয়নি। পারফরমেন্সের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা উচিত ছিল। এ ছাড়া সরকার ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বিশাল অঙ্কের ঋণ নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এটি বিবেচনায় নেওয়া উচিত। যাতে ব্যাংক ও সঞ্চয়পত্রে চাপ সৃষ্টি না হয়। এ ছাড়া ব্যাংকিং কাঠামোতে যে পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে তা কতটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব এ নিয়েও আশঙ্কা রয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা প্রতিবছর গতানুগতিক আয়-ব্যয়ের প্রাক্কলন করি। সঠিকভাবে আমরা তা বাস্তবায়ন করতে পারছি না। প্রায় প্রতিবারই এর বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে যায়। প্রস্তাবিত বাজেটে চালের আমদানিকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। চাল আমদানিতে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ও ৩ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ শুল্ক আরোপ আরো আগেই করা প্রয়োজন ছিল। এতে আমদানি কমবে এবং কৃষকরা ধানের ন্যায্য দাম পাবে। এটি বাজেটের ভালো দিক।

তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন দেশে উৎপাদিত মোটরসাইকেল রেফ্রিজারেটরসহ দেশীয় শিল্পে কর রেয়াত দেওয়া হয়েছে। এতে ভোক্তার উপকার হবে। এ ছাড়া বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এতে দেশীয় উৎপাদনকারীরা লাভবান হবে। সেই সঙ্গে কমবে এসব পণ্যের দাম।

মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, স্বল্প আয়ের মানুষরা সাধারণত ছোট আকারের ফ্ল্যাট ক্রয় করেন। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ছোট ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে কর দেড় শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। যারা ছোট ফ্ল্যাট কিনবেন তারা কেন বেশি দেবেন। তবে গতানুগতিক ধারার এই বাজেটে প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়ানো। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে ইউনেস্কো বলছে, এসব খাতে বিনিয়োগ জিডিপি'র ৪ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। আমাদের এই বিষয়গুলো আরো ভালোভাবে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৮ জুন ২০১৮
ভোরের কাগজ

অধ্যায় ৪

স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি)

বাংলাদেশের নতুন সক্ষমতা ও ঋণের বিকল্প উৎস

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

উন্নয়নশীল কিংবা স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে। চুলচেরা বিশ্লেষণে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কতটা ওপরে কিংবা কিছুটা নিচে - সেটি নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু বাংলাদেশ একটি বিকাশমান অর্থনীতির দেশ - সেটি নিয়ে দেশ-বিদেশে সংশয় কম। সঙ্গত কারণেই আমাদের অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের চাহিদা বাড়ছে। অন্যথায় প্রবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যাবে না। একই সঙ্গে এটিও বলা যায়, নতুন নতুন অবকাঠামো প্রবৃদ্ধির উচ্চহার বজায় রাখায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। শুধু তাই নয়; এ ধরনের সুবিধা প্রবৃদ্ধির হার আরও একটু বাড়িয়ে নেওয়ার সহায়ক।

অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের জন্য দেশীয় সূত্রের অর্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। পদ্মা সেতুর মতো সুবৃহৎ প্রকল্প এখন দেশের রাজস্ব আয় থেকে পাওয়া অর্থ নিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে বাস্তবতা এই যে, যোগাযোগ, জ্বালানি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবকাঠামো নির্মাণে বিভিন্ন দেশ ও বহুপক্ষীয় সংস্থার আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এসব খাতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ বহু বছর বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মতো উৎসের উপর নির্ভর করেছে। জাপানসহ আরও কয়েকটি দেশ থেকেও মিলেছে ঋণ। এসব ঋণের সুদের হার কম। পরিশোধের মেয়াদ দীর্ঘ। আমরা এসব উৎসকে সনাতনী উৎস হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

তবে নতুন বাস্তবতা হচ্ছে, একদিকে আমাদের বড় বড় অবকাঠামোর চাহিদা বাড়ছে, পাশাপাশি সনাতনী উৎসের বাইরে উন্নয়নশীল বিশ্বেই নতুন নতুন দেশের কাছ থেকে ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এই বিকল্প উৎস আমরা এখন কাজে লাগাতে পারি।

ভারত, চীন ও রাশিয়ার ঋণের প্রস্তাবকে এ দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। এসব দেশের অর্থনীতি নতুন শক্তি সঞ্চয় করেছে। ফলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পাশে তারা ঋণ নিয়ে এগিয়ে আসছে। এটি তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রমাণ।

উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ঋণদানের জন্য প্রায় সাত দশক ধরে কাজ করছে বিশ্বব্যাংক। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকেও এ অঞ্চলের দেশগুলোর ঋণ মেলে। এসব সংস্থার তহবিলের জোগান আসে প্রধানত উন্নত দেশগুলো থেকে। এ কারণে পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাদের প্রভাব থাকে। যেমন, বিশ্বব্যাংকের প্রধান কে হবেন, সেটি ঠিক করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। সাম্প্রতিক সময়ে এআইআইবি ও ব্রিক্স নামে দু'টি ব্যাংকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। প্রথমটির পেছনে মূল শক্তি চীন ও ভারত; দ্বিতীয়টি গঠিত হয়েছে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার উদ্যোগে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কাজ করলে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা কিছুটা হলেও বদলে যেতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোর জন্য এর ফলে বিকল্প উৎস তৈরি হয়েছে। ঋণের শর্ত নিয়ে তারা দর কষাকষি করতে পারবে।

ঋণদাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর কাছে বাংলাদেশ এখন দু'টি কারণে আকর্ষণীয়। এক, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে; ঋণ প্রদানের মতো অনেক খাত রয়েছে এবং বড় অঙ্কের অর্থ দেশটি কাজে লাগাতে পারে। দুই, বাংলাদেশের ঋণ ও সুদ পরিশোধের ভালো ট্র্যাক রেকর্ড। সাড়ে চার দশকের ইতিহাসে এ দেশটি কোনো দেশ কিংবা বহুপক্ষীয় সংস্থার ঋণের কিস্তি বা সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হয়নি। বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও মুনাফা প্রত্যাহারে কখনও সমস্যায় পড়েনি। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ সন্তোষজনক। ঋণদাতারা এসব বিবেচনায় নেয়।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে বড় অঙ্কের ঋণ চুক্তি সই করেছে চীন, রাশিয়া, জাপান ও ভারত। এসব দেশের অর্থনীতি এখন যথেষ্ট শক্তিশালী। কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকেও বাংলাদেশের ঋণপ্রাপ্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তারা বাংলাদেশ সরকারের বন্ড আন্তর্জাতিক বাজারে ছাড়তেও আগ্রহ দেখাচ্ছে। সম্প্রতি ভারতের সঙ্গে তিনটি চুক্তি সই হয়েছে। সর্বশেষ সই হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, তারা বাংলাদেশকে দেবে সাড়ে চারশ কোটি ডলার, বাংলাদেশের মুদ্রায় যা প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকা। ভারত এ পর্যন্ত কোনো দেশকে এত বড় অঙ্কের ঋণ প্রদানের জন্য চুক্তি সই করেনি। এ চুক্তি সম্পাদনের জন্য ভারতের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ঢাকায় এসেছিলেন। এ ঋণ চুক্তিতে নতুন কিছু অবকাঠামো যুক্ত হয়েছে, সনাতনী উৎসগুলো

যেখানে অনাগ্রহ দেখায়। রেল খাতে ভারতের ঋণ আগেও ছিল। এর আওতা ক্রমশ বাড়ছে। দুই দেশের বাণিজ্য বাড়াতে এ ধরনের প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ। তারা দেশের নদ-নদী ও আন্তর্জাতিক নৌপথের উন্নয়নেও ঋণ প্রদান করছে। চট্টগ্রামে ড্রাইডক এবং পায়রা ও মংলা বন্দরের উন্নয়ন, বুড়িগঙ্গা নদীর সংস্কার, বিভিন্ন নদ-নদীর ড্রেজিং - এসব ক্ষেত্রও চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর বাইরে আছে মানবসম্পদ উন্নয়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প ও তথ্যপ্রযুক্তি। বলা যায়, ভৌত অবকাঠামোর বাইরে এখন সফ্ট অবকাঠামো খাতেও বিদেশি ঋণ মিলছে।

ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত ঋণ চুক্তিতে সুদের হার তুলনামূলক বেশি। বিশ্বব্যাংক যেখানে ০.৭৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেয়, সেখানে ভারতের ঋণের জন্য ১ শতাংশ হারে সুদ দিতে হবে। সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে ০.৫০ শতাংশ হারে বাড়তি সুদ প্রদানের গ্যারান্টি ধারাও যুক্ত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক ঋণ পরিশোধের জন্য ৪০ বছর সময় দেয়। গ্রেস পিরিয়ড মেলে ১০ বছর। ভারতের ক্ষেত্রে এ সময় ২০ ও ৫ বছর। ঋণের অর্থে কেনা পণ্যের বেশিরভাগ ভারত থেকে কিনতে হবে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক দর নির্ধারণ। ভারত থেকে যে দামে রেলগাড়ির ওয়াগন বা ইঞ্জিন কেনা হবে, তার চেয়ে কম দামে অন্য দেশ থেকে একই মানের পণ্য মিললে প্রশ্ন উঠবেই। এই ঋণের ব্যবহার বিষয়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করেছে দুই দেশ। আমরা আশা করব, ভারত থেকে কেনা পণ্যের দামসহ অন্য যেসব প্রশ্ন উঠবে, তা নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপে নেবে এ কমিটি।

ভারত ছাড়াও চীন ও রাশিয়া থেকে বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রকল্পে বড় অঙ্কের ঋণ গ্রহণ করছে। এ ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক দরের প্রশ্নটি জড়িত। ঋণদাতা দেশ তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখবে - সেটিই স্বাভাবিক। একইভাবে ঋণ গ্রহীতা দেশকেও ভাবতে হবে, ঋণ যেন বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়। আমাদের সুদসহ ঋণ পরিশোধ করতে হবে। একই সঙ্গে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে সেটি যেন সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটায়, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে - এসব গুরুত্বপূর্ণ। ঋণের সঙ্গে লিখিত শর্ত থাকে। এর কিছুটা প্রকাশ পায়। একই সঙ্গে জনমনে এমন ধারণা রয়েছে, ঋণের সব শর্ত সরকার প্রকাশ করে না। এটি সব ঋণদাতা দেশ ও সংস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা এ নিয়ে কাজ করতে পারেন। বাংলাদেশ প্রচলিত উৎসের ঋণের বাইরে চীন, রাশিয়া ও ভারত থেকে বড় অঙ্কের অর্থ ঋণ হিসেবে পাচ্ছে - এটি ভালো দিক। ঋণের উৎস একাধিক হলে দর কষাকষির সুযোগ থাকে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ঋণ চুক্তিতে

যেন স্বচ্ছতা থাকে। ঋণ গ্রহণ করছে সরকার। কিন্তু তার দায়ভার বহন করতে হয় জনগণকে। সঙ্গত কারণেই জনগণের প্রত্যাশা থাকে তাদের অর্থ কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, সেটি সময়মতো জানার।

ভারতের কাছ থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ মিলছে। এটি অর্থনীতির জন্য সুখবর। ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ে ছাড় হবে, এটিই কাম্য। এর আগে দেওয়া ৩০০ কোটি ডলারের লাইন অব ক্রেডিটের সিংহভাগ এখনও অব্যবহৃত - সেটি মনে রেখে পদক্ষেপ নেওয়া চাই। আমাদের প্রতিবেশী এ দেশটির সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক বহুমুখী। তবে উদ্বেগের বিষয় বাণিজ্য ঘাটতি। বছরে এ ঘাটতির পরিমাণ ৫৫০ কোটি ডলারের মতো। পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতির পাশাপাশি রয়েছে সেবা খাতে অদৃশ্য বাণিজ্য, যার সুফল ভারতই বেশি ভোগ করে। প্রতি বছর প্রায় ১৪ লাখ বাংলাদেশি পর্যটন, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারতে যায়। তারা সেখানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় বিভিন্ন প্রকল্প ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। তাদের সবাই বৈধ অনুমতি গ্রহণ করে - সেটি বলা যায় না। তারা কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক পায়, তা দেশে পাঠায়। কেউ পাঠায় ব্যাংকিং চ্যানেলে, কেউ বা অননুমোদিত চ্যানেলে। আরও আছে অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্য। ভারত থেকে নানা পথে প্রচুর পণ্য বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করে। এ জন্য বাংলাদেশ সরকার কোনো শুল্ক-কর পায় না। আমদানি বাণিজ্যের হিসাবেও এ অর্থ যুক্ত হয় না। কিন্তু ভারতের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যমূল্য ঠিকই পেয়ে যায়। ভারতের রফতানি আয়ের তালিকায় এ ধরনের বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থও যুক্ত হওয়া উচিত।

এটি ঠিক যে, ভারতের সঙ্গে যে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি, সেটি আমাদের দেশে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ করে পূরণ করা যাবে না। বাংলাদেশের রফতানিযোগ্য পণ্য খুব বেশি নয়। তবে এর মধ্যেও ভারতে আমাদের রফতানি বাড়ানো সম্ভব। দেখা গেছে, ভারত বিশ্ববাজার থেকে এমন সব পণ্য কেনে, যা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতামূলক দামে সেখানে রফতানি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে আমরা প্লাস্টিক পণ্যের কথা বলতে পারি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভারত ১ হাজার ১৬০ কোটি ডলারের প্লাস্টিক পণ্য আমদানি করেছে। বাংলাদেশ এ পণ্যের জোগান দিতে পারে। ভারতীয় উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের শিল্প খাতে বিনিয়োগ করে উৎপাদিত পণ্যও নিজ দেশে রফতানি করতে পারেন। শ্রীলংকায় ভারতীয়রা রাবার শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। সেখানে উৎপাদিত টায়ার কিনে নিচ্ছে ভারত। বাংলাদেশ ভারত ও অন্যান্য দেশের কাছে এ ধরনের বিনিয়োগ চায়। ভারতের জন্য বাংলাদেশে বিশেষ রফতানি জোন বরাদ্দ রয়েছে। সেখানে কী ধরনের শিল্প স্থাপিত হবে, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক পণ্য ও সেবা চাহিদা অবশ্যই

বিবেচনায় থাকা চাই। একইভাবে ভারতেও বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি হতে হবে।

আঞ্চলিকভাবেও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ একাধিক আঞ্চলিক জোটের সদস্য। এ অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সঙ্গে মোটরযান চলাচলের চুক্তি রয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে বাস্তব অগ্রগতি কম। বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে ভারতকেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে।

ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য প্রবেশে অশুল্ক বাধা বহুল আলোচিত। আমাদের পাটের উপর তারা অ্যান্টি ডাম্পিং শুল্ক আরোপ করেছে। এর ফলে পণ্যের রফতানি নিরুৎসাহিত হচ্ছে। এ ধরনের নেতিবাচক পদক্ষেপ কেবল অর্থনৈতিক সম্পর্কে বিরূপ প্রভাবই ফেলে না, রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমরা ভারতের সঙ্গে বহুপক্ষীয় সম্পর্ক চাই এবং তা যেন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়ায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের এমনভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, যা উভয়ের জন্য উইন উইন হবে। এ ধরনের উদ্যোগ ব্যবহার করে বাংলাদেশ অন্য দেশ থেকেও বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করতে পারে, সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

০৮ অক্টোবর ২০১৭
সমকাল

‘মসৃণ রূপান্তর’-এর জন্য এখন যা করণীয়

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) শ্রেণি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ হবে সমসাময়িক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার একটি অনন্য সাফল্য। অনাকাঙ্ক্ষিত বড় ধরনের বাধা না এলে ২০২৪ সাল নাগাদ বাংলাদেশ এলডিসি তালিকা থেকে বেরিয়ে আসবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। এ ক্ষেত্রে এলডিসি পর্যায় থেকে যেসব দেশের উত্তরণ ঘটেছে এবং যেসব দেশ উত্তরণ পর্যায়ে আছে তাদের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয়। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ এলডিসি শ্রেণি প্রতিষ্ঠা করে। এ পর্যন্ত ৫২টি দেশ এ শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বতসোয়ানা, কেপ ভার্দে, মালদ্বীপ, সামোয়া ও ইকুইটোরিয়াল গিনি - এই ৫টি দেশ এলডিসি তালিকা থেকে বের হয়েছে। প্রত্যেকটি দেশের জনসংখ্যা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। তাদের অর্থনীতির আকারও ছোট। বতসোয়ানা ভূমিবেষ্টিত একটি ছোট দেশ। ইকুইটোরিয়াল গিনিও তেল রফতানিকারক ছোট দেশ। বাকি তিনটি মূলত ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র। এই বিবেচনায় বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা, অর্থনীতির আকার, রফতানির পরিমাণ ও দারিদ্র্য বিমোচন বিবেচনায় বাংলাদেশই প্রথম বড় দেশ, যা এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণ হতে যাচ্ছে। আবার বাংলাদেশই স্বল্পোন্নত প্রথম দেশগুলোর একটি, যা উত্তরণের তিনটি মানদণ্ডই (মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক) পূরণ করতে যাচ্ছে।

২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ১০টি দেশ এলডিসি তালিকা থেকে বের হবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে ইকুইটোরিয়াল গিনি ২০১৭ সালে বের হয়েছে। অ্যাঙ্গোলা ও ভানুয়াতুকে উত্তরণের সুপারিশ করা হয়েছে। কিরবিতি, পূর্ব তিমুর ও টুভালু সুপারিশের জন্য পর্যালোচনাধীন। ভুটান, নেপাল, সাও তোমে ও প্রিনসিপে, এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ২০১৫ সালে প্রথমবার উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচিত হয়েছে। এসব

দেশ বিশেষত নেপাল ও ভুটানের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন নির্দেশকের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনা এ ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিমূলক হতে পারে।

সহযাত্রীদের সঙ্গে তুলনা

গত পাঁচ বছর ধরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সহযাত্রী দেশগুলোর চেয়ে বেশি। এলডিসিগুলোর মধ্যে মোট বিদেশি উন্নয়ন সহায়তার দিক থেকে অন্যতম বড় গ্রহীতা হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতি বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা তুলনামূলক কম। এশিয়াতে যারা এলডিসি থেকে বের হওয়ার প্রক্রিয়ায় আছে তাদের তুলনায় বাংলাদেশের সহায়তা-নির্ভরতা কমছে। ফলে এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে উন্নয়ন সহায়তা কমার সম্ভাব্য প্রভাব বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যৎসামান্য। আবার পরিমাণ বিচারে বাংলাদেশ অন্যতম রেমিট্যান্স গ্রহীতা। জিডিপিতে রেমিট্যান্সের অবদান বিবেচনায় বাংলাদেশ নেপালের চেয়ে পিছিয়ে। তবে, অন্যান্য সহযাত্রীর তুলনায় এগিয়ে। অন্যদিকে এসব দেশের অধিকাংশের তুলনায় বাংলাদেশের বিদেশি বিনিয়োগ প্রবাহ কম। বিশ্বের সর্বনিম্ন কর-জিডিপি অনুপাতের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গড় কর-জিডিপি অনুপাত ছিল মাত্র ৮ শতাংশ। এ সময়ে ভুটানে এ হার ১১ শতাংশ, নেপালে ১২ শতাংশ, আফ্রিকান এলডিসিগুলোর ১৫ শতাংশ এবং দ্বীপ রাষ্ট্রগুলোর ৩৯ শতাংশ।

অর্থনীতিতে মোট মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থানে অবদান বিবেচনায় বাংলাদেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবস্থা অন্যদের তুলনায় শক্তিশালী। ২০০৫-০৯ এবং ২০১০-১৪ সময়কালে নেপালে মোট মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানে উৎপাদন ও সেবা খাতের অবদান কমে গেছে। তেল রফতানিকারক আফ্রিকান সহযাত্রীদেরও ম্যানুফ্যাকচারিং ও সেবা খাতের অবস্থা দুর্বল। তবে বাংলাদেশ শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা সহযাত্রীদের তুলনায় পিছিয়ে এবং অন্যদের তুলনায় এ বিষয়ে অগ্রগতিও কম। রফতানি বহুমুখীকরণে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। এলডিসি তালিকা থেকে বের হলে বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা হারাবে। এ জন্য বাংলাদেশের জন্য রফতানি বহুমুখীকরণ অপরিহার্য।

পূর্বসূরিদের সঙ্গে তুলনা

বাংলাদেশের গত ৫ বছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি কেপ ভার্দের উত্তরণপূর্ব অবস্থার মতো। তবে বতসোয়ানা ও মালদ্বীপের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি ছিল। বাংলাদেশ অবশ্য

চলতি হিসাব ও পণ্য রফতানিতে অন্যদের চেয়ে ভালো অবস্থায় রয়েছে। পিছিয়ে আছে বিদেশি বিনিয়োগ ও কর আহরণে। কাঠামোগত রূপান্তরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বতসোয়ানা ছাড়া বাকিদের উত্তরণের পরে অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানে কৃষির অবদান কমে যায়। যদিও অবদান কমছে, তারপরও অন্যান্য সাবেক এলডিসির উত্তরণ-পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষিনির্ভরতা তুলনামূলক বেশি। এর বিপরীতে মূল্য সংযোজন ও কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদানের দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে। আবার বিশ্ববাণিজ্যে রফতানির অংশ বিবেচনায় পূর্বসূরিদের উত্তরণ-পূর্ববর্তী এমনকি পরবর্তী অবস্থার চেয়েও বাংলাদেশের অবস্থা ভালো। কাঠামোগত পরিবর্তনে বাংলাদেশের তুলনামূলক ভালো অবস্থা থেকে অনুধাবন করা যায়, এলডিসি উত্তরণ কোনো দেশের কাঠামোগত রূপান্তর নিশ্চিত করে না।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা

সাবেক এলডিসিগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে উত্তরণের আগে ও পরের পর্যায়ের ভালো চর্চাগুলো বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে। এলডিসি থেকে উত্তরণের আগে বতসোয়ানা রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৫০ শতাংশে উন্নীত করে। কেপ ভার্দে ১৯৮০ থেকে ২০১০ সময়কালে জাতীয় পরিকল্পনা ও রাজস্ব আহরণে ব্যাপক উন্নতি করে। দেশটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিনিয়োগ করে। মালদ্বীপ বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে সমর্থ হয়। বতসোয়ানা উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার অনুযায়ী বৈদেশিক সহায়তার কার্যকর ব্যবহার করে। দেশটি সুশাসন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং প্রাজ্ঞ নীতির মাধ্যমে জ্বালানি সম্পদকে দেশের উন্নয়নে কাজে লাগায়। মালদ্বীপ সেবা খাত বিশেষত পর্যটন খাতের দিকে ঝুঁকে অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনে। সামোয়া কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং সেবা খাতে উচ্চমূল্য সংযোজনে যেতে সমর্থ হয়।

বাংলাদেশকে এসব দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে। প্রথমত, সুশাসন নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন ও রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করতে হবে। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। উচ্চমূল্য সংযোজন হয় এমন শিল্পের দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার করতে হবে।

উত্তরণ-পরবর্তী করণীয়

এলডিসি তালিকা থেকে উত্তরণের পর একটি মসৃণ রূপান্তরের জন্য বাংলাদেশকে বেশ কিছু দিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাজেট ঘাটতি ও চলতি হিসাবে ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বতসোয়ানার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। দেশটি সাফল্যের সঙ্গে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত বজায় রাখতে সমর্থ হয়। উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সক্রিয় আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রেও বতসোয়ানার উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বতসোয়ানা তার বৈদেশিক ঋণ জাতীয় আয়ের ১৫-১৭ শতাংশে নামিয়ে আনে। বিকল্প অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা ও নমনীয় ঋণ পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যেমন, উত্তরণের পর সামোয়া সরকার ননি জুস ও অন্যান্য কৃষিপণ্যে ২০১৭ সাল পর্যন্ত চীনে শূন্য শুল্কে রফতানি করতে সমর্থ হয়। কেপ ভার্দে ২০০৬ সালে রূপান্তর সহায়তা গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাড়তি দু'বছর ইউরোপিয়ান বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে সমর্থ হয়। মালদ্বীপ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার ইআইএফ অর্থায়ন কাঠামো থেকে বাড়তি দু'বছর সহায়তা পায়। বাংলাদেশকে রেগুলেটরি কাঠামো শক্তিশালী করার বিষয়েও গুরুত্ব দিতে হবে।

১৭ মার্চ ২০১৮
সমকাল

বিশ্বে বাংলাদেশের নতুন পরিচয়, নতুন দিগন্ত
জাতিসংঘের স্বীকৃতি

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

বাংলাদেশের জন্য একটি আনন্দের উপলক্ষ এসেছে। দীর্ঘদিনের অপেক্ষার অবসান ঘটেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হয়ে আসার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)। তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হয়ে আসার সব শর্ত পূরণ করেছে। কয়েক দিক থেকে এ বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এখন আর বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত ৪৭ দেশের তালিকায় নেই। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ হচ্ছে এমন একটি দেশ, যার জিডিপি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় থাকা সব দেশের জিডিপির ১৯ শতাংশ, বাণিজ্যের ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ এবং লোকসংখ্যা ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। এ ধরনের একটি দেশের এই উত্তরণ বৈশ্বিকভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আরও একটি বিষয় মনে রাখা চাই, বাংলাদেশ এমন একটি দেশ, যারা উত্তরণের সব শর্ত পূরণ করে তালিকা থেকে বের হচ্ছে - মাথাপিছু জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ও মানবসম্পদ সূচক। একই সঙ্গে লাওস এবং মিয়ানমারও এ তালিকা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে বলে সিডিপি জানিয়েছে।

আমাদের এই উত্তরণ অবশ্যই জাতীয় মর্যাদার বিষয়। বিশ্বে আমরা বহুকাল দরিদ্র দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছি। এভাবেই আমাদের পরিচয়। এখন তা থেকে বের হয়ে যাচ্ছি। স্বভাবতই সমকাতারের দেশগুলোর সঙ্গে আমাদের নতুন সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতদিন যেসব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশকে সহযোগী দেশ হিসেবে বিবেচনা করেনি; বিনিয়োগ করতে দ্বিধা করেছে, তারা বাংলাদেশের নতুন পরিচয়ের কারণে নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা ভাববে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তিতে

পরিবর্তন আনবে। ঝুঁকির যে রেটিং তাদের পরিবর্তন আসবে। বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাববে। ঋণপ্রাপ্তির জন্য সহজে বিবেচনা পাবে। এতদিন আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ছিলাম। অনেক বিনিয়োগকারী দেশ ও সংস্থা বিনিয়োগে ঝুঁকি বোধ করত। বাণিজ্যিক ঋণপ্রাপ্তিতেও সমস্যা দেখা যেত। নতুন পরিচয় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

তবে মনে রাখতে হবে, আনুষ্ঠানিক উত্তরণের ঘোষণা আসবে ২০২৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে। আগামী ছয়টি বছর সেখানে আমাদের বর্তমান পরিচয় বহাল থাকবে। আমাদের আগে যে চারটি দেশের স্বল্পোন্নত পরিচয় থেকে উত্তরণ ঘটেছে, তাদের অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আমাদের মনে রাখতে হবে। সিপিডি'র গবেষণায় দেখা গেছে, ওইসব দেশের সামগ্রিকভাবে জাতীয় আয়, ঋণপ্রাপ্তির শতকরা পরিমাণ, রেমিট্যান্সের পরিমাণ প্রভৃতি সূচক উত্তরণের আগের তুলনায় পরের সময়ে শ্লথ হয়েছে কিংবা কমে গেছে। মোদ্দা কথা, পরবর্তী সময়ে কতক ক্ষেত্রে এক ধরনের চাপে পড়েছে তারা। আমরা মালদ্বীপ, ভানুয়াতু, কেপ ভার্দে ও বতসোয়ানার কথা বলতে পারি। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের উত্তরণ মসৃণ হবে না। তবে মনে রাখতে হবে, ওইসব দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় পার্থক্য রয়েছে। আর সেখানেই বাংলাদেশের শক্তি নিহিত। ওই চারটি দেশ আয়তনে ছোট, তারা দ্বীপরাষ্ট্র, ভূ-পরিবেষ্টিত, স্বল্প পণ্যের উপর প্রবল নির্ভরতা, আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে দুর্বল সম্পর্ক রয়েছে। এসব সীমাবদ্ধতা নিয়েই তাদের উত্তরণ ঘটেছিল। সে তুলনায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আকার ও বিস্তৃতি যথেষ্ট। কমবেশি ভারসাম্যও রয়েছে। তবে রফতানি পণ্যে প্রধানত তৈরি পোশাকের উপর রয়েছে ব্যাপক নির্ভরতা। কৃষিতে শস্য উৎপাদন ভালো। তবে সব সম্ভাবনা কাজে লাগানো যাচ্ছে না। উন্নয়নশীল দেশের সারিতে দৃঢ় অবস্থান করে নিতে এসব ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি।

বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে বাজার সুবিধা। শুল্কমুক্ত সুবিধার বাজারের কারণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, চীন, জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে আমাদের রফতানি বেড়েছে। এ কারণে নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে। রফতানি বাণিজ্যে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হচ্ছে। দারিদ্র্য হ্রাস পাচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হলে শুল্কমুক্ত সুবিধা কমবে বা থাকবে না। উদাহরণ হিসেবে আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কথা বলতে পারি। সেখানে অস্ত্র ছাড়া সবকিছু আমরা বিনা শুল্কে রফতানি করতে পারি। ওই অঞ্চলে রয়েছে আমাদের বড় বাজার - মোট রফতানির ৬২ শতাংশ। স্বল্পোন্নত দেশ না থাকলে নতুন শর্তে সুবিধা পেতে হবে, যাকে বলা হয় জিএসপি কিংবা জিএসপি

প্লাস। এ জন্য আমাদের নতুন করে আবেদন করতে হবে। তারা হয়তো সীমিত সংখ্যক পণ্যে সুবিধা দেবে। তার জন্যও কয়েকটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন পূরণে বাধ্যবাধকতা থাকবে, যেমন শ্রম-সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন, পরিবেশ মানদণ্ড-সংক্রান্ত কনভেনশন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ও ইনটেলেকচুয়াল কনভেনশন, দুর্নীতি দমন কনভেনশন। এটি নিশ্চিত, এখনকার মতো শর্তহীন বাজার সুবিধা ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকবে না। ভারত, কানাডা প্রভৃতি দেশেও সমস্যা হবে।

দ্বিতীয়ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওষুধ। বাংলাদেশ ব্যতিক্রমী স্বল্পোন্নত দেশের সারিতে থাকা দেশ, যার রয়েছে শক্তিশালী ওষুধ শিল্প খাত। আমরা জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে সক্ষম। কিন্তু এ জন্য মূল কোম্পানিকে রয়্যালটি দিতে হয় না। ফলে উৎপাদন ব্যয় কম থাকে, দেশের বাজারে দামও সঙ্গত কারণে কম পড়ে। এই ইনটেলেকচুয়াল সুবিধা ২০৩৩ সাল পর্যন্ত বহাল থাকার কথা। কিন্তু ২০২৪ সালে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উত্তরণ ঘটলে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে মূল কোম্পানিকে রয়্যালটি দেওয়ার প্রশ্ন আসবে। এর প্রভাব পড়বে উৎপাদন ব্যয়ে। দেশ-বিদেশের বাজারেও দেখা যাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা তীব্র হবে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে ঋণপ্রাপ্তি। স্বল্পোন্নত দেশ হওয়ার কারণে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান থেকে ১ শতাংশেরও কম সুদে আমরা ঋণ পাই। এর পরিশোধের মেয়াদ ৪০ বছর, আরও আছে ১০ বছর গ্রেস। বাণিজ্যিক সুদের হার বেশি, কখনও কখনও ৩-৫ শতাংশ, গ্রেস থাকে না, পরিশোধের মেয়াদ হয়ে থাকে অর্ধেক। ফলে ঋণের সুদের হারজনিত দায়-দেনা বাড়ার কথা। এনজিও খাতের জন্যও সমস্যা হবে। অনেক নিম্ন-আয়ের লোক থাকায় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্থা থেকে সহায়তা মেলে। গবেষণা, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ফি কম বা মওকুফ, বিভিন্ন সংস্থার বার্ষিক চাঁদা - এসব সুবিধা নতুন প্রেক্ষাপটে বর্তমানের মতো থাকার কথা নয়। মোট কথা, উত্তরণ পর্বটি মসৃণ হবে না। এ কারণে বাধাগুলোকে এখন থেকেই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। এ জন্য চাই দীর্ঘমেয়াদি কৌশল প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন।

প্রথমেই নজর দিতে হবে বাজার সুবিধার প্রতি। বাজার সুবিধা যেন অব্যাহত থাকে, সে জন্য অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে। কানাডা, জাপান, ভারত, চীন - এসব দেশ থাকবে নজরে। দ্বিতীয় হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রধান পণ্যে জিএসপি ও জিএসপি প্লাস সুবিধা চাই। রফতানি বহুমুখী করতে হলে এটি গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি দ্বিপক্ষীয় পর্যায়ে এফটিএ উদ্যোগ নিতে হবে। ইতিমধ্যে

শ্রীলংকার সঙ্গে এ ধরনের উদ্যোগ রয়েছে। মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও একই ধরনের উদ্যোগ চাই। চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সমন্বিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। স্বল্প হার সুদে ঋণ সুবিধা পেতে সমস্যা হলে মিশ্র হারের কথা ভাবতে হবে। এর ফলে সুদজনিত ব্যয় কম রাখা সম্ভব হবে। পাশাপাশি খুঁজতে হবে নতুন ঋণের উৎস। এশিয়ান অবকাঠামো ব্যাংক, ব্রিকস ব্যাংক ও অন্যান্য সংস্থার প্রতি আমাদের মনোযোগ বাড়াতে হবে।

বিনিয়োগ সম্প্রসারণও গুরুত্বপূর্ণ। দেশি ও বিদেশি সব ধরনের বিনিয়োগ আমাদের বাড়াতে হবে। নতুন যে প্রতিযোগিতায় পড়তে হবে, তার মোকাবেলায় এর বিকল্প নেই। কৃষি, শিল্প, মানবসম্পদ - সব ক্ষেত্রে চাই আরও বিনিয়োগ। আমাদের বড় সমস্যা হচ্ছে নিম্ন উৎপাদনশীলতা। সামগ্রিক অর্থনীতিতে এ সমস্যা আছে, বিভিন্ন খাতেও আছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যে নতুন ধরনের প্রতিযোগিতায় পড়তে হবে, তাতে টিকতে হলে এ নিয়ে এখনই ভাবতে হবে। দক্ষতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। তরুণ ও নারী শ্রমিকদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

অর্থনীতির বহুমুখীকরণও গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে শুধু শস্যের উপর নির্ভরতা নয়। সবজি, ফল, মাছ, গবাদি পশু; যেসব খাত থেকে বেশি আয়ের সুযোগ রয়েছে সেগুলোর প্রতি বাড়তি নজর দিতে হবে। কৃষিভিত্তিক শিল্পও গুরুত্বপূর্ণ। ওষুধ, ইলেকট্রনিক্স, চামড়া, জাহাজ প্রভৃতি শিল্প খাতের সম্ভাবনা যথেষ্ট। রফতানি বহুমুখী করতে হলে আমাদের বাজারের পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের প্রতিও নজর দিতে হবে। যেসব উদ্যোক্তা নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন করছেন কিংবা একক পণ্যের জন্য বাজার সুবিধা সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। বলা যায়, শুধু খাতভিত্তিক নয়; ব্যক্তিভিত্তিক পরিকল্পনাও থাকা চাই।

এনজিও খাতও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে সামাজিক খাতের উন্নয়নে অনেক সংস্থা এতদিন ভালো ভূমিকা রেখেছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ ঘটলে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আফ্রিকার যেসব দেশে দারিদ্র্য বেশি সেখানে চলে যেতে চাইবে। যেহেতু এ খাতে আন্তর্জাতিক সহায়তা কমবে তাই ট্রাস্ট তহবিল গঠনের কথা ভাবতে হবে।

সরকার ইতিমধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে, যারা উত্তরণ পর্যায়ের যাবতীয় কাজ মনিটর করবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেবে। এ কমিটিতে

উদ্যোক্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবা যায়। আমরা চাই স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ যতটা সম্ভব মসৃণ হোক এবং এ জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করতে হবে।

১৮ মার্চ ২০১৮
সমকাল

আমাদের উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে হবে

রেহমান সোবহান
দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

মঙ্গলবার ডিবিসি টেলিভিশনের রাজকাহন অনুষ্ঠানে খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে বাংলাদেশের সামনে কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এখানে ঈষৎ সংক্ষিপ্ত আকারে তা প্রকাশ হলো। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন নবনীতা চৌধুরী।

ডিবিসি: সব ঠিক থাকলে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল হওয়ার পথে রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলো কী? বাংলাদেশেরই-বা সে প্রস্তুতি রয়েছে কি না?

রেহমান সোবহান: প্রথমত, এটি টেকনিক্যাল ব্যাপার। এখানে একসাইটেড হওয়ার খুব প্রয়োজন নেই। বাংলাদেশের একটি টার্গেট থাকতে হবে। এখানে কেবল আয়ের (মাথাপিছু) ব্যাপার থাকবে না। আমাদের ট্রান্সফরমেশন ইকোনমি নিয়ে আসতে হবে। দেশি-বিদেশি নতুন বিনিয়োগ নিয়ে আসতে হবে। দেশীয় বিনিয়োগ কিছু হচ্ছে; কিন্তু সেগুলো খুব নির্দিষ্ট (খাতে) হয়ে যাচ্ছে, যেমন গার্মেন্ট শিল্প। আমাদের যেহেতু উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে যেতে হবে, সেহেতু বিনিয়োগের প্রসারণ দরকার। যেমন করেছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, চীন। এখন ভিয়েতনাম এ পথে যাচ্ছে। মূল বিষয়টি হলো অর্থনীতির বৈচিত্র্যকরণ। সে প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি শুরু হয়নি। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষণের ব্যাপার যে, সীমিত বৈদেশিক বিনিয়োগ কেন আসছে। এখানে সুশাসনের কথা প্রথমেই আসবে। তারপর ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যথাযথ প্রকল্প সম্পাদন ইত্যাদি।

ডিবিসি: সেগুলোর সঙ্গে তো বিনিয়োগের সম্পর্ক রয়েছে। মানে প্রকল্পে দক্ষতা বাড়ানো...

রেহমান সোবহান: হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। এখন তো প্রকল্পে অত্যধিক খরচ করতে হয়। দেশে একটি রাস্তা তৈরি করতে খরচ বেশি হচ্ছে। আমরা যদি সর্বাধিক সুফল পেতে চাই, সেখানে দক্ষতার কোনো বিকল্প নেই। আমরা ইনভেস্টমেন্টের দিকে যাচ্ছি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে বটে; কিন্তু সেখানেও আমাদের রিসোর্সেস ও ইফিসিয়েন্সি বড় চ্যালেঞ্জ।

ডিবিসি: সিপিডি বলছে, সরকারকে নানা ধরনের স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে বসে কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। আসলে সমন্বিত কৌশলটা কী? আমরা তো শুনি, কোন বছর কত বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, কত বিনিয়োগ আসবে - সে পরিসংখ্যান সরকার তো দিচ্ছে। এখানে নতুন কৌশলের প্রয়োজন কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশলের প্রয়োজন পড়ে নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য। আমরা যদি স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে বের হই, নতুন পরিস্থিতির বিষয়ে বিবেচনা থেকেই নতুন কৌশলের কথা এসেছে। তার সঙ্গে বিদ্যমান কৌশল সামঞ্জস্য কি না সেটিও বিবেচনা করে দেখতে হবে। আপনি উপস্থাপনায় মধ্যম আয়ের দেশের কথা বলেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। আসলে আমাদের দেশ ২০১৫ সালেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়ে গেছে। আমাদের অনেক মন্ত্রী-এমপি বলেন, ২০২১ সালে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবো - এটি ভ্রান্ত কথা। আসলে ২০২১ আমাদের মনের ভেতরে সুদৃঢ়ভাবে গেঁথে গেছে। তার আগেও যে আমরা করে ফেলতে পারি, এটি বোধ হয় তাদের বিবেচনায় নেই। আবার অনেকে বলেন, স্বল্পোন্নত থেকে আমরা ২০২১ সালে বেরোব - এটিও ঠিক নয়। স্বল্পোন্নত থেকে আমরা ২০২৪ সালে বেরোব। যা হোক, নতুন পরিস্থিতিটা কী। প্রথম কথা হলো, এটি থেকে বেরোলে আমাদের লাভটা কী হবে? লাভ হবে, বাংলাদেশ যে একটি বিকাশমান অর্থনীতি এবং সেটি যে তুলনীয় দেশের তুলনায় দ্রুততর হচ্ছে, সেখানে একটি আস্থার জায়গা সৃষ্টি হবে। ফলে বিদেশি যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায়, তাদের জন্য এটি ইতিবাচক সার্টিফিকেট বা আস্থার জায়গা সৃষ্টি হলো। এখন কথা হলো, এটাকে কীভাবে ব্যবহার করে আমরা বাস্তবে সুফল নিয়ে আসব। একটি দিক যে, হয়তো এটার ফলে আমরা শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারাব। যদি তা হারাই, সে ক্ষেত্রে রেহমান সোবহান যেটি বলেছেন, একটিমাত্র পণ্যের উপর যে আমরা নির্ভরশীল - তাহলে

পণ্যের বহুবিধকরণ লাগবে। বাজারের এক্সপানশন লাগবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার বা অন্য কোনো নতুন বাজারে প্রবেশের বিষয় আসবে। চীনের বাজারে বড়ভাবে যাওয়া, ভারতের বাজারে বড়ভাবে যাওয়ার বিষয় আসবে। যেমন ইউরোপীয় ইউনিয়ন জিএসটি প্লাস। আমাদের প্লাসের ভেতরে ঢুকতে হলে আরও কিছু কাজ করতে হবে। আমাদের শ্রমিকের অধিকার দিতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের আগের চেয়েও অনেক বেশি সচেতন ও সৎ হতে হবে।

ডিবিসি: বাজার সুবিধা তো আমরা ২০২৪ পর্যন্ত পাব...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০২৪ নয়, ২০২৭ সাল পর্যন্ত। সে পর্যন্ত আমাদের বড় ধরনের ধাক্কা না-ও হতে পারে। আরেকটি বিষয় হলো, এখন আমরা যেভাবে অনুদান পাই, যেটা ফেরত দিতে হয় না। আমরা কীভাবে ঋণ পাই, সেটা দেখতে হবে। তখন আমাদের বিকল্প খুঁজতে হবে। চীন যেমন এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের বাইরে অবকাঠামোগত ব্যাংক তৈরি করেছে, সেখান থেকে কীভাবে ঋণ আনা যায়।

ডিবিসি: আমি রেহমান সোবহানের কাছে যাই। আপনাদের আলোচনাতে বারবার এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, অনেকেই এ সার্টিফিকেট পেয়েছে, এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছে। তারপর আর এগোতে পারেনি। সে বিপদটা কোন কোন দেশে হয়েছে এবং আটকে যাওয়ার বিপদগুলো কী?

রেহমান সোবহান: আটকে যাওয়ার অনেক বিষয় আছে। যারা এ অবস্থা পার হয়ে গেছে, তাদের দেখা দরকার। যেমন ভিয়েতনাম। তারা ডাইভারসিফাইড হয়েছে। এখন বাংলাদেশ তো ভাবছে, আমাদের ব্যাপক পরিচিতি আছে। রফতানি হচ্ছে, উন্নয়ন হচ্ছে। কিন্তু ভিয়েতনাম জনসংখ্যায় ছোট, জিডিপিতে ছোট। তাদের এক্সপোর্ট এখন দুইশ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এটি কেন হয়েছে? কারণ তারা বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে গেছে। এমনকি তাদেরও পোশাক শিল্প রয়েছে। তারা দশ জায়গায় কম্পিট করছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি করছে। ট্রাম্পের নীতি তাদের কোনো বাধা হয় কি না সেটি দেখতে হবে। মূল বিষয় হলো, তারা ম্যানেজ করেছে। আমাদের চ্যালেঞ্জ এখানেই চলে আসে। এখন তো আমাদের হাতে প্রায় দশ বছর আছে। এই সময়ের মধ্যে কেমন করে একটি পলিসি নিতে হবে, কেমন করে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে - তা নিয়ে ভাবতে হবে।

ডিবিসি: আপনারা বলছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা ইউনিক। এখানে ছোট দেশে অনেক জনসংখ্যা, আমাদের চ্যালেঞ্জও অন্যরকম...

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: হ্যাঁ, আমাদের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন, এর প্রকাশ ও মাত্রায় ভিন্নতা রয়েছে। কেন এ প্রশ্নটি থেকে যাচ্ছে বারবার যে, আমরা স্বল্পোন্নত থেকে বেরোচ্ছি; কিন্তু উল্লাস না করে সতর্কতা কেন। যদিও আমরা একটি সার্টিফিকেট পাচ্ছি; কিন্তু অর্থনীতির বিচারে সেটি যে খুব শক্তিশালী সূচক, তা নয়। যেটি রেহমান সোবহানও বলেছেন। শক্তিশালী সূচক হলো, যদি অর্থনীতির ভেতরে উৎপাদনশীল খাতের প্রভাবটা বাড়ে। আপনার প্রক্রিয়াকরণ খাত ছোট, অবকাঠামোর সমস্যা রয়েছে, কৃষি শিল্পায়িত হয়নি। কম বিনিয়োগে অধিক উৎপাদনশীলতার বিষয়টিতে তেমন মনোযোগ নেই। যাতে তারা কম শ্রমে বেশি মজুরি পায়। আমরা বলি, স্বল্পোন্নত থেকে বের হওয়াটাই ফিনিশিং লাইন নয় বরং এটি একটি মাইলফলক। ফিনিশিং লাইনে পৌঁছাতে হলে আপনার অর্থনীতির রূপান্তর ঘটাতে হবে। সেই রূপান্তর ঘটানো ও চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা - এগুলো একসঙ্গে করার জন্য কৌশল প্রয়োজন। বাংলাদেশে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আছে। কিন্তু এ পরিকল্পনা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার টার্গেট নিয়ে করা হয়নি। এর মধ্যে আসছে এসডিজি। এগুলো কোনটা বৈশ্বিক পরিকল্পনার সঙ্গে যায়, কোনটাকে অগ্রাধিকার দেব - সে নীতিমালা নেই। আমরা সে গতিশীলতা তৈরি করতে পারব কি না সে কথাই বলা হচ্ছে। আমরা উল্লাস করছি ঠিক, উল্লাসের সঙ্গে আমাদের যে দায়িত্ব এসে পড়েছে, সে ব্যাপারে সচেতনতা নেই।

ডিবিসি: এই যে মধ্যম আয়, নিম্ন-মধ্যম আয়, উন্নত, উন্নয়নশীল ও নানা সূচক ইত্যাদি পরিভাষায় বাস্তব উন্নয়নের চিত্র উঠে আসে কি না?

রেহমান সোবহান: দেখা গেল কোনো দেশ শুধু পর্যটনের উপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে গেল। কিংবা একটি দেশে ডায়মন্ড থেকেই ৫০ শতাংশ জিডিপি আসছে। ভুটান ইলেকট্রিক দ্রব্য দিয়ে এগোচ্ছে। বাংলাদেশ যেখানে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের ছোট্ট টি-শার্ট ও তার ডাইভারসিটি যেখানে বিশ্বকে মাত করছে, সেখানে দেশটির নিশ্চয়ই আরও সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের গ্রামের নারী শহরে এসে ফ্যাক্টরিতে কাজ করছে, সেখানেও তো শ্রমের একটি রূপান্তর হচ্ছে। তার শ্রম দিয়েই যে আমরা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছি, সেটি আমাদের বুঝতে হবে। উদ্যোক্তারা আছে। আবার কেবল বড় ফ্যাক্টরিই নয়, ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, শহরে-গ্রামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঙালিরা কাজ করছে, যেটি অনেক দেশের নেই। আমাদের এত মেধা আছে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যার কথা আসছে। আসলে জনসংখ্যা আমাদের শক্তি।

যে দেশে ১৬ কোটি মানুষ আছে, সেটি তো একটি বাজার। এই বাজার এক্সপানশনের বিষয় আছে। যদি আমি বুঝতে পারি, এই প্রোডাক্টের প্রয়োজন আছে, সে প্রোডাক্ট উৎপাদনের বিষয় আছে। বাজার বাড়বে, আয় বাড়বে। আমার মনে আছে, প্রায় ২০ বছর আগে দক্ষিণ কোরিয়া ছিলাম। ওই সময় একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেছিলেন, ভবিষ্যতে শক্তিশালী দেশ হবে চীন। কারণ তার বড় বাজার আছে। আমার জনসংখ্যা বেশি, সে জন্য জনসংখ্যা রফতানির বিষয় আছে। যখন বিশ্বে সমস্যা দেখা দেয়, তখন আমরাও সমস্যাগ্রস্ত হই। কিন্তু চীনের অভ্যন্তরীণ বাজার আছে, ভোক্তা আছে, তার তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু এমনিতেই জনসংখ্যা সম্পদ হবে না।

ডিবিসি: তাহলে বছরের পর বছর ধরে যা নিয়ে কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা কি এ রকম যে, অবকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, গ্যাস দেব, বিদ্যুৎ দেব, বিনিয়োগ হবে, তারপর উন্নয়ন হবে - ব্যাপারটা কি সে রকম?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলে কোনো সূচকই কিন্তু বাস্তবতাকে ধরতে পারে না, ধারণ করে না। একেকটা সূচকের একেক ধরনের গুণাবলি রয়েছে। যেমন ধরুন - আমরা বলছি, আমাদের উত্তরণ হবে; কিন্তু এখানে তো বৈষম্যের হিসাব নেই। দেশে যে আয়বৈষম্য বাড়ছে, সেটার হিসাব এর ভেতর নেই। যিনি বৈষম্যের শিকার তিনি হয়তো বলবেন, কই - আমি তো কিছু পেলাম না। আবার এর মধ্যে জিনিসপত্রের দামের হিসাব নেই। আমরা যে উত্তরণের কথা বলছি, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ বলবে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, কিসের উত্তরণ হচ্ছে? এ জন্য অর্থনীতিবিদরা এক হাতে কথা বলেন না। দুই হাতে কথা বলেন।

ডিবিসি: একজন দর্শক বলছেন, রফতানির কথা বেশি না ভেবে যদি আমরা আমদানি পণ্য দেশে উৎপাদন করি?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: খুবই সুন্দর কথা, এটি নিঃসন্দেহে ভালো। আরেকটি কথা, অবকাঠামো খাতে বিদেশি বিনিয়োগ থাকলেও বড় কলকারখানায় উৎপাদনশীল খাতে তা কম। যেসব দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়েছে, তাদের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ। প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কারও নীতিকথায় আসে না। তারা দেশের স্থিতিশীলতা দেখে, একটি দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ দেখতে চায়, সুশাসন দেখতে চায়, মানবাধিকার দেখতে চায়, গণতান্ত্রিক স্থায়িত্ব দেখতে চায়।

ডিবিসি: ড. রেহমান সোবহান, আপনাদের সিপিডি'র আলোচনায় বলেছেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুশাসন কিংবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুশাসন - এই বিষয়গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন টেকসই করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর সঙ্গে দর্শকদের সম্পূরক প্রশ্ন, দুর্নীতি, ব্যাংক লুট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অনিয়ম ইত্যাদির মধ্যেও দেশ কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে?

রেহমান সোবহান: আসলে আমাদের দেশে প্রত্যেকটি ব্যক্তি কাজ করে, এ জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। এটি আমার শক্তিশালী বাংলাদেশের একটি সুবিধা। আমাদের উদ্যোক্তা, শ্রমিক, নারী, ক্ষুদ্রঋণ, তারপর প্রবাসী সবাই তো কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের আশপাশে যা হচ্ছে, মানে অনিয়ম ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

ডিবিসি: আপনি বলেছেন - কোরিয়া, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। তারা যে খুব গণতান্ত্রিক তা তো নয়। তাহলে এখানে গণতন্ত্র এত প্রয়োজন কেন?

রেহমান সোবহান: না, এখানে দুই ক্যাটাগরির দেশ। চীন ও ভিয়েতনামের অন্য ইতিহাস। তাদের ওয়ান পার্টি স্টেট। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক সমস্যা আছে, তারপরও একটি বিষয় রয়েছে, তারা সবকিছু একটি ডিসিপ্লিনে রাখতে পারছে। কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় এখন গণতন্ত্র শক্তিশালী। তার চেয়ে বড় কথা, এসব দেশে আইনের শাসন। তাদের ইতিহাস একরকম। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাস তো অন্য। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু তো গণতন্ত্রের জন্যই লাইম-লাইটে ছিলেন। আমাদের ডিএনএর মধ্যে রয়েছে গণতন্ত্র। এই ডিএনএর মধ্যে অন্য দেশের একটি প্রক্রিয়া এখানে চলবে না। তাতে আরও নানা রকম সংকট দেখা দেবে।

ডিবিসি: ড. দেবপ্রিয়, আপনি অর্থনীতিকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন। বাংলাদেশের সুশাসন, রাজনীতি ইত্যাদিও ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন কি না?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আমি একটু আগের প্রশ্নে আসি। এত দুর্নীতি, এত স্বজনপ্রীতি, মেধার প্রতি বৈষম্য, লুটপাট ইত্যাদি যদি না থাকত, তাহলে চিন্তা করেন আমরা কোথায় চলে যেতাম? তাহলে আমরা ৫-৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি করছি, আরও হয়তো ২ শতাংশ অর্জন সম্ভব ছিল কিংবা আজ যেটি করছি, সেটি ১০ বছরের আগেই করতে পারতাম। আরেকটি বিষয় হলো - এগুলো যেসব দেশে ঘটে, সেখানে যেভাবে উদ্যোক্তা শ্রেণিরা এগোয় বা সাধারণ মানুষ এগোয়, সেটি তারা এক ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা করে এগোয়। একে ইংরেজিতে বলে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট। এর মাধ্যমে সে একটি জিনিস অর্জন

করে, দুইটা ছেড়ে দেয়। কোন জিনিসটা ছেড়ে দেব, তা সে নির্দিষ্ট করে। হয়তো সে বাকস্বাধীনতা ছেড়ে দিচ্ছে, ছেলেমেয়ের শিক্ষা নিচ্ছে। কিন্তু একটা সময় আসতে পারে, যখন সে দেখবে, সে যে গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা চাচ্ছে; তার বাকস্বাধীনতা নেই বলে সে মান পাচ্ছে না। তখন কিন্তু সামাজিক সমঝোতা না হয়ে গণবিস্ফোরণ হয়। এটিই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইতিহাস। বাংলাদেশে আপনি পেছনে ফিরে দেখেন, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস তো এটিই, একাত্তর কিংবা ঊনসত্তরের ইতিহাসও এটি।

ডিবিসি: আপনারা কেবল ব্যক্তি উদ্যোগের কথা বললেন। রাজনৈতিক উদ্যোগও তো আছে। যেমন এ সরকারের ভিশন ২০২১। তারা এর মধ্যে অনেক কিছু অর্জন করতে চায়। এ রকম রাজনৈতিক উদ্যোগ ব্যক্তি উদ্যোগের প্রেরণা কি না?

রেহমান সোবহান: বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ভিশনারি, সেটি ঠিক আছে। কিন্তু সে ভিশন পূর্ণ করতে সব জায়গায়ই সায় লাগে। ভিশনই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে দল, প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনৈতিক অবস্থা সবকিছুতেই সে ভিশনের বাস্তবায়নের বিষয় থাকতে হবে। আমাদের অভাব এখানেই।

ডিবিসি: রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সরকারের ধারাবাহিকতা কি না? বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে তো অনেক কিছুই বদলে যায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা মানেই একই সরকার নয়। একই সরকার নির্বাচিত হয়ে এলেও সে নতুন সরকার তৈরি করে। স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন - এগুলো এখন একসূত্রে গ্রথিত। যদি এগুলো না থাকে, তাহলে আরও বেশি অসুবিধা হচ্ছে। বিশ্ব এখন অনেক বেশি বৈরী হয়ে যাচ্ছে। ওই বৈরিতা আটকাতে হলে দেশের ভেতর স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক সমঝোতা যাতে না ভেঙে পড়ে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ।

১৫ মার্চ ২০১৮
সমকাল

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন দক্ষতা

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এলডিসি তালিকা থেকে বের হওয়া মানে দরিদ্র বা গরিব দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া। দরিদ্র দেশ হিসেবে আমাদের আর কেউ দুর্বল ভাববে না। এটি যে কোনো দেশের জন্য গৌরবের বিষয়, গর্বের বিষয়, মর্যাদার বিষয়। ২০২৪ সালে আমরা উন্নত দেশে পরিণত হব। সেই হিসেবে আরো ৬ বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে, যেগুলো খুবই দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। এর মধ্যে প্রথম এবং প্রধান কাজ হবে সম্পদের প্রবাহ বাড়ানো। এ ছাড়া আয়কর বৃদ্ধির দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। পাশাপাশি বৈদেশিক সাহায্য কমানোর দিকে নজর দিতে হবে।

আফ্রিকার মতো দেশ উন্নয়নের গতিপথে থাকার পরও বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও আঞ্চলিক সংকটের কারণে পিছিয়ে পড়েছে। এ জন্য বাংলাদেশে আরো শিল্পায়ন হতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে, কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। আর এটি করতে হলে শ্রমঘন আরো শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বাড়াতে হবে। এ জন্য রাজস্ব আহরণের গতি বাড়ানো ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সুশাসন, সমাজের বৈষম্য দূরীকরণ জরুরি।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর যেসব ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হবে তা হলো, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণে সুদের হার বেড়ে যাবে। গ্রেস পিরিয়ড কমে আসবে অথবা থাকবে না। আবার ঋণের টাকা ফেরত

দেওয়ার সময়ও কম ধরা হবে। এতে বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত ব্যয় বাড়বে। রফতানি বাজার কিছুটা সংকুচিত হয়ে যাবে। সব ধরনের শুল্ক সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া রফতানি বাজারে নতুন নতুন শর্ত যুক্ত হতে পারে। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য আগেই পরিকল্পনা করতে হবে।

১৮ মার্চ ২০১৮
ভোরের কাগজ

উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা সুবিধাও পাব

তৌফিকুল ইসলাম খান

আলোকিত বাংলাদেশ: বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের প্রাথমিক স্বীকৃতি পেল। এটি আমাদের জন্য অবশ্যই একটি আনন্দ সংবাদ। কিন্তু এই অর্জনের ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু সুবিধা হারাতে হতে পারে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি?

তৌফিকুল ইসলাম খান: বাংলাদেশ এ মাসেই প্রথমবারের মতো উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্ত পূরণ করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় থাকায় এতদিন আমরা আন্তর্জাতিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করছিলাম। যেমন – এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো থেকে পণ্য ও সেবা রফতানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সুবিধা সব ধরনের পণ্যের জন্যই প্রযোজ্য। যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশ থেকে আমরা প্রায় সবধরনের পণ্যের জন্যই শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা পেয়ে থাকি। এটি পাওয়ার কারণ আমরা স্বল্পোন্নত দেশ। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ১৯৭৬ সাল থেকে বাংলাদেশকে জিএসপি কার্যক্রমের আওতায় পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিয়ে আসছে। একই ভাবে আমরা কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া থেকেও অনুরূপ সুবিধা পেয়ে থাকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে জিএসপি সুবিধা দেয় না ঠিকই; কিন্তু অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশকে এ সুবিধা দিচ্ছে। অন্যদিকে আমরা যদি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটেও দেখি, তাহলে দেখব, সার্কের ভেতরে আমরা ভারতের যে বাণিজ্য সুবিধা পাই, তা-ও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবেই পাচ্ছি। এমনকি চীন থেকে আমরা যে বাণিজ্য সুবিধা পাই, তা-ও স্বল্পোন্নত

দেশ হিসেবেই পাচ্ছি। আমরা যখন স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাব, তখন এসব বাণিজ্যিক সুবিধা থাকবে না। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা মেধাস্বত্ব আইনে কিছু সুবিধা বা ছাড় পেয়ে থাকি। এই সুবিধার সবচেয়ে বড় উপকারভোগী হচ্ছে আমাদের বিকাশমান ওষুধশিল্প। মেধাস্বত্ব আইনে ওষুধশিল্পের লাইসেন্স বাধ্যবাধকতার যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা থেকে আমরা অনেকটাই ছাড় পাচ্ছি। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে গেলে এক্ষেত্রে আমাদের বেশকিছু সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে। জলবায়ুর অভিঘাত থেকে রক্ষার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা পেয়ে থাকি। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। তুলনামূলক কম সুদে আমরা ঋণ পাই। জাতিসংঘের পর্যালোচনা অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উপযোগী বিবেচিত হলে আমরা এসব সুবিধা হারাব। কোনো নতুন বড় ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি না হলে আমরা ২০২৪ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। তবে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে যেসব সুবিধা পাচ্ছিলাম, তা ২০২৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কিন্তু তার পর থেকে আমরা এসব সুবিধা আর পাব না।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যেসব সুবিধা আমরা পাচ্ছিলাম, তা প্রত্যাহৃত হলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে আমাদের প্রায় ৬ দশমিক ৭ শতাংশ শুল্ক দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে আমাদের পণ্য প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হবে। তাতে সেখানে পণ্য রপ্তানির উপর কিছুটা হলেও বিরূপ প্রভাব পড়বে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠে যাওয়ার ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস পেতে পারে। এটি আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধের দাম কম রাখতে পারছি। কারণ বাইরে থেকে আমাদের লাইসেন্স কিনতে হয় না। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের কাতারে চলে গেলে আমাদের ওষুধের লাইসেন্স বাইরে থেকে কিনতে হবে। ফলে স্থানীয়ভাবে সবধরনের ওষুধের দাম বৃদ্ধি পাবে। একইভাবে আইটি সেক্টরে আমরা যে ছাড় পাই, তা আর পাব না। বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে যে অগ্রাধিকার আমরা এখন পাই, তা থাকবে না। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা কিছু সুবিধাও পাব। স্বল্পোন্নত দেশের কাতার থেকে আমরা যখন বেরিয়ে যাব, তখন আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আমরা বর্তমানে বিভিন্ন উৎস থেকে তুলনামূলক সহজ শর্তে ঋণ পাচ্ছি, আগামীতে তা না পেলেও অন্যান্য উৎস থেকে ঋণ পাওয়া যাবে। সেই সুযোগগুলো আমাদের যথার্থ ব্যবহার করতে হবে।

জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করার পর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জিএসপি+ নামে একটি নতুন বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করবে। জিএসপি+ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বেশকিছু জটিল শর্ত পূরণ করতে হবে। বাংলাদেশ কি সেই শর্ত পূরণে সমর্থ হবে?

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তারা জিএসপি+ সুবিধা প্রদান করবেই এমন কোনো কথা নেই। তারা জিএসপি+ সুবিধা দিতে পারে। এই সুবিধা পাওয়ার জন্য আমাদের আবেদন করতে হবে। জিএসপি+ সুবিধা পাওয়ার জন্য বেশকিছু জটিল শর্ত পূরণ করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে বর্তমানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, তাতে আমাদের জিএসপি+ সুবিধা পাওয়া সহজ হবে না। জিএসপি সুবিধা পুরোপুরি প্রত্যাহার করার জন্য যে ৯-১০ বছর সময় দেওয়া হবে, তার মধ্যে আমাদের সেসব শর্ত পালনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। আমাদের রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণের দরকার আছে। রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণ ছাড়া আগামীতে বিশ্ববাণিজ্যে টিকে থাকা খুবই কঠিন হবে। কিন্তু রফতানি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরেই গুটিকয়েক পণ্য এবং সামান্য কিছু দেশ বা অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল। যদিও আমরা অনেক দিন ধরেই রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণের কথা বলে আসছি; কিন্তু এ ব্যাপারে অগ্রগতি সামান্য। এ ছাড়াও আমাদের দেশের বিদ্যমান শ্রম আইন আধুনিকায়ন করে আন্তর্জাতিক মানের করতে হবে। শিল্প-কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়ন করতে হবে। সার্বিকভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের যে অভাব পরিলক্ষিত হয়, তা নিরসন করতে হবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জিএসপি+ সুবিধা পেতে আমাদের কী কী কাজ করতে হবে, তার তালিকা আমাদের জানা আছে। কিন্তু এগুলো বাস্তবায়ন করা খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে আমরা স্বাক্ষর করেছি। কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়নে আমাদের অগ্রগতি খুব একটা ভালো নয়। আমরা এগুলো বাস্তবায়নে কতটা আন্তরিক, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তি পরিপালনে আমাদের আরও আন্তরিক হতে হবে। আমরা জিএসপি+ সুবিধা পাওয়ার জন্য যখন আবেদন করব, তখন আমাদের নিজেদের মধ্যেও সক্ষমতা তৈরি করতে হবে। এই সক্ষমতা তৈরি করা গেলে আমরা যদি জিএসপি+ সুবিধা না-ও পাই, তাহলেও আমাদের রফতানি আয় বাড়ানো সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ যদি সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা না পায়, তবে উন্নয়ন অর্থায়ন কি দেশজ সম্পদ দিয়ে সম্পদ সরবরাহ করা যাবে?

এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে কর-জিডিপি অনুপাত আছে, তা বিশ্বের মধ্যে খুবই কম। এমনকি আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের

তুলনায় আমাদের কর-জিডিপি অনুপাত কম। ফলে আমাদের দেশের নাগরিকদের যে ধরনের অবকাঠামোগত সুবিধা, সামাজিক সেবা এবং সুরক্ষা যেভাবে দেওয়া উচিত, তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখনও কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারছে না। এসব বিবেচনায় আমাদের কর আহরণের পরিমাণ বাড়ানোটা খুবই জরুরি। করব্যবস্থার আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রস্তাব অনেক দিন ধরেই আলোচিত হচ্ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আমরা কর কাঠামোর সংস্কারের ক্ষেত্রে খুব একটা অগ্রসর হতে পারিনি। শুধু সংশোধিত ভ্যাট আইন নিয়েই আমরা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখনও নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কাস্টমস আইন এবং প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে আমরা তেমন কোনো সাফল্য দেখাতে পারিনি। করব্যবস্থার আইনি সংস্কার খুবই জরুরি। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা তৈরি করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। কর প্রশাসনের নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যেও দীর্ঘদিন বাধা ছিল। আদালতের রায়ে সেই বাধা দূর হয়েছে। কিন্তু কর আদায় প্রক্রিয়াটা এখনও কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। একে স্থানীয় পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে হবে। কর প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করা খুবই দরকার। এখনও উপজেলা পর্যায়ে কর প্রশাসনের উপস্থিতি নেই।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য হলেও কর প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। করের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের এখানে কর আদায় ব্যবস্থা আরও আধুনিকায়ন করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়বে দুর্নীতি তত হ্রাস পাবে। আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমি বিশেষ জোর দেব, তা হলো কর ফাঁকি রোধ করা। আমরা দেখেছি বাণিজ্যের আড়ালে এবং অন্যান্যভাবে কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় ফাঁকি দেওয়া করের পরিমাণ অনেক বেশি। কর ফাঁকি রোধ করার জন্য আইনি সংস্কার করতে হবে। একই সঙ্গে কর আদায় ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কর ফাঁকি রোধ করার জন্য আমাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়াতে হবে। মুদ্রা পাচার এবং কর ফাঁকির বিষয়টি পরস্পর যুক্ত রয়েছে। অবৈধ অর্থের লেনদেনের একটি বড় অংশ হলো কর ফাঁকি দেওয়া। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর ফাঁকি রোধে বাংলাদেশের প্রস্তুতি এবং অংশগ্রহণ খুবই কম। শেষে যে কথাটি আমি বলতে চাই, তা হলো, নতুন নতুন করের ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের বিষয়টি মাথায় রেখে করের হার বাড়াতে হবে। আমাদের দেশে এখনও সম্পত্তির উপর করের হার খুবই কম। দেশে উত্তরাধিকার কর বলে কিছু নেই। বিশ্বের অনেক দেশেই এটি আছে এবং আর্থ-সামাজিক

বৈষম্য রোধের ক্ষেত্রে এটি খুবই কার্যকর। কৃষির উপর দীর্ঘদিন ধরে কর আদায় করা হচ্ছে না। কৃষি খাতে কর ধার্য করার বিষয়টি চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। কর প্রদানে সাধারণ মানুষকে যদি উৎসাহিত করতে হয়, তাহলে করের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে করের অর্থ সদ্ব্যবহার করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করের অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদি সরকারের দক্ষতা এবং সুশাসন না থাকে, তাহলে মানুষ কর প্রদানে আগ্রহী হবে না।

২০১৮ সাল তো জাতীয় নির্বাচনের বছর। এই বছর আমাদের অর্থনীতিতে কী কী নতুন চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে বলে মনে করেন?

এক বছর আগের তুলনায় বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি স্থিতিশীলতার পথে দুর্বলতার মুখোমুখি হচ্ছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে লেনদেন আছে, সেক্ষেত্রে আমরা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি চাপ অনুভব করছি। আমাদের আমদানি ব্যয় যেভাবে বাড়ছে, সেভাবে রফতানি আয় বাড়ছে না। অন্যান্য সূত্র থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আগমনও কমে গেছে। রফতানি আয় এবং রেমিট্যান্স আয়ের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান এখন খুব একটা ভালো নয়। এই চাপ কিছুটা হলেও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের উপরও পড়ছে। বাংলাদেশের স্থানীয় মুদ্রা টাকার মূল্যমান কমে যাচ্ছে। সার্বিকভাবে মূল্যস্ফীতি সরকারি হিসাবে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলেও কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি বেড়ে গেছে। মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষ খুবই কষ্টের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে গরিব মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে। ফলে এই সেক্টর সঠিকভাবে কাজ করছে না। কোনো কোনো ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা যাচ্ছে। ব্যাংকের প্রতি সাধারণ মানুষের একধরনের অনাস্থা প্রত্যক্ষ করছি। এটি ব্যাংকের জন্য আমানত সংগ্রহ কঠিন করে দিচ্ছে। একই সঙ্গে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এ বছর একটি চাপের বছর হবে।

ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি খুবই কম। তারপরও ব্যাংক ব্যবস্থায় তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে। এর কারণ কী?

বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি অনেকটাই আমানতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অনেক দিন ধরেই আমানতের সরবরাহ কম ছিল। ব্যাংক তো শুধু বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন করে না, তারা আরও অনেক ধরনের কাজ করে। সেজন্যও ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা

বৃদ্ধির কারণেও ঋণের চাহিদা বেড়ে যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, যারা বৃহৎ ঋণগ্রহীতা তাদের অনেকের মধ্যেই ঋণ ফেরত দেওয়ার প্রবণতা কম। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অনিয়ম হয়েছে। ফলে প্রদত্ত ঋণ নির্ধারিত সময়ে ফেরত আসছে না। প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের মধ্যে এই প্রবণতা আবদ্ধ ছিল। এখন তা ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যাংকেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোনো কোনো ব্যাংকের শাখাপর্যায়েও এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সার্বিকভাবে ব্যাংকের সুশাসন এখন একধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছে। এই অবস্থা যদি আমরা শক্তভাবে মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে জনমানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে।

আইএমএফ প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরকালে অন্যান্যের মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরের আইনি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছে। এটা কীভাবে দেখছেন?

আইএমএফ প্রতিনিধি দল ব্যাংকিং সেক্টরের খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য জোর দিয়েছে। তারা আরও বলেছে, খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকিং সেক্টরে মালিকানা থেকে শুরু করে পরিচালনা বোর্ড, এমনকি ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আইনি সংস্কার খুবই জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই ব্যাংকিং সেক্টরের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। সিপিডি থেকে আমরা কয়েক বছর ধরেই বলে আসছি, ব্যাংকিং খাতের জন্য একটি দক্ষ এবং কার্যকর কমিশন গঠন করা প্রয়োজন – যারা ব্যাংকিং খাতের সমস্যা খুঁজে বের করে তা সমাধানের উপায় বাতলে দেবে। ব্যাংকিং খাতের নিরপেক্ষভাবে সার্বিক নিরীক্ষা দরকার। এটি না করে আমরা যদি শুধু আইনি সংস্কার করি, তাহলে সেটি সাময়িকভাবে কিছুটা স্বস্তি দিলেও দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হবে না।

ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য একটি কমিশন গঠনের সিপিডি'র বক্তব্য সম্পর্কে কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যাংকারের সঙ্গে এর আগে আমার আলাপ হলে তারা বলেছিলেন, ব্যাংকিং খাতের সমস্যা আমাদের সবারই জানা। কাজেই নতুন করে কমিশন গঠনের অর্থ হচ্ছে সময়ক্ষেপণ করা। এখন কমিশন গঠন নয়, প্রয়োজন অ্যাকশন। আপনি কী বলেন?

ব্যাংকিং সেক্টরের সমস্যাগুলো মোটা দাগে আমরা জানি; কিন্তু সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে আমরা সেভাবে অবহিত নই। কাজেই সমস্যার গভীরতা না জেনে কীভাবে সমাধান

করা হবে? আপনি যদি একজন অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসা করতে চান, তাহলে প্রথমেই জানতে হবে তার সমস্যা কোন পর্যায়ে আছে বা সমস্যার গভীরতা কতটুকু। তারপরই তো চিকিৎসা করবেন। ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য ঠিক একই কথা প্রযোজ্য।

আলোকিত বাংলাদেশ: আপনাকে ধন্যবাদ।

তৌফিকুল ইসলাম খান: আপনাদেরও ধন্যবাদ।

২১ মার্চ ২০১৮
আলোকিত বাংলাদেশ

অধ্যায় ৫

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

এসডিজি, পৃথিবীর রূপান্তর ও নাগরিকের মনোভঙ্গি

আনিস পারভেজ

হিজড়ারা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত, সরকার তাদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছে। ঢাকার ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ বিভাগকে সহায়তা দেওয়ার কথা হয়েছিল। উদ্যোগটি ভালো, এ রকমই হওয়া উচিত। কিন্তু এ উদ্যোগে নাগরিক প্রতিক্রিয়া মোটেই সুখকর নয়। ফেসবুক ও নাগরিকের চা-আড্ডায় এ নিয়ে হাসির বন্যা বয়ে গেছে, তামাশার শিকার হলো সমাজ পরিবর্তনের একটি আবশ্যিক উদ্যোগ। এটি মাত্র একটি উদাহরণ। সমাজে এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে। যেমন, মুচি, সুইপার, জলদাস, চা-শ্রমিক ও অন্যান্য দলিত সম্প্রদায় - যাদের এড়িয়ে চলে অর্থনৈতিক দ্রুত প্রবৃদ্ধির বাংলাদেশের নাগরিকরা। প্রবৃদ্ধি বাড়ছে, বাড়ছে বৈষম্য। এ জন্য সরকারকে এককভাবে দায়ী করলে নাগরিক মনোভঙ্গির অচলায়তনই শক্তিশালী হবে, পৃথিবীতে ন্যায়-অধিকারভিত্তিক রূপান্তর সম্ভব হবে না।

গত শতকের তৃতীয় দশক থেকেই উন্নয়নের তত্ত্ব পশ্চিমা আধুনিকতাকে অনুকরণ করার নির্দেশনা দিয়ে প্রকারান্তরে সমাজকে করেছে ভোগবাদী, রাষ্ট্রের অহমকে দিয়েছে পুষ্টি, আর ব্যক্তিকে ঠেলে দিয়েছে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উন্মাদনায়। ভৌতিক ও অভৌতিক ভোগই লক্ষ্য; তাই ব্যক্তি ও সমাজ চলছে একরৈখিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুশাসনে। সমাজের রূপান্তর একটি কাঠামোগত সমস্যার বদল চায়, যার একটি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আছে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির মনস্তত্ত্ব ক্রীড়নক যেকোনও পরিবর্তনে, দেশের সার্বিক উন্নয়নে তো বটেই। আমাদের দেশের সামন্ত মানসিকতা ও তার সঙ্গে ভোগভিত্তিক বস্তুবাদী উন্নয়নের লাগামছাড়া দৌড়-বৈষম্য কেবলই বাড়াচ্ছে। উন্নয়ন সবার অধিকারে আসছে না, বিপন্ন

মানুষ আরও বিপন্ন হচ্ছে, প্রান্তজনের স্বর হচ্ছে বিলীন; যদিও সংবিধান অনুসারে এ রকম হওয়ার কথা নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৩)-এ স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে সব ব্যাপারে সব নাগরিকের অন্তর্ভুক্তির। কিন্তু এখনও প্রান্তজন প্রান্তেই আছে, তার কাছে উন্নয়নের রাষ্ট্রীয় ডাক গেলেও অধিকতর সুবিধা পাওয়া নাগরিক তাকে কাছে আসতে দিচ্ছে না। সাধারণ চা-খানায়ও দলিতের প্রবেশ নেই। যিনি নগর ও জনপদকে পরিচ্ছন্ন রাখছেন, তাকে থাকতে হয় সবচেয়ে অপরিচ্ছন্ন মানবেতর অবস্থায়।

নাগরিকের মনোভঙ্গি ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক। এর বাইরে যে বৃহৎ সমাজ - জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - তা নিয়ে নাগরিক ভাবিত নয়। তাই জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যা হিসেবে জানলেও, তা নিয়ে আবশ্যিক কর্তব্য পালন থেকে আমরা নিজেদের গুটিয়ে রাখছি। মানুষ তার আপাত সুখের জন্য প্রকৃতিকে বিষিয়ে তুলছে, যা বুমেরাং হয়ে আঘাত করছে মানুষকেই। মানবসৃষ্ট বৈরী জলবায়ু প্রসূত বিপন্নতা উন্নয়নের আর সব অর্জনকে ম্লান করে দেবে। অর্থহীন হবে সব উন্নয়ন প্রচেষ্টা যদি বন্ধু প্রকৃতিকে আমরা শত্রু বানিয়ে ফেলি। তাই জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন বা এসডিজি'র একটি অভীষ্ট জরুরি ভিত্তিতে জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া। ব্যাপারটি অসম্ভব নয়, কিন্তু জটিল। মানবপ্রকৃতির ভেতর লোভ মজ্জাগত, তাই অধিকাংশ নাগরিকই প্রকৃতি বিধ্বংসী ভোগ থেকে ব্যক্তি উদ্যোগে বিরত নাও হতে পারে। প্রয়োজন দায়িত্বশীল পরিমিত ভোগ, যার জন্য নাগরিকের মনোভঙ্গির পরিবর্তন অনস্বীকার্য।

রাষ্ট্র আইন করেছে, কিন্তু সে আইনের প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না নাগরিকের নেতিবাচক মনোভঙ্গির কারণে। এখনই সময় উন্নয়ন আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নাগরিকের নেতিবাচক মনোভঙ্গি বদলানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেওয়ার, তা নইলে এসডিজি'র মূল লক্ষ্য রূপান্তরিত পৃথিবী গড়া সম্ভব হবে না। পৃথিবীর কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরে ন্যায় ও অধিকারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ পিছিয়ে থাকবে না বস্তুগত ও অবস্তুগত উন্নয়ন থেকে। যে জন্য প্রয়োজন বিশ্ব সমাজ, রাষ্ট্র, যাবতীয় বেসরকারি সংস্থা ও নাগরিকের সম্মিলিত উদ্যোগ। সর্বোপরি প্রয়োজন নাগরিকের মনোভঙ্গির পরিবর্তন।

মনোভঙ্গির পরিবর্তন সহজ নয়। এটি সম্ভব করে তুলতে প্রয়োজন সামষ্টিক উদ্যোগ। বিশেষভাবে আবশ্যক সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা। সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠান, যেমন পরিবার, শিক্ষায়তন ও মিডিয়ার সক্রিয় উদ্যোগই কেবল নাগরিকের মনোভঙ্গি পাল্টাতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতিও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে। রাজনৈতিক দলগুলোর কাজ শুধুই ক্ষমতায় যাওয়া নয়, দলের কর্মকাণ্ড অনেকাংশে দলের অনুসারীদের আচরণ ও মনস্তত্ত্বে প্রভাব রাখে। সুনাগরিক গড়ে

তুলতে রাজনৈতিক দলও একটি শক্তিশালী সামাজিকীকরণ প্রতিষ্ঠান। তাই সরকারের পাশাপাশি রাষ্ট্রের সব সংস্থাকেই সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন রূপান্তরিত বিশ্বের অঙ্গীকারকে বাস্তবায়িত করতে।

এ বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে সর্বস্তরের নাগরিক সমাজ সংগঠিত হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্মে। প্ল্যাটফর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এসডিজি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারের পাশাপাশি সক্রিয় ভূমিকা রাখা এবং এ প্রক্রিয়ার জবাবদিহি নিশ্চিত করা। প্ল্যাটফর্মকে জনচেতনায় সম্পৃক্ত করে নাগরিকের মনোভঙ্গি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে 'নাগরিক সম্মেলন ২০১৭: বাংলাদেশে এসডিজি বাস্তবায়ন'। এসডিজি ঘোষণাপত্রে দেওয়া অঙ্গীকার 'কাউকে পেছনে রাখা যাবে না' - এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য। ন্যায় ও অধিকারভিত্তিক পৃথিবীর রূপান্তরে নাগরিককে দায়বদ্ধ করতে এরকম সম্মেলন একটি আবহ তৈরি করতে পারে।

০৬ ডিসেম্বর ২০১৭
বাংলা ট্রিবিউন

বাংলাদেশের উন্নয়ন পথরেখা: ব্যতিক্রমী অর্জনের প্রেক্ষাপটে আগামীর চ্যালেঞ্জ

মোস্তাফিজুর রহমান

সার-সংক্ষেপ: স্বাধীনতা-পরবর্তী উন্নয়ন পথ পরিক্রমায় আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের বেশ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী অর্জন আছে যা যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমাদের গৌরব ও অহংকারের কারণ। এ অর্জন বাংলাদেশকে শক্ত একটি ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছে, জাতিকে করেছে আত্মবিশ্বাসী। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বিবেচিত হওয়া ও নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া - এ দ্বৈত উত্তরণের মধ্যে বাংলাদেশের এসব অর্জনের স্বীকৃতি আছে। কিন্তু আগামীর উন্নয়ন যাত্রাপথকে অতীতের অর্জনের ধারাবাহিকতার সরলরৈখিক সম্প্রসারণ হিসেবে মনে করা হবে ভুল। দারিদ্রের অবসান, ক্ষুধামুক্তি, শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফ্যাক্টর-নির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীলতা-নির্ভর অর্থনীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ কাঠামোগত পরিবর্তন, উন্নয়ন-রাষ্ট্র থেকে উদ্যোক্তা রাষ্ট্রে রূপান্তর - এসব চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবেলা করার উপরই নির্ভর করবে একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীত হবার সামর্থ্য। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-র স্তম্ভগুলোর ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ নিশ্চিত করতে হলে এবং ‘কাউকে পেছনে রাখা যাবে না’ এসডিজি’র এ প্রত্যয়কে কার্যকর রূপ দিতে হলে বাংলাদেশকে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ, শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা, সাশ্রয়ী অবকাঠামো বিনির্মান, ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড আদায়ের লক্ষ্যে দক্ষতা-বৃদ্ধি, মান সম্মত শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও রাজস্ব

প্রণোদনা, ট্র্যাডিশনাল অর্থনীতির বিপরীতে ডিজিটাল ও চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব নির্ভর নতুন অর্থনীতির চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়ন নীতিমালা, আয়-বৈষম্য হ্রাস ও বন্টনের ন্যায্যতা - প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, অগ্রাভিমুখী পরিকল্পনা, ও গুণগতভাবে উন্নত ও দক্ষ বাস্তবায়ন সক্ষমতা।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: দ্বৈত-উত্তরণ, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, কাঠামোগত পরিবর্তন, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা, উদ্যোক্তা-রাষ্ট্র

ধারাবাহিক অর্জনের ব্যতিক্রমী পথ পরিক্রমা

মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের পরবর্তীতে একটি বিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ আজ যে পর্যায়ে এসেছে সেই পথপরিক্রম - যে কোন বিচারেই একটি ব্যতিক্রমী যাত্রাপথ। স্বাধীনতা লাভের পর গত সাড়ে চার দশকে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে যে মাত্রায় ও যে পথে সাফল্য অর্জন করেছে তাকে অনেকেই উন্নয়ন প্যারাডক্স (উন্নয়ন-ধাঁধা) বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্মর্তব্য যে, ১৯৭০'র দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশকে নিয়ে দু'জন স্বনামখ্যাত বিদেশি গবেষক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন যার শিরোনাম ছিল *বাংলাদেশ: দ্য টেস্ট কেইস ফর ডেভেলপমেন্ট*। এই বইয়ের মুখবন্ধে তাঁরা লিখেছিলেন, বইটির শিরোনাম 'এ টেস্ট কেইস'-এর পরিবর্তে 'দ্য টেস্ট কেইস' করার পক্ষে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই রাষ্ট্রটি এত বেশি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতায় জর্জরিত যে যদি এই দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় তবে বিশ্বের অন্য যে কোনো উন্নয়নশীল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। কেউ কেউ বাংলাদেশের অবস্থাকে একটি তলাবিহীন ঝুড়ির সাথে তুলনা করেছিলেন তাও স্মরণ করা যেতে পারে। চলার পথে অনেক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ যে বাস্তবানুগ উন্নয়ন নীতিমালার সহায়তায়, শ্রমজীবী মানুষের অবদানে, ব্যক্তিখাতের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে ও বেসরকারি খাতের কর্মোদ্যোগের সুবাদে আজকের অবস্থায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে তাতে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ এবং নাগরিক হিসেবে আমাদের গর্ব করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা ও কারণ রয়েছে। যারা 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও আশঙ্কা, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছিলেন, ইতিহাস তাদেরকে ভুল প্রমাণ করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা, এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এমডিজি) বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অর্জনের প্রতিফলন ঘটেছে সাম্প্রতিক সময়ের দু'টি উন্নয়ন মাইলফলকে: ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংকের মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মাপকাঠিতে

নিম্ন আয়ের দেশ থেকে নিম্ন মধ্যম-আয়ের দেশে (এলএমআইসি) উত্তরণের স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ; এবং ২০১৮ সালের মার্চ মাসে জাতিসংঘের হিসাবমতে 'স্বল্পোন্নত দেশ' (বা এলডিসি)-এর তালিকা থেকে বের হয়ে বাংলাদেশ 'উন্নয়নশীল দেশ' হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ তিনটি সূচকেই (মাথাপিছু জাতীয় আয়, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার সূচক, মানবসম্পদ সূচক) এলডিসি বৈতরণী পার করেছে। অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচী, কৃষির রূপান্তর, তৈরী পোশাক খাতের আবির্ভাব, প্রবাসীদের পরিশ্রমলব্ধ আয়, তৃণমূল সংগঠনসমূহের ভূমিকা, সামাজিক আন্দোলনের ইতিবাচক প্রভাব - এমন অনেক অনুঘটকের ইতিবাচক অভিঘাত বাংলাদেশের দ্বৈত উত্তরণ ও অন্যান্য অর্জনকে সম্ভব করেছে।

প্রবৃদ্ধি ও কাঠামোগত রূপান্তর

স্বাধীনতা-পরবর্তী অর্জনগুলো বুঝতে হলে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ও খাতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়: জিডিপি'র কাঠামোগত পরিবর্তন; বহুমাত্রিক বিপন্নতা হ্রাস; মানবসম্পদ উন্নয়নে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি; নারীর ক্ষমতায়ন; নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সুবিধার প্রসার; সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহের অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ। কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ফলে জমির উর্বরতা পেয়েছে বৃদ্ধি, কৃষি জমি চাষের নিরিঢ়তা এক এর কাছাকাছি থেকে বেড়ে দুই অতিক্রম করেছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তী বছরগুলোর দশ মিলিয়ন টন থেকে খাদ্য-শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে প্রতি বছরে ৩৫ মিলিয়ন টনের কাছাকাছি। ১৯৭০'র দশকের খাদ্যাভাবের দিনগুলোকে অতিক্রম করে বাংলাদেশ আজ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশের পণ্য ও সেবা খাতের রপ্তানি আয় আর বৈদেশিক সাহায্যের অনুপাত ছিল ১:১, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সেটি দাঁড়িয়েছে ১৬:১। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ১৯৮০'র দশকে যেখানে ছিল জিডিপি'র ৮ শতাংশেরও বেশি, তা এখন দু'শতাংশেরও কম। বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একটি দেশ থেকে বাংলাদেশের রূপান্তর ঘটেছে একটি বাণিজ্য নির্ভর দেশে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকের ধারাবাহিক অগ্রসরতা থেকে বাংলাদেশের একটি আশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠে। ১৯৮০'র দশকের পরবর্তীতে প্রতি দশকেই বাংলাদেশ তার গড় বার্ষিক দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার এক শতাংশ করে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, যে হার বর্তমানে সাড়ে সাত শতাংশের কাছাকাছি। মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৭৫০ মার্কিন ডলার যা ক্রয় ক্ষমতার সমক্ষতার বিবেচনায় প্রায় তিন হাজার পাঁচশত মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ)। জিডিপি'র কাঠামোতেও এসেছে পরিবর্তন: কৃষি

নির্ভর অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে প্রধানত একটি উৎপাদন ও সেবা খাত নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে (জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৯৭০-এর দশকে ৫৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে)। শিল্পনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিযোগিতাসক্ষম রফতানিমুখী তৈরী পোষাকখাতের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে এবং বিশ্ব তৈরী পোষাকের বাজারে দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানিকারক হিসেবে বাংলাদেশ তার অবস্থান সুসংহত করেছে (এ খাতে রফতানির মোট পরিমাণ বর্তমানে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের মোট রফতানি আয়ের ৮৪ শতাংশ)। নারীদের কর্ম-সুযোগ সৃষ্টি (এ খাতের ৩.৪ মিলিয়ন শ্রমিকের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নারী), ইতিবাচক আর্থ-সামাজিক অবদান ও নারীর ক্ষমতায়নে এ খাতের অবদান সর্বজনবিদিত।

এমডিজি'র নিরীখে বিবেচনা করলে বাংলাদেশের সফলতা আজ ব্যপকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত: আয় বেড়েছে; আয়ুও বেড়েছে, কমেছে দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের অংশ (১৯৯০'র ৫৬ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-১৮ সালে তা দাঁড়িয়েছে ২২ শতাংশে; একই সময়ে অতিদারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করা মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ থেকে ১১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে)। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে এখন প্রায় সব শিশু (প্রাথমিক শিক্ষায় শতভাগ ভর্তি এবং জেন্ডার সমতা); স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার প্রতিফলন ঘটেছে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হারের উল্লেখযোগ্য হ্রাসের মধ্য দিয়ে; নিরাপদ সুপেয় পানির লভ্যতা পেয়েছে বিস্তৃতি; বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাক্ষরতার হার। একটি বিশেষ সূচকের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের অর্জনের নির্যাস ফুটে ওঠে: বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুর পরিবর্তন - স্বাধীনতার পরবর্তীতে গড় আয়ুষ্কাল ছিল ৪৯ বছর, যা বর্তমানে উন্নীত হয়েছে ৭১ বছরে। ২০০৫ সালে বিদ্যুৎ সেবার সুবিধা পেত ৪৪.২ শতাংশ নাগরিক, যা বর্তমানে ৭০ শতাংশের বেশি। ২০০৫ সালের ৬.৩ শতাংশের তুলনায় ২০১৫ সালে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে ৮১.৯ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে দেশের ১৪.৪ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যা ২০০৫ সালে ছিল মাত্র ১ শতাংশ।

বাংলাদেশের আগামী দিনের অর্জনে সরকার ও নীতিমালার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা থাকতে হবে। আশি ও নব্বই দশকে বাংলাদেশ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি-সিদ্ধান্ত নেয়: বাণিজ্য উদারীকরণ, আমদানি সহজীকরণ, রফতানিমুখিতা, বেসরকারীকরণ। পূর্বকার রাষ্ট্রীয় মালিকানা নির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে এসে একটি বাজার-নির্ভর ও মূলত ব্যক্তিখাত কেন্দ্রিক অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নয়ন প্রচেষ্টার মূলধারায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির এ পথ-পরিক্রমা ও রূপান্তর সহজ ছিল না, কিন্তু ধারাবহিকতা

বজায় রেখে বিবর্তনমুখী অর্থনীতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ও বিকাশমান সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অগ্রসর হয়েছে সামনের দিকে এবং বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্মুক্ততার সূচক (জিডিপিতে আমদানি-রপ্তানির অংশ) ১৯৯০-৯১ সালের ১৬.৮ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ সালে দ্বিগুণ হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এ পথ-পরিক্রমায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ যেমন সামর্থ্য ও সাফল্য প্রদর্শন করেছে, তেমনি উন্নয়ন সম্ভাবনার সুযোগগুলোকে আরো ভালভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে আরো শক্তিমত্তা প্রদর্শনের সুযোগ ছিল সে কথাও অস্বীকার করা যাবে না। যা অর্জিত হয়েছে, দেশ ও জাতি হিসেবে যে কোন বিচারে তা আমাদের গৌরব ও অহংকার। সে সমালোচনাকে বিবেচনায় নিয়ে তার থেকে শিক্ষা নেবার গুরুত্বও আজ সমধিক। একথা সত্য যে, শক্ত সমালোচনার শক্তি শক্তিশালী একটি জাতিরই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট। এ শক্তি যেন আমরা কখনো হারিয়ে না ফেলি।

আগামীর পথ-পরিক্রমা: চ্যালেঞ্জ, ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা

স্বাধীনতা-উত্তর আর্থ-সামাজিক অর্জন বাংলাদেশকে তার সামর্থ্য সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে, এটি যেমন সত্য, তেমনি এটিও সমধিক সত্য যে আগামী দিনের চলার পথে বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হবে পুরাতন ও নতুন উভয়বিধ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলো দ্বিমাত্রিক: প্রথমত, চলমান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার দূর্বলতা প্রসূত চ্যালেঞ্জ যার আশু সমাধান প্রয়োজন; দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনশীল জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট নতুন চ্যালেঞ্জ যার মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন হবে যথাযথ প্রস্তুতি। এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গতিপথ অতীতে অতিক্রান্ত পথরেখার একটি নিছক সম্প্রসারণ মাত্র হবে না। আগামীর পথে হতে হবে অনেক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন, করতে হবে নতুন পথের সন্ধান। ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি, বিকাশমান সম্ভাবনা ও অপেক্ষমান সুযোগের সমন্বয়ে সমান্তরাল পথের এক যাত্রার ক্রান্তিলগ্নে আজকের বাংলাদেশ। আর এ যাত্রার যথাযথ প্রস্তুতিই বাংলাদেশের সামনে আজ সময়ের দাবী।

স্মর্তব্য যে, দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্যে সত্ত্বেও দেশের ১৬৫ মিলিয়ন জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এখনো জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে; এক-নবমাংশ বাস করছেন অতিদারিদ্র্যসীমার নিচে । শতকরা হিসাবের আড়ালের এ সংখ্যাটি কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ; প্রায় সাড়ে তিন কোটি মানুষকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে মুক্ত করতে হবে;

এর মধ্যে দেড় কোটিরও বেশী মানুষকে মুক্ত করতে হবে চরম দারিদ্রাবস্থা থেকে। আয় বন্টনে ন্যায্যতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের নিরীখে বিচার করলে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে হবে। সর্বসাম্প্রতিককালে পরিচালিত খানা-জরিপের উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে আয়-বৈষম্য বেড়ে চলেছে, বাড়ছে সবচেয়ে ধনী ও সবচেয়ে কম আয়ের মানুষের মধ্যে পার্থক্য।

প্রতিবছর শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে প্রায় ২০ লাখ মানুষ। তাদের জন্য যথাযথ ও শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের জন্য হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। জনমিতিক সুযোগ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) কাজে লাগানোর জন্য মানসম্মত এবং শ্রম বাজার ও অর্থনীতির আগামীর চাহিদা উপযোগী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। আর সেটি করতে হবে এখনই। বর্তমানেও অবশ্য অনেক কর্মসূচী ও উদ্যোগ গৃহীত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার কার্যকারীতা থেকে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই দূর্বল। শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশের বাজেট বরাদ্দ মোট জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ থেকে ইউনেসকো প্রস্তাবিত ৪ থেকে ৬ শতাংশে নিয়ে যেতে হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে শিক্ষিত তরুণদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে শিক্ষিত তরুণের সংখ্যাও। বর্তমানের অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান-নির্ভর শ্রম-কাঠামো থেকে প্রাতিষ্ঠানিক শ্রম-নির্ভর কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। উদ্যোক্তা শ্রেণির বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা দিতে হবে, রাজস্ব প্রণোদনা ও আর্থিক নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। কর্মস্থলে যথাযথ শ্রম-মান নিশ্চিত করা, এবং শোভন কাজের পরিবেশ রক্ষা এখন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রম আইনে শ্রমিকদের অধিকার যাতে সুরক্ষিত হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার যেমন করতে হবে, তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নও নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশের আগামীদিনের প্রবৃদ্ধি, তাতে ত্বরণ সৃষ্টি এবং একটি প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে অবকাঠামোগত ঘাটতি পূরণকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। প্রয়োজন হবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগে চাঞ্চল্য আর এ প্রেক্ষিতেই প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভিন্ন হিসাব মতে বন্দর, সড়ক, রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশকে আগামী এক দশকে একশ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। এটি সত্য যে, এসব খাতে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে (গত এক দশকে প্রায় তিন গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে), বন্দরের সেবার মান বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া

হচ্ছে (দু'টি নতুন বন্দর তৈরি করা হচ্ছে); সড়ক ও রেল নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ, মুঠোফান ও ইন্টারনেট-সেবার সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হচ্ছে বিভিন্ন পদক্ষেপ। এক্ষেত্রে প্রতিবেশ ও পরিবেশ সংরক্ষণকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অদক্ষতা ও অপ্রতুলতা সর্বজনবিদিত; বন্দরের কর্মদক্ষতার মান, উদ্যোক্তাদের সেবাপ্রাপ্তি ও বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা থেকে যাচ্ছে যা বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপর ফেলছে বিরূপ প্রভাব। বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনামূলক সুবিধাসমূহকে প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় রূপান্তর করতে হলে এবং উৎপাদক, বিনিয়োগকারী এবং ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে হলে, ব্যবসা পরিচালন সুবিধা ও বিশ্ব প্রতিযোগিতা সক্ষমতা র‍্যাংকিং এ উপরে উঠতে হলে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে আরও বেশি পরিমাণ বিনিয়োগ যেমন করতে হবে, তেমনি বিনিয়োগের মান, উৎকর্ষতা ও দক্ষতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণ ও ব্যবসায়ীদের কাছে ডিজিটাল অর্থনীতি ও ই-গভর্ন্যান্সের সুফল নিয়ে যেতে হলে ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রয়োজন হবে আরো বিনিয়োগের। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। এসব ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ নিশ্চিত না করা গেলে বড় অংকের বিনিয়োগ পর্যবসিত হবে উচ্চ সেবামূল্য ও ঋণ ফাঁদে। এসব বিবেচনায় রেখে এখনই বাংলাদেশকে সজাগ ও সতর্ক হতে হবে। গ্রহণ করতে হবে আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

বাংলাদেশকে দ্বৈত-উত্তরণের সম্ভাব্য নেতিবাচক অভিঘাত সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের কারণে বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে হবে বড় পরিবর্তন, যার ফলশ্রুতিতে বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা পরিবেশ হবে আরো অনেক প্রতিকূল। সরবরাহ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হলে ভারত, চীন এবং অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের লাইন অব ক্রেডিট যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার একশটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে। বর্তমানে সরকারি, সরকারি-বেসরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান আছে। এসব বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এক্ষেত্রে বড় ধরনের বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে পারে। অবকাঠামোর কারণে যদি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হয় তবে অবকাঠামোতে ব্যাক্তিখাতের বিনিয়োগ - আকর্ষণই যৌক্তিক পদক্ষেপ হবার কথা। এবং সে প্রেক্ষাপটে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চল শক্তিশালী ও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে। যত দ্রুত সম্ভব অন্তত কয়েকটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ও চালু করতে পারলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য তা হবে একটি বড় ধরণের গেম চেঞ্জার। আর সেটি করতে হলে ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন

কর্মকাণ্ড, এবং সরকারি সংস্থা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

আগামীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করা হবে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ঋণ পরিসেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রেকর্ড যদিও খুবই ভালো, আগামীতে এ দায়ভার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অর্থ আহরণের জন্য বাংলাদেশকে সক্রিয়ভাবে বিকল্প নতুন অর্থায়নের উৎস খুঁজতে হবে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ, বাজারে সভ্রেইন বন্ড অবমুক্তি এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাংক, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও অন্যান্য সম্ভাব্য দক্ষিণ-দক্ষিণ ও মিশ্র (ব্লেন্ডেড) আর্থিক উৎসসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহ করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে বাংলাদেশকে আরও গুরুত্বারোপ করতে হবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজস্ব-জিডিপির অনুপাত ১০ শতাংশ, যা এমনকি দক্ষিণ এশিয়ায়র দেশের মধ্যেও সর্বনিম্ন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আরও অধিকসংখ্যক কর প্রদান সক্ষম জনগণকে করের আওতায় নিয়ে আসতে হবে, কর ফাঁকি হ্রাস করতে হবে; অবৈধ অর্থ পাচার কমিয়ে আনতে হবে; জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। কর কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে হবে, যাতে বর্তমানের পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীলতা (মোট কর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ) হ্রাস করে প্রত্যক্ষ কর, বিশেষভাবে ব্যক্তি আয়করের অংশ (মোট কর আয়ের এক-দশমাংশ) উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা যায়। এনবিআর-এর সংস্কার কর্মসূচীকে বেগবান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন, করবান্ধব প্রশাসন, প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধি, ট্রান্সফার প্রাইসিং সেলের শক্তিশালীকরণ এবং আমদানি পর্যায়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও এনবিআর এর মধ্যে সমন্বয়কে জোরদার করতে হবে। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ভ্যাট আইন কার্যকর করতে হলে এখনই প্রস্তুতিমূলক কাজ শেষ করে রাখতে হবে।

এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সহযোগিতার যে সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশকে আগামীতে তা কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় বাংলাদেশ, ভুটান, ইন্ডিয়া, নেপাল মোটর ভেহিক্যাল অ্যাগ্রিমেন্ট (বিবিআইএন-এমভিএ), বিসিআইএম-ইকোনমিক করিডর, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই), উপ-আঞ্চলিক এনার্জি গ্রিড, হিমালয়-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার জলজ সম্পদের যৌথ অনুসন্ধান এবং ব্লু-ইকোনমির সম্ভাবনার কথা। সম্ভাব্য সুফল লাভের জন্য যোগাযোগ, বাণিজ্য, পরিবহন, বিনিয়োগ এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগের ক্ষেত্রে মধ্য-দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে এ পাঁচ-সংযোগের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে হবে। ট্রান্সপোর্ট করিডোরকে রূপান্তরিত

করতে হবে বিনিয়োগ করিডোরে এবং অর্থনৈতিক করিডোরে। বাংলাদেশকে যদি দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিবহন ও উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতে হয় এবং বঙ্গোপসাগরের প্রবেশদ্বার এর সুযোগকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে হয়, তবে নিষ্কন্টক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং বন্দর উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

এ কথা মনে রাখতে হবে যে, জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেলের (আইপিসিসি) মতে, বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিবেশঝুঁকিতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি। বিশ্বব্যাংকের একটি গবেষণামতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রায় ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ৪০ শতাংশ উৎপাদনক্ষম জমি জলসীমার নীচে ডুবে যাবে। বিশেষজ্ঞরা ২০৮০ সালের মধ্যেই এমনটা ঘটার আশঙ্কা করছেন। এর ফলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য, যার পরিণাম হবে ভয়াবহ। উপকূলীয় অঞ্চলের দুই কোটি মানুষ ইতিমধ্যে উচ্চ লবণাক্ততা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। ভবিষ্যতে লবণাক্ততা, নদীভাঙ্গন ও মরুকরণের গতি বাড়বে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফসল উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করতে হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় পরিবেশ-বান্ধব নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে এবং তার বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাংলাদেশকে সম্পদের টেকসই ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে; যেমন, কৃষিতে ভূগর্ভস্থ পানির পরিবর্তে ভূপৃষ্ঠের পানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করতে হবে। লবণাক্ততা, বন্যা ও শীত-সহনশীল উচ্চফলনশীল শস্যের জাত উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণা খাতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থায় 'জোনিং'কে উৎসাহিত করতে হবে। এ যাবৎকাল ভাল ফল দেওয়া উচ্চফলনশীল কৃষি পদ্ধতি একটি প্রযুক্তি-সীমান্তে উপনীত হয়েছে বলেই মনে হয়। পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে হলে বাংলাদেশের কৃষিতে নতুন প্রজন্মের কৃষি-প্রযুক্তির প্রচলন করতে হবে। গবেষণা এবং মানবসম্পদ তৈরিতে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি মোকাবেলা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো, জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নেতিবাচক অভিঘাতের প্রশমন ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তৈরি এবং কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য অর্জনকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের আওতায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এসব উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব জলবায়ু তহবিলসহ বৈশ্বিক উদ্যোগগুলো থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সোচ্চার ও সচেষ্ট হতে হবে।

বাংলাদেশের এগিয়ে চলার পথে সামষ্টিক অর্থনীতির কার্যকর ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, নিয়ন্ত্রণপ্রক্রিয়ার সংস্কার এবং উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ব্যতিরেকে সাশ্রয়ী বাস্তবায়ন ও সুশাসন ও জবাবদিহি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। আর সেটি না হলে আগামীর উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাও দূরূহ হবে। বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের যাত্রাপথে এসব চাহিদা বিবেচনায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং তার নীরিখে ব্যবস্থা নিতে হবে।

যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আগামীর উন্নয়নের গতিধারা অতীতের সরলরৈখিক সম্প্রসারণ হবে না। অর্থনীতির ইতিহাসে এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে, যেখানে একটি রাষ্ট্র উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট ধাপে পৌঁছে তারপর থমকে ও থেমে গেছে, পূর্বকার সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেনি। অর্থনীতির ভাষায় এটিকে মধ্য আয়ের ফাঁদ (মিডল ইনকাম ট্র্যাপ) বলা হয়ে থাকে। স্বল্পোন্নত থেকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত অনেক দেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যখন কোন দেশ অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণে ও বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে অসমর্থ হয়। এসব দেশ তখন প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সম্মুখীন হয় শ্লথ গতির, নিম্ন সঞ্চয়-নিম্ন বিনিয়োগ-নিম্ন সম্পদ প্রাপ্যতার দুষ্টজালে আটকা পড়ে। ফলশ্রুতিতে ব্যবসা পরিচালনার জন্য উদ্যোক্তাদের দিতে হয় উচ্চ মূল্য, দূর্বল অবকাঠামো এসব অর্থনীতির প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে করে তোলে দুর্বল। ফলশ্রুতিতে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পড়ে ছেদ। আর এসব থেকেই জন্ম নেয় মধ্য-আয়ের ফাঁদ। বাংলাদেশকে এ সম্ভাব্য ফাঁদ এড়িয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হবার চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হবে। এ লক্ষ্যে অর্থনীতির যে কাঠামোগত রূপান্তরের প্রয়োজন তার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতাকে দূর করতে হবে। সুশাসনের ঘাটতি হ্রাস করতে হবে, উন্নয়ন প্রশাসনের কর্মদক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশের যুব সম্প্রদায় তথা মানবসম্পদের গুণগত উৎকর্ষতার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তরুণ প্রজন্ম ও বাংলাদেশের যুবসমাজকে দেশের অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিতে হবে, তাদের উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, বাংলাদেশের ৬২.১ মিলিয়ন কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বয়সই ১৫ থেকে ২৯-এর মধ্যে (২০১৬ সালের উপাত্ত)। বস্তুতপক্ষে, ২০৪১ সালের মধ্য একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার যে স্বপ্ন বাংলাদেশ দেখছে, তা অনেকাংশে নির্ভর করবে এ যুবসমাজের শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক

ডিভিডেন্ড এর সুফল আদায় করার সক্ষমতার উপর। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশকে দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতে হবে। যেমন ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লেবার স্টাডিজের ২০১৬ সালের এক প্রতিবেদন অনুসারে তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বিশ্ববাজারে নিকট-প্রতিযোগী কয়েকটি দেশের শ্রমিকদের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কম। উৎপাদনের উপাদান নির্ভর (ফ্যাক্টর-নির্ভর) অর্থনীতি থেকে উৎপাদনশীলতা-নির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরের সক্ষমতার উপর বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নির্ভর করবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিহীন (জবলেস গ্রোথ) প্রবৃদ্ধির যে চ্যালেঞ্জ অনেক উন্নয়নশীল দেশকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে সে বিষয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে। এ পরিস্থিতিতে অর্থনীতির বৈচিত্রায়ণ, সরবরাহ-সক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর এবং নতুন নতুন খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে যাতে শ্রমবাজারে অন্তর্ভূক্তির সাথে কর্মসুযোগ সৃষ্টির একটি সংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। এবং সে কর্মসুযোগকে হতে হবে শোভন কাজের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে কর্মসুযোগ ভাল মজুরী ও ভাল বেতন দেয় এবং যে কর্ম-পরিবেশ শ্রমিক বান্ধব। বাংলাদেশকে দু'টি ধারায় কাজ করতে হবে: ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণ, এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাজারের সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো। আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্ক ও ভ্যালু চেইন গড়ে তোলার দিকে বাংলাদেশকে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের সাথে দ্বিপক্ষীয় মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের পথে যেতে হবে। গতানুগতিক বাণিজ্য চুক্তির বাইরে সার্বিক ও সর্বব্যাপী সহযোগিতাধর্মী চুক্তির দিকে যেতে হবে। এসব আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে দর-কষাকষির দক্ষতা বাড়াতে হবে। রফতানি ও বাজার বৈচিত্রায়নকে নীতি সমর্থন এবং সুনির্দিষ্ট আর্থিক, রাজস্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লব একই সঙ্গে সুযোগ ও শংকার কারণ হবে। বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতির ডিজিটাল উত্তরণ ও রূপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়নে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার খুবই সীমিত। ইন্টারনেট সংযোগের গতি বৃদ্ধি, গ্রাহক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য হ্রাস, তথ্য সংরক্ষণ এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতি পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনলাইন বাণিজ্য ও সেবা খাতের বিকাশে সহায়তা করতে হবে, সফ্টওয়্যার, আউটসোর্সিংসহ নতুন অর্থনীতির

(প্রথাগত অর্থনীতির বিপরীতে) খাতসমূহ যেন প্রয়োজনীয় প্রণোদনা পায়। শুদ্ধাচার ও জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে ২০১২ সালে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবিত ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণব্যবস্থার প্রচলনসহ বেশ কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। এগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশকে এগিয়ে যেতে হবে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক দেশ হিসেবে। এজেন্ডা ২০৩০-এর মূল দর্শন হলো কাউকে পিছিয়ে রাখা যাবে না (লিভ নো ওয়ান বিহাইন্ড)। সমাজে যারা পিছিয়ে আছেন, বিভিন্ন ভঙ্গুরতার দ্বারা আক্রান্ত, প্রান্তজন - উন্নয়ন প্রচেষ্টায় তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বাংলাদেশের জিনি কোইফিশিয়েন্ট (আয় বৈষম্যের সূচক) ১৯৮৪ সালে ছিল ০.৩৫, যা ২০১৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৪৮ হয়েছে। ২০১৬ সালে দেশের সর্বোচ্চ ধনী ১০ শতাংশ নাগরিকের আয় সর্বনিম্ন গরিব ৪০ শতাংশ নাগরিকের আয়ের ২.৯ গুণ ছিল, যা ১৯৮৩-৮৪ সালে ছিল ১.৫ গুণ। জেন্ডার-সংবেদনশীল প্রবৃদ্ধির দিকে সচেতন থাকলে তা বৈষম্য হ্রাসেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে; নারীদের সামাজিক গতিশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু দরিদ্ররা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তুলনামূলকভাবে বেশী ঝুঁকিতে থাকেন, বাংলাদেশে সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন হতে হবে বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শনের মূল চালিকা শক্তি। সেসব নীতির উপর জোর দিতে হবে যেগুলো একই সঙ্গে বণ্টনে ন্যায়বিচার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম, এবং টেকসই উন্নয়ন ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্জন জনগণকে যেমন আত্মবিশ্বাসী করেছে, তেমনি বেড়েছে তার প্রত্যাশার ব্যাপ্তিও। নতুন প্রজন্মের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস ও এ প্রত্যাশা আরো বেশি সত্য। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়নের গতিধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে, তাকে আরও শক্তিশালী করে একবিংশ শতাব্দীতে অগ্রসর হতে হলে, স্থানীয় সরকারের শক্তি বৃদ্ধি করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তৃণমূলের জনগণকে আরো কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রয়োজন হবে এমন একটি বিচারব্যবস্থা যা হবে স্বাধীন, এমন একটি প্রশাসন যন্ত্র যা হবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত এবং এমন একটি সংসদীয় ব্যবস্থা যা হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ-পরিক্রমায় যুক্ত হয়েছে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনের প্রত্যয়, যে উন্নয়ন পথযাত্রায় থাকবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ও পরিবেশ বান্ধব উন্নয়নের ত্রিমাত্রিক সংশ্লেষ। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবমতে, আগামী তের বছরে (২০১৮-২০৩০) এসডিজি

বাস্তবায়নে বাড়তি ৯২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে সম্পদ আহরণের চ্যালেঞ্জ যেমন আছে, তেমনি আছে বিভিন্ন খাতে অগ্রাধিকারভিত্তিক সম্পদ বিতরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আহরণ এবং ফলাফলের বন্টনে ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের চ্যালেঞ্জ। এগুলোর প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রত্যেক পর্যায়েই আছে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা যা মোকাবেলা করেই বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। কেবলমাত্র উন্নয়নমূলক রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশকে উদ্যোক্তা রাষ্ট্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

একবিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে অগ্রসর হতে হলে বাংলাদেশকে এমন একটি উন্নয়নপ্রক্রিয়া চলমান রাখতে হবে যাতে করে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভূক্তিমূলক, বন্টনে ন্যায্যতাভিত্তিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই একটি উন্নত বাংলাদেশ আমরা দেখতে পারি। সুস্থ রাজনীতি, সুশাসন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও আগামীর চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উন্নয়ন কৌশলের সমর্থনে বর্তমান বাংলাদেশকে প্রত্যাশার সে বাংলাদেশের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অতীত বলে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের জনগণের সে সক্ষমতা আছে।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮
প্রতিচিন্তা

অধ্যায় ৬

ব্যাংকিং

ব্যাংকিং খাতের সংস্কারে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা

ফাহমিদা খাতুন

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বিশৃঙ্খলার খবর এখন সর্বত্র। বিভিন্ন সময়েই একের পর এক নতুন নতুন দুর্নীতি ও অনিয়মের খবর প্রকাশ পাচ্ছে। এতে করে যেমন দেশের সাধারণ জনগণ আস্থা হারাচ্ছে তেমনি প্রভাব পড়ছে দেশের অর্থনীতিতে, নষ্ট হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি। এসব নিয়ে সিপিডি সাক্ষাৎকারে বলেছেন ড. ফাহমিদা খাতুন, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি।

বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত একধরণের নাজুক পরিস্থিতি পার করছে। এখানে আপনি কী ধরণের বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছেন?

দেশের ব্যাংকিং খাতের মধ্যে, রাষ্ট্রায়ত্ত খাত ও ব্যক্তি খাত, উভয় খাতেই বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচারিতা চলছে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের ব্যাংকগুলোতে বড় বড় অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ঘটছে, নামে-বেনামে বিভিন্ন ধরনের ঋণ দেওয়া হচ্ছে এবং এসব ঋণ কু-ঋণে পরিণত হচ্ছে। যার ফলে ব্যাংকগুলো মূলধন ঘাটতিতে পড়ে যাচ্ছে। এই মূলধন ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সরকার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোকে গত দশ বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা মূলধন পুনর্ভরণ করেছে। এখন আবার সরকারি ব্যাংকগুলো আরও ২০ হাজার কোটি টাকা চাচ্ছে। এই যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে - এটা কাদের টাকা? এটাতো বাংলাদেশের জনগণের করের টাকা। এই করের টাকার বিনিময়ে জনগণ সরকারের কাছ থেকে ভালো সেবা পাওয়ার আশা করে। রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুৎ, পানি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এই ধরনের সেবা সরকারের দেওয়ার কথা

সেগুলোই জনগণ আশা করে কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে। কিন্তু এই করের টাকা দিয়ে উল্টো দুর্নীতিবাজদেরকেই সাহায্য করছে সরকার। বছরের পর বছর যদি মূলধন দিয়ে সরকারি ব্যাংকগুলোকে জিইয়ে রাখার এই প্রচেষ্টা চলে তাহলে এই ধরণের ব্যাংক থাকার কী দরকার? এই ধরণের বোঝা টেনে নেওয়ার দরকার নেই।

আবার এখন দেখছি সরকারি ব্যাংকের মত বেসরকারি ব্যাংকগুলোতেও নানান ধরণের অনিয়ম দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যাংকের সংখ্যা পঞ্চাশের উপরে। তার মধ্যে প্রায় বিশটি ব্যাংকের স্বাস্থ্য ভালো নয়। এখন সরকারি আমানতের ৫০ শতাংশ বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়, আগে যেটি ছিল ২৫ শতাংশ। ফারমার্স ব্যাংক তার পুরো মূলধন নষ্ট করে ফেলেছে। এ ধরণের খারাপ ব্যাংকগুলোকে সাহায্য করার জন্য সরকারি আমানতের ৫০ শতাংশ রাখার নির্দেশ বরং তাদের খারাপ কাজকে উৎসাহিত করবে। এখানে ভালো ব্যাংক এবং খারাপ ব্যাংকগুলোকে একই কাতারে বিবেচনা করে সবাইকে একই ধরণের উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এটি এক ধরণের অন্যায় হচ্ছে। খারাপ ব্যাংকগুলো এখন মনে করবে, ব্যাংক খারাপ চললে বা যে কোন ধরণের বিপদে পড়লে সরকার তো এগিয়ে আসবেই। এতে করে, কু-ঋণ কিংবা অর্থ আত্মসাৎ এর মত ঘটনাগুলো থেকে বেরিয়ে আসার তাগাদা থাকবে না।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে চুরি হয়েছে, রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি ব্যাংক থেকে অর্থ আত্মসাত, বেনামী/খেলাপী ঋণসহ নানাধরণের অনিয়ম চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এসব অনিয়ম কেনো হচ্ছে বলে মনে করেন?

এখানে কয়েকটি বিষয় কাজ করছে। ব্যাংকগুলোর ভিতরে সুশাসন ও সুপারভিশন বা মনিটরিংয়ের অভাব রয়েছে। আরেকটি হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ঋণ দেওয়া। এই ধরণের ঋণের কোন যাচাই-বাছাই করা হয় না। ঋণ যেখানে দেওয়া হবে সেটি কোন ভায়েবল প্রজেক্ট কি না, কিংবা যে ঋণ নিচ্ছে তার কোন ভালো ট্র্যাক রেকর্ড আছে কি না সেগুলোকে বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। যেহেতু রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ঋণগুলো দেওয়া হচ্ছে সুতরাং ব্যাংক কর্মকর্তারা যখন ঋণটা আদায় করতে যায় তখন তাদেরকে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এই ঋণগুলোই কু-ঋণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে, যারা ঋণ নিয়ে ঋণ ফেরত দিচ্ছে না এবং জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হচ্ছে, যেমন সোনালী ব্যাংকের হলমার্ক কেলেঙ্কারির মত ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে, তাদের শাস্তি হচ্ছেই না। তারা কোন না কোনভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় অন্যরা এ ধরণের কাজে উৎসাহ পেয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব অনিয়ম রোধ করে ব্যাংকিং খাতে শৃঙ্খলা আনয়নে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কী?

অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্কটা যেমন হওয়া উচিত তেমনটা নেই। সেখানে এক ধরণের ফারাক রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রানীতি করবে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভূমিকা পালন করবে এবং, সর্বোপরি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংকার হিসেবে কাজ করবে। এসকল কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। এখানে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। যার ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাঁর ভূমিকাগুলো সুচারুভাবে পালন করতে পারছে না। যেমন কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে সিআরআর বা ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, অর্থাৎ, ব্যাংকগুলো তাদের তলবি এবং মেয়াদী দায়ের যে অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখে, সেই সিআরআর ৬.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫.৫ শতাংশ করা হয়েছে। এটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক করেনি, এটি অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাংকগুলোর মালিকের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শুধুমাত্র একটি সার্কুলার জারি করেছে। কিন্তু, সবেমাত্র জানুয়ারি মাসেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি করেছিল জানুয়ারি থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য। এই সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির সাথে এই সিআরআর কমানোর উদ্যোগ সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। ভবিষ্যতে উন্নয়শীল দেশের কাতারে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। এমন অবস্থায়, ব্যাংকিং খাত ঝুঁকির মুখে থাকলে দেশের উন্নয়নে কী প্রভাব পড়বে?

একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যাংকিং খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকিং খাতকে অর্থনীতির চালিকাশক্তি বলা যায়। বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, যেমন, রাস্তাঘাট, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিংবা সেবা খাতের উন্নয়ন কাজসমূহের অর্থায়ন ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু, দুর্বল আর্থিক খাত দিয়ে তা সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যদি এখানে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন না করতে পারে, তাহলে একদিকে যেমন আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি নৈরাজ্যের মধ্যে পড়বে অন্যদিকে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হবে। যখনই আমরা উন্নয়নশীল দেশ কিংবা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে যাবো, তখন কিন্তু আমাদের অবকাঠামোগত খাত যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, সেতু ইত্যাদিতে আরও বেশি করে বিনিয়োগ করতে হবে। উন্নয়নের জন্য আরও বেশি করে অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে হবে। সেটির জন্য যে ধরণের ব্যাংকিং খাত থাকা দরকার সেটি

আমাদের নেই। ব্যাংকের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু ব্যাংকের গুনগত মান বাড়েনি। একটি শক্তিশালী ব্যাংকিং ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়, সেটি আমাদের এখন নেই।

ব্যাংকিং খাতের বর্তমান নাজুক অবস্থা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কী?

সুনির্দিষ্ট পরামর্শ হচ্ছে, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার। দেশের ব্যাংকিং খাতে ব্যাপকভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহার সর্বত্র বাড়াতে হবে। এর ফলে, যেকোন ধরণের অব্যবস্থাপনা হলে সেটি দ্রুত ধরা পড়ে। সেই সাথে, ব্যাংকগুলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন করতে হবে। তাছাড়া, বিশেষভাবে যেটি করণীয় তা হল, ব্যাংকিং খাতকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা। ব্যাংকের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাইরের প্রভাব বন্ধ করতে হবে। দুর্নীতি ও অর্থআত্মসাৎকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সাজ্জাদ মাহমুদ শুভ, শ্রুতিলিখনে হাসিবুর রহমান খান।

৫ এপ্রিল ২০১৮
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রতিশ্রুতি থেকে কেন সরে এলেন অর্থমন্ত্রী?

মোস্তাফিজুর রহমান

আমাদের অর্থনীতি নিয়ে আমাদেরই ভাবতে হবে। কীভাবে একটি টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় সেদিকেই আমাদের মনোযোগ থাকা দরকার। যে কোন অসংগতি, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা গঠনমূলক সমালোচনা করি। কেন করি? এই রাষ্ট্রটা যেন সবার হয়। সব পক্ষের হয়। ধনী-দরিদ্র বৈষম্য না থাকে। কেউ এককভাবে, অন্যায়ভাবে সম্পদ আহরণ না করতে পারে। আমরা জনগণের সম্পদ কেউ নিয়ে যাক চাই না। কেউ তা চাইতে পারে না। আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের তালিকাভুক্ত হয়েছি, আমরা হয়তো একদিন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাব। কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার পথে যে বাধাগুলো রয়েছে তা তো দূর করতে হবে। বিভিন্ন সেক্টরে যে অনিয়ম-দুর্নীতি হচ্ছে তা দূরীকরণে আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাংক খাতের পরিস্থিতির কথাই ধরা যাক। কেমন আছে আমাদের ব্যাংকিং খাত? এটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না কেমন আছে এই আর্থিক খাতটি। ব্যাংক খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। ব্যাংকিং খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ থাকবে জাতীয় ঘোষণায়, আশা করেছিল সবাই। সেই ঘোষণা কি আছে বাজেটে?

সিপিডি'র পক্ষ থেকে আমরা বলেছি, একটি ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে। এবং সংসদে যাতে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হয়, ব্যাংকিং খাতের প্রতি যেন নজরদারি থাকে পার্লামেন্টের। ব্যাংক খাতের সংস্কারের জন্য 'ব্যাংকিং কমিশন' গঠনের কথা তো মাননীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি তার আগের অবস্থানে নেই। কেন নেই জানি না। তবে আমার মনে হয়, ব্যাংকিং খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে

শক্তিশালী অবস্থান নেওয়া প্রয়োজন। ব্যাংক খাতের বিশৃঙ্খলা, ব্যাংক তছরূপকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে এফবিসিসিআই যে একটি শক্ত অবস্থান নিল এবং সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট ব্যাংক খাতের দুরাবস্থার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বললেন, এটি খুবই ইতিবাচক। আমরা তো অনেকদিন ধরেই বলছি, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। অর্থনীতির জন্য এটি এত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত বা এলাকা যে সেখানে বিশৃঙ্খলা পরবর্তীতে আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতির যে ধরনের অগ্রগতি হয়েছে তার সবটাকেই একটা সংকটের মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

দুর্নীতি দমন কমিশনও এ বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে সেগুলো আরও শক্তিশালী করে বিচারাধীন যেগুলো আছে দ্রুত নিষ্পত্তি করে ব্যাংকিং সেক্টরে উপরের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

১২ জুন ২০১৮
আমাদের সময়

নিয়মনীতির সর্বজনীন কোনো প্রয়োগ নেই

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়মনীতি সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ না করার কারণে ঋণ ও করখেলাপিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'যেসব নিয়মনীতির মাধ্যমে আমরা শৃঙ্খলা বজায় রাখতে চাই, সেগুলো তারা দখল করে নিয়েছে। নিয়মনীতির কোনো সর্বজনীন প্রয়োগ নেই। কিছু কিছু লোক খেলাপি ঋণকে সমন্বয় করতে পারছে। আবার প্রকৃত উদ্যোক্তা হয়েও কিছু লোক ঋণ নিয়ে অসুবিধার মধ্যে আছে। নিয়মনীতি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থে প্রয়োগের কারণেই তা এক অর্থে হাইজ্যাক হয়ে গেছে।' তিনি বলেন, নিয়মকানুন সমভাবে প্রয়োগই দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকলে এটি ফিরিয়ে আনা সহজ হতো।

রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে গতকাল রোববার বর্তমান সরকারের গত ১০ বছরের শাসনকালের অর্থনৈতিক বিষয়ে পর্যালোচনা তুলে ধরে সিপিডি। সেই অনুষ্ঠানে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য।

এর আগে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'খেলাপি হিসেবে যাঁরা ধরা পড়েছেন, তাঁদের ঋণের পরিমাণ বড় বিষয় না। আমরা প্রকাশ্যে যেটুকু জানি, বড় বড় ঋণগ্রহীতারা বহু আগেই তাঁদের প্রভাব ও অন্যান্য সংযোগ ব্যবহার করে ঋণকে সমন্বয় করে নিয়েছেন অথবা অন্য ব্যবস্থার মধ্যে আছেন। ফলে লোক দেখানো একটি ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সেটির মূল্যায়ন করার প্রকৃত জায়গা নির্বাচন কমিশন না। সেটির মূল্যায়ন করার কথা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের।'

এক প্রশ্নের জবাবে নির্বাচনী ব্যয় নিয়েও কথা বলেন দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, নির্বাচনী ব্যয় এখন অনেক সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করছে। এখন যে ব্যয় হয়, তা বহন করে অনেকের পক্ষেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া সম্ভব নয়। তাই নির্বাচনের ব্যয় গণতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হয়েছে কি না, সেটি বিবেচনা করার সময় এসেছে। হলফনামা ও নির্বাচনী ব্যয়বিষয়ক একাধিক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রার্থীরা যেসব তথ্য দেন, তা পরিবীক্ষণ করে কেউ সত্যতা যাচাই করে না। সেই সক্ষমতা বা আগ্রহ নির্বাচন কমিশনের আছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়নি। সম্পদ বিবরণী দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এগুলো পর্যালোচনা করে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন দিতে পারে।'

সিপিডি'র এই বিশেষ ফেলো বলেন, 'নির্বাচন কমিশন দেশের অন্যতম সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত দায়িত্ব পালন করতে হলে রাষ্ট্রের বিচার, কর ও ব্যাংক ব্যবস্থা এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মতো অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সামগ্রিক সমন্বয় থাকতে হবে। কিন্তু সেটি আমরা দেখি না। সেটির একটি কারণ প্রশাসনিক স্থবিরতা। সে জন্য রাজনৈতিক উদ্যোগও নেই।'

সিপিডি'র এই বিশেষ ফেলো বলেন, বর্তমান সরকারের দুই মেয়াদে পরিমাণগত উন্নয়ন হয়েছে। একই সঙ্গে বৈষম্যও বেড়েছে। অধিকার রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যদি যথাযথ ভূমিকা রাখতে না পারে তাহলে বৈষম্য কমানোর চেষ্টা বাস্তবায়িত হবে না। নাগরিক সমাজের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। নাগরিক সমাজ নিরাপদে ও ভীতিহীনভাবে বক্তব্য দিতে পারে, বিনিয়োগকারীদের সংগঠনগুলো যেন তাদের সমস্যাগুলো উচ্চ স্বরে বলতে পারে এবং সে কারণে তাদের উপর চাপ না আসে - সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নাগরিক অধিকার, উদ্যোক্তা, গরিব মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা না করে বৈষম্য কমানোর চেষ্টা সফল হবে না।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, 'বর্তমান রাজনৈতিক ঘটনাবলি যেভাবে এগোচ্ছে সেখানে এখন পর্যন্ত নির্বাচনী আলোচনায় কোনো অর্থনৈতিক বিষয়াবলি আসেনি। নির্বাচন কীভাবে হবে, কারা করবে - এসব বিষয়ের প্রাধান্যই রয়েছে। জীবন-জীবিকার বিষয় রাজনৈতিক বিতর্কে স্থান পায়নি। সেটিকে যতটা সম্ভব নিয়ে আসতে হবে। আগামী দিনের জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে হবে যে উন্নয়ন অব্যাহত

রেখে বৈষম্য কমাতে হবে এবং গুণ-মানসম্মত প্রবৃদ্ধি দিতে হবে, যাতে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা মানুষটিও এই উন্নয়ন থেকে উপকৃত হয়। আমরা দেখেছি, গত ১০ বছরে উন্নয়নের সম্পদ সমভাবে বণ্টিত হয়নি।'

১০ ডিসেম্বর ২০১৮
প্রথম আলো

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সমস্যা

ফাহমিদা খাতুন

গত কয়েক বছরে দেশে ব্যাংকিং খাতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। তবে দুর্নীতি, অনিয়ম ও আত্মসাতের মতো ঘটনায় খাতটি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আর এ বিষয়গুলো ব্যাংকের সামগ্রিক কাজ ও গ্রহণযোগ্যতার উপর প্রভাব ফেলেছে। এ খাতের ধারাবাহিক অবনতি এবং এর ফলে যে পরিণতি হবে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলগুলো বারবার উদ্বেগ জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের আর্থিক খাত ব্যাংক নির্ভর হওয়ায়, ব্যাংকের নাজুক অবস্থা প্রভাব ফেলবে সমগ্র অর্থনীতির গতির উপর। যে কারণে সমস্যার সমাধান খুবই জরুরি। এ নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এখন সবচেয়ে জরুরি সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া। পরবর্তী সরকারের উচিত হবে ব্যাংকিং সেক্টরের ত্রুটি সংশোধনে জোর দেওয়া।

৩০ ডিসেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে ব্যাংক খাতের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে চায় সিপিডি। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ি দেশের ব্যাংকগুলোকে যে পরিমাণ মূলধন জমা রাখতে হয়, তা তারা রাখছে না। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো এ নির্দেশনা মানতে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণের পরিমাণ মোট ঋণের সমান। গত জুন মাসে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর অনাদায়যোগ্য ঋণের হার ২৮.২%, যা গত দশ বছরে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, অনাদায়যোগ্য এই ঋণের ৪৭ শতাংশ দিয়েছিলো পাঁচটি ব্যাংক। ২০১৬ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নয়টি ব্যাংক থেকে বিশেষায়িত ঋণ দেওয়া হয়েছে ১০% বেশি। এই সময়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ০.৫ অথবা তার বেশি। যেটি এসব ব্যাংকে ওই সময়ে ব্যবস্থাপনার দূর্বলতাই প্রকাশ করে। ব্যাংকগুলোর অন্যান্য

সক্ষমতা যেমন - রিটার্ন অন অ্যাসেট (আরওএ) এবং রিটার্ন অন ইকুয়িটি (আরওই) সব ব্যাংকের ক্ষেত্রেই কমেছে। এ বছরের জুনে আরওএ এবং আরওই হার ছিলো যথাক্রমে ০.৩% ও ৫.৩%। অগ্রীম আমানত অনুপাতের(এডিআর) উঠানামা প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। এখানেও গত কয়েক বছরে কিছু ব্যাংকের তারল্য বিষয়ক ব্যবস্থাপনার ত্রুটি ছিলো। তারল্য নিয়ে ব্যাংকিং খাত দু'টি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখে পড়েছে, তা হলো কিছু ক্ষেত্রে তারল্য সংকট অন্যদিকে তারল্যের উদ্বৃত্তি। যেগুলোকে চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংক বলা হচ্ছে সেই ফারমার্স ব্যাংক, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক এবং এনআরবি কমার্সিয়াল ব্যাংক ২০১৬-২০১৭ সালে তারল্য সংকটে পড়ে। ফারমার্স ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই সমস্যা এতটাই তীব্র হয় যে, সেখানে সরকারের সরাসরি সহযোগিতা করতে হয়। এবছরের মে মাসে চারটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংক ও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৭৬৫ কোটি টাকার শেয়ার কেনার চুক্তি করে ফারমার্স ব্যাংকের সাথে।

১১ ডিসেম্বর ২০১৮
আমাদের অর্থনীতি

অধ্যায় ৭

শ্রমবাজার

দেশের শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে

ফাহমিদা খাতুন

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে শ্রমবাজারে তাদের উভয়ের অংশগ্রহণ সমান হারে হতে হবে। বাংলাদেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ আগের দশকগুলোর তুলনায় বাড়ছে। এ অংশগ্রহণ শুধু সনাতন খাত, যেমন - কৃষি বা গৃহস্থালি কাজের মধ্যেই নয় কিংবা শুধু তৈরি পোশাক শিল্পেই নয়, অনেক নতুন উদীয়মান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা কাজ করছেন। যদিও পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার এখনো অনেক কম।

বাংলাদেশের অর্থনীতি যে কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমে শিল্প ও সেবা খাতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি'র ৫২ দশমিক ১ শতাংশ আসে সেবা খাত থেকে, শিল্প খাত থেকে আসে ৩৩ দশমিক ৭ শতাংশ আর কৃষি খাত থেকে আসছে মাত্র ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। প্রায় দুই দশক আগে অর্থাৎ ২০০০ সালে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ২১ দশমিক ৩ শতাংশ। আর শিল্প ও সেবা খাতের অবদান ছিল যথাক্রমে ২২ দশমিক ৯ ও ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ। কর্মসংস্থানের উৎসগুলোতে দেখা যায়, অর্থনীতিতে কৃষির অবদান কমে এলেও কর্মসংস্থানের মূল ক্ষেত্রটি এখনো কৃষি খাত। ২০০০ সালে কৃষি খাতে মোট কর্মসংস্থানের ৫১ দশমিক ৩ শতাংশ সৃষ্টি হতো; শিল্প খাতে ১৩ দশমিক ১ শতাংশ ও সেবা খাতে ৩৫ দশমিক ৬ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রম জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, বর্তমানে মোট শ্রমশক্তির ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষিতে, ২০ দশমিক ৪ শতাংশ শিল্পে আর ৩৯ শতাংশ সেবা খাতে নিয়োজিত। অর্থাৎ অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের

ফলে কর্মসংস্থানের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্য।

শ্রমবাজারে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের হার তুলনা করলে দেখা যায়, নারীরা এখনো শ্রমবাজারে অনেক কম সংখ্যায় আসছে। দশক অনুযায়ী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সালে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ ২৩ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ হয়েছিল। কিন্তু ২০১৩ সালে তা কমে ৩৩ দশমিক ৫ শতাংশে পৌঁছে। কিন্তু পুরুষের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ২০১৬-১৭ সালে ৮০ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল। পুরুষের ক্ষেত্রে অবশ্য ২০০৩ সাল থেকে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার ক্রমে কমে আসছে। বাংলাদেশের নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের চিত্রটি আরেকটু খতিয়ে দেখলে লক্ষ করা যায়, ১৫-২৯ বছর বয়স্ক নারীর ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশের শিক্ষা, কর্মসংস্থান কিংবা প্রশিক্ষণ কোথাও নেই। অর্থাৎ তারা ঘরের ভেতরে সাংসারিক কাজে নিয়োজিত। একই বয়সের পুরুষের ক্ষেত্রে এ হার ৮ দশমিক ১ শতাংশ। তাই শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও তা পুরুষের তুলনায় অনেক কম। তদুপরি অসংগঠিত খাতে নিয়োজনের পরিমাণ অনেক বেশি। শ্রম জরিপ ১৯৯৯-২০০০ অনুযায়ী, মোট শ্রম নিয়োজনের ৮৫ দশমিক ১ শতাংশ অসংগঠিত খাতে নিয়োজিত ছিল, যেখানে নারীদের পরিমাণ ছিল ৯২ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রায় দেড় দশক পর ২০১৬-১৭ সালের শ্রম জরিপে অসংগঠিত খাতে শ্রম নিয়োজনের অংশ সামান্য কমে ৮২ দশমিক ১ শতাংশ হয়েছে। এর মধ্যে নারীদের ৯১ দশমিক ৮ শতাংশ অসংগঠিত খাতে নিয়োজিত।

খাতওয়ারি ভাগ করে দেখলে প্রতীয়মান হয়, কৃষি খাত এখনো নারী শ্রম নিয়োজনের প্রধান জায়গা। নারী শ্রম নিয়োজনের ১৮ দশমিক ৩ শতাংশ হচ্ছে কৃষি খাত, ৫ দশমিক ২ শতাংশ শিল্প খাতে এবং ৭ দশমিক ২ শতাংশ সেবা খাতে। শিল্প খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়লেও সাম্প্রতিক সময়ে, বিশেষ করে ২০১৩-১৭ সালের মধ্যে মোট নারী শ্রমিক নিয়োজনের সংখ্যা কমে গেছে। এটি উদ্বেগজনক। কেননা তৈরি পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ নিয়োজিত। আশির দশকে যখন তৈরি পোশাক শিল্প খাতটি বাংলাদেশে বিকশিত হতে থাকে, তখন এ খাতে মোট শ্রমিকের প্রায় ৮০ শতাংশই ছিল নারী শ্রমিক। সিপিডি'র সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, তৈরি পোশাক শিল্প খাতে নারী শ্রমিকের অংশ কমে ২০১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৩ দশমিক ২ শতাংশ, ২০১২ সালে এ অংশ ছিল ৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ। এর কারণ হিসেবে পোশাক খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং নারী শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা

না থাকাকে প্রধান কারণ হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে পুশ ফ্যাক্টর এবং পুশ ফ্যাক্টরের মধ্যে কোনটি কতখানি কাজ করছে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। কাজের ঘণ্টা হিসাব করলে দেখা যায়, নিয়মিত বেতনভুক্ত কাজে নারীরা পুরুষের তুলনায় কম কাজ করছে। এর কারণ মূলত মেয়েদের বেতনহীন গৃহস্থালি কাজে অনেক সময় দিতে হয়। সিপিডি'র একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে নারীরা গড়ে ৭ দশমিক ৭ ঘণ্টা বেতনহীন ঘরের কাজে ব্যয় করে। আর পুরুষরা ব্যয় করে মাত্র ২ দশমিক ৫ ঘণ্টা। শ্রমবাজারে বাংলাদেশের নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও দৈনিক মজুরির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য আগের তুলনায় উন্নতি হয়েছে, অর্থাৎ মজুরিবৈষম্য সামান্য কমেছে।

গত দুই দশকে নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের চিত্রটি বিভিন্নভাবে দেখা যায়। বেশিসংখ্যক নারী ঘরে-বাইরে বেতনভুক্ত কাজ করতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে বেকারত্ব ও অর্ধবেকারত্বের হার কমে আসছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর কাজের সুযোগ ও চাহিদা দু'টিই বেড়েছে। সেই সঙ্গে নারীশিক্ষার হার বাড়ছে এবং উচ্চশিক্ষায়ও নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। তবে কিছু আবশ্যকীয় কারণ এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমে বাড়ছে। একক আয়ে পারিবারিক চাহিদাগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই নারীরা কম আয়ের কাজ হলেও সেগুলোয় নিয়োজিত হচ্ছে। প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাবে তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের এবং নীচু পর্যায়ের কাজগুলোয় অংশ নিচ্ছে। তৈরি পোশাক খাত থেকে শুরু করে প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা, করপোরেট খাত ইত্যাদির বেলায়ও এটি লক্ষণীয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিময়তা বজায় রাখতে হলে নারীদের কর্মসংস্থানের হার বাড়াতে হবে। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না পারলে প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না। এ নারীদের একটি বড় অংশ হচ্ছে তরুণ ও কর্মক্ষম। তাদের শ্রমবাজারে আনতে হলে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি খাতে বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক উদ্যোগ নিতে হবে। নারীদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি সামগ্রিক অর্থনৈতিক নীতিমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়লেও তা যথেষ্টসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছে না। আর কর্মসংস্থানবিহীন প্রবৃদ্ধি হলে তা নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে। নারীদের উচ্চশিক্ষিত করতে হবে এবং এর সঙ্গে তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমবাজারের জন্য দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে মেয়েদের অংশগ্রহণের হার ছেলে শিক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি হলেও শিক্ষার পরবর্তী ধাপগুলোয় মেয়েদের অংশ ক্রমে কমে আসে।

নারীদের জন্য দেশব্যাপী আরো বেশিসংখ্যক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সেগুলোয় তারা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, সেজন্য নিরাপদ থাকা ও চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মরত নারীদেরকে প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দিতে হবে নিয়োগকারীদের। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বেশি আয়ের কাজগুলোয় নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারছে না বলে তাদের আয় বাড়ছে না। অন্যদিকে কৃষি খাতের অবদান কমে আসার কারণে কাজের সুযোগও কমে আসছে। সেখানে প্রথমে নারীরাই সেই সুযোগটি হারাচ্ছে। গ্রামীণ অকৃষিজ অর্থনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। স্ব-নিয়োজিত নারীদের সংখ্যাও বাড়ছে। বর্তমানে প্রায় এক-চতুর্থাংশ নারী নিজেই কোনো উদ্যোগ নিয়ে আয় বর্ধনকারী কাজে নিয়োজিত। তাদের ও নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তাকে মূলধন ও অন্যান্য নীতি সহায়তা দিতে হবে। সংগঠিত ও উচ্চ আয়ের পেশাগুলোয় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো এবং তাদের ধরে রাখার জন্য ব্যক্তি খাতকে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। নিয়োগকারীদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। আগামী দিনের অর্থনীতি হবে আরো বেশি প্রযুক্তিনির্ভর। সেখানে অনেক ধরনের শ্রমের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। যাদের দক্ষতা থাকবে না, তারা শ্রমবাজার থেকে ঝরে পড়বে। নারীদের জন্য এটি হবে বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, যেহেতু তারা প্রযুক্তিগত দক্ষতায় পিছিয়ে রয়েছে। তাই তাদের এখনই প্রস্তুতি নিতে হবে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় যেমন - অর্থ, পরিকল্পনা, মহিলা শিক্ষা, শ্রম, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহন, আইন - সবাইকে একসঙ্গে সংহত হয়ে নীতিমালা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। সঠিক নীতিমালা, যথোপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মানব উন্নয়ন ব্যয় বাড়াতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর পদচারণা ক্রমে বাড়ছে। কিন্তু এখনো যথেষ্ট নয়। একে এগিয়ে নিতে হবে উপযুক্ত অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো তৈরির মাধ্যমে। কেননা বৈষম্য শুধু আয় বাড়ানোর মাধ্যমেই ঘোচানো যায় না। পরিবার, সমাজ ও কর্মক্ষেত্রে উন্নত মননশীলতা তৈরি না হলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান বাড়ানো সম্ভব নয়।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮
বণিকবার্তা

শ্রমিকেরা ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারছেন না

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

তৈরি পোশাকশ্রমিকদের জীবনযাত্রা নিয়ে গবেষণা করেছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। একই সঙ্গে তারা পোশাকশিল্পের জন্য নিম্নতম মজুরি প্রস্তাব করেছে ১০ হাজার ২৮ টাকা। তবে শ্রমিকনেতারা বলছেন, সিপিডি'র প্রস্তাব বাস্তবসম্মত হয়নি। এসব বিষয় নিয়ে প্রথম আলোর সঙ্গে গত বুধবার কথা বলেছেন সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শুভংকর কর্মকার।

প্রথম আলো: পোশাকশ্রমিকদের জীবনযাত্রা নিয়ে আপনারা গবেষণা করেছেন। তো বর্তমান মজুরিতে শ্রমিকেরা কেমন আছেন? তাঁরা কি তাঁদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: শ্রমিকেরা বর্তমানে যে আয় করেন, তার বিপরীতে ব্যয় অনেক বেশি। একজন শ্রমিকের পরিবারের গড়পড়তা মাসিক ব্যয় এখন ২২ হাজার ৪৩৫ টাকা। তার বিপরীতে শ্রমিকের আয় অর্ধেকেরও কম। এই আয় দিয়ে এককভাবে পরিবারের ব্যয় মেটানো অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য সদস্যদের আয় দিয়ে তিনি পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতেও তিনি হিমশিম খাচ্ছেন। পরিবারের ব্যয় অসম্ভব দ্রুতগতিতে বাড়ছে। মূল্যস্ফীতির চেয়েও পরিবারের ব্যয় বৃদ্ধি অনেক বেশি। তবে আমাদের গবেষণায় এসেছে, শিল্প এলাকায় মূল্যস্ফীতিজনিত ব্যয় বেশি। সে হিসেবে জাতীয় পর্যায়ের মূল্যস্ফীতি এখানে বিবেচনার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উচিত হবে শিল্প এলাকার জন্য আলাদা মূল্যস্ফীতি

হিসাব করা ও প্রকাশ করা, যেটি তারা আগে করত। আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি, ১৬ শতাংশ শ্রমিকের ঘরে ফ্যান নেই। ১৭ শতাংশ খাট ছাড়াই ঘুমান। ৪০-৪৪ শতাংশ শ্রমিকের ঘরে টেবিল-চেয়ার নেই। মাত্র ২৪ শতাংশের ঘরে ফ্রিজ আছে। ৬৫ শতাংশের ঘরে টেলিভিশন রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশের ঘরেই এখনো এই সুবিধাগুলো পৌঁছায়নি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শ্রমিকেরা ওপরের অথবা নিচের যে গ্রেডেই কাজ করুন না কেন, তাঁদের ব্যয়কাঠামো মোটামুটি অভিন্ন। তাতে বোঝা যায়, উচ্চ কিংবা নিম্ন গ্রেডের শ্রমিকেরা যে মজুরি পান, তা দিয়ে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারেন না। তা ছাড়া নতুন যে বিষয়টি আমরা আবিষ্কার করলাম সেটি হচ্ছে দৈনন্দিন প্রয়োজনের ব্যয় মেটাতে শ্রমিকের বড় পরিমাণ ঋণ করতে হয়। এটি তাঁদের খাদ্যবহির্ভূত মোট ব্যয়ের ২২ শতাংশ। এখান থেকে বোঝা যায়, তাঁদের আয় পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণেই অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মেটাতে হচ্ছে। ২০১০ ও ২০১৩ সালে শ্রমিকের মজুরি সমন্বয়ের পরও নিম্নতম জীবনমান নিশ্চিত হচ্ছে না। এতেই বোঝা যায়, মজুরি ব্যাপক হারে সমন্বয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথম আলো: এই যদি শ্রমিকদের অবস্থা হয় তাহলে মালিকেরা মজুরি বাড়ানোর যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেটি কতটা বাস্তবসম্মত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: আমার কাছে মনে হয়, মালিকদের এ ধরনের প্রস্তাব দেওয়াই উচিত হয়নি। বরং যৌক্তিক বিচারে যেসব মানদণ্ডে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের কথা বলা হচ্ছে, সেই মানদণ্ডে প্রস্তাবের চেয়ে বেশি মজুরি আসার কথা। তাই মালিকেরা অনেক কম প্রস্তাব দিয়ে শ্রমিকদের প্রয়োজনগুলোকে অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করছেন।

প্রথম আলো: আপনারা তো নিম্নতম মজুরি ১০ হাজার ২৮ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করেছেন। সেটি কি বাস্তবসম্মত হয়েছে?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিপিডি পুরো বিষয়টিকে যৌক্তিক ও ন্যায্যতার জায়গা থেকে দেখে থাকে। সিপিডি'র সংলাপে যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে, তার ভেতরে শ্রমিকের জীবনমান নিয়ে গবেষণাকে সবাই প্রশংসা করেছে। অর্থাৎ জীবনমানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, সেটিকে প্রকৃত চিত্র বলে সবাই স্বীকার করেছেন। সিপিডি জীবনমানের ভিত্তিতেই মজুরি কাঠামোয় আলোকপাত করেছে। এ ক্ষেত্রে দু'টি অংশ ছিল, তার মধ্যে একটি হচ্ছে বর্তমান মজুরিকাঠামোর অসামঞ্জস্য ও অন্যটি ভবিষ্যতের জন্য একটি প্রস্তাব দেওয়া। অসামঞ্জস্যের ভেতরে সিপিডি দেখিয়েছে, আগের মজুরিকাঠামোতে বিভিন্ন গ্রেডে মজুরি বৃদ্ধির হার কম ছিল,

মূল বেতনের অংশ কমানো হয়েছে। এর ফলে ওভারটাইম ও বোনাসের হার কমে গেছে। পাশাপাশি নতুন কাঠামো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিপিডি'র প্রস্তাবে শ্রমিকদের পরিবারের ব্যয় বিবেচনা শিশু বা শিক্ষা ভাতার প্রবর্তন, যাতায়াত ভাতা, মূল বেতনের ৩ শতাংশ হিসেবে সার্ভিস বেনিফিট ও পদোন্নতির সঙ্গে দক্ষতা অনুসারে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নতম মজুরি ১০ হাজার ২৮ টাকা প্রস্তাব করা হলেও আমরা মনে করি, যে পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কম থাকে, তার জন্য এই কাঠামোটি পর্যাপ্ত নয়। আমরা প্রত্যাশা করব, আমাদের প্রস্তাবের সঙ্গে শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধির প্রস্তাব মিলিয়ে মজুরি বোর্ড আলোচনা করবে। তা ছাড়া শ্রমিকদের প্রয়োজনের একটা অংশের দায়দায়িত্ব সরকারের নেওয়া দরকার। বিশেষ করে স্বল্প খরচে বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে শ্রমিকেরা তাঁদের বাড়তি ব্যয় সমন্বয় করতে পারবেন।

প্রথম আলো: নিম্নতম মজুরি বোর্ডে কম মজুরি প্রস্তাব করার বিষয়ে মালিকপক্ষের একটি যুক্তি ছিল, প্রতিযোগী অন্য দেশের চেয়ে আমাদের শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলক কম, ৪০ শতাংশ। আপনারা গবেষণায় কী পেয়েছেন?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: সিপিডি'র গবেষণায় দেখা গেছে, পোশাকশ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়েছে। এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার বড় ভূমিকা রেখেছে। সব মিলিয়ে শ্রমিকদের দক্ষতা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫ শতাংশ। এ ক্ষেত্রে ওভেন ও নিট কারখানায় তেমন পার্থক্য নেই। বাড়তি উৎপাদনশীলতা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

প্রথম আলো: শ্রমিকনেতাদের অভিযোগ, প্রতিবারই মালিকেরা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের সময় নানা অজুহাত দেন। এটি কীভাবে বন্ধ করা যায়?

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম: ন্যূনতম মজুরির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকা এবং জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত না থাকার বিষয়টি নানা কৌশলে ব্যবহার করা হয়। শ্রমিকদের প্রস্তাব অনেকটা বাস্তবানুগ হলেও মালিকদের প্রস্তাবে যৌক্তিকীকরণের সুযোগ থাকে। মালিকেরা যদি উৎপাদনশীলতা ও পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ করেন, তা হলে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যায়। এর সঙ্গে ক্রেতাদেরও যুক্ত করা যায়।

১১ আগস্ট ২০১৮
প্রথম আলো

নতুন মজুরি কাঠামো আগের চেয়ে বেশি দুর্বল হয়েছে

খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম

প্রথমত, মজুরির যে সমন্বয়টা হয়েছে, সেটি শ্রমিকদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। শ্রমিকদের যে প্রত্যাশা, বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি সিপিডি'রও যে প্রস্তাবনা ১০ হাজার ২৮ টাকা, তারও অনেক নিচে ৮ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। এটি আরো ঊর্ধ্বে সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। যেহেতু এখনো এটি প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে, মজুরি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এখনো আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং ও প্রজ্ঞাপন হিসেবে জারির কিছু পর্যায় রয়েছে; আমার মনে হয়, এখনো সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে। এর আগেও আমরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মজুরি বৃদ্ধির উদাহরণ দেখেছি। এ পর্যায়েও তাই প্রত্যাশা করব যে, শ্রমিকদের ন্যূনতম চাহিদার নিরিখে ১০ হাজার ২৮ টাকার আমাদের যে প্রস্তাব, সেটিও বিবেচনায় নিয়ে সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে যেন হস্তক্ষেপ করা হয়। বৈশ্বিক ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কম্বোডিয়ায় নির্বাচনের বিষয়টি মাথায় রেখে দেশটির সরকার তাদের শ্রমিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়েছে। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও নির্বাচনের বছর শ্রমিকদের বিষয়টিকে যদি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলেও এখানে সমন্বয়ের সুযোগ আছে। পাশাপাশি সরকার ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে যতটা ছাড় দিয়ে থাকে, সে বিবেচনায় ন্যূনতম মজুরি আরো উপরে সমন্বয়ের যৌক্তিকতা রয়েছে। আরেকটা বিষয় হলো, এবারের মজুরি কাঠামোটি আগের কাঠামো থেকে

আরো বেশি দুর্বলতর হয়েছে। কারণ মূল মজুরি আগের চেয়েও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের ওভারটাইম বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
বণিকবার্তা

অধ্যায় ৮

বৈষম্য ও বিভাজন

বৈষম্য কমানোই আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ও অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য প্রথম আলোর সঙ্গে কথা বলেছেন বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সামর্থ্য অর্জন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ ও দেশের অর্থনীতির সামনের দিনগুলোর নানা দিক নিয়ে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এ কে এম জাকারিয়া।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার সামর্থ্য অর্জন করেছে। এই সাফল্যকে কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: বাংলাদেশের জন্য এটি এক বিরাট অর্জন। বলা যায় সমসাময়িক উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় এটি এক অনন্য ঘটনা। ১৯৭১ সালে যখন স্বল্পোন্নত দেশের ধারণার উদ্ভব ঘটে, তখন শুরুতে ২৪টি দেশ এই তালিকায় ছিল। তা পরে সর্বোচ্চ ৫২ টিতে দাঁড়ায়। এই দেশগুলোর তালিকা থেকে মাত্র পাঁচটি দেশ বের হতে পেরেছে। দেখা যাবে, যে দেশগুলো বের হয়েছে তা খুব ছোট ছোট দেশ, ভূ-আবদ্ধ বা দ্বীপরাষ্ট্র। সেসব দেশের হয় প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে অথবা পর্যটনের স্থান হিসেবে খুবই আকর্ষণীয়। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য অর্থনীতির আকার ও জনসংখ্যার বিচারে বাংলাদেশই প্রথম বিবেচনাযোগ্য দেশ। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক তিনটি সূচকের মধ্যে দু'টি সূচকে নির্ধারিত মাত্রা পূরণ করলেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার জন্য বিবেচনাযোগ্য হতাম, কিন্তু আমরাই

প্রথম দেশ যে তিনটি সূচকেই লক্ষ্য পূরণ করেছি। সূচক তিনটি হচ্ছে মাথাপিছু জাতীয় আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা।

প্রথম আলো: উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক উত্তরণের জন্য আমাদের অপেক্ষাটা কত সময়ের?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আগেই বলেছি, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার জন্য যে তিন গুচ্ছ পরিমাপক থাকে, বাংলাদেশ তা পূরণ করতে পেরেছে। এখন আরও তিন-তিন ছয় বছর পর্যবেক্ষণের মধ্যে থাকব আমরা। সব ঠিক থাকলে ২০২৪ সালে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হয়ে যাব। অনেকে এ প্রসঙ্গে ২০২১ সালের কথা বলেন, তা ঠিক নয়। উপরন্তু মধ্যম আয়ের দেশ ও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে অনেকে গুলিয়ে ফেলেছে। একসময় আমরা ঠিক করেছিলাম যে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব। কিন্তু ২০১৫ সালেই আমরা সেই লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি।

প্রথম আলো: তার মানে একটি অর্জন আমাদের হয়ে গেছে এবং কাছাকাছি সময়ে আমরা দ্বিতীয়টিও অর্জন করতে যাচ্ছি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ঠিক তাই। কাছাকাছি সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির দু'টি উত্তরণের ঘটনা ঘটছে। এটিও একটি অনন্য ঘটনা। তবে দু'টির তাৎপর্য ভিন্ন। একটি হচ্ছে আয়ের ভিত্তিতে এবং এই হিসাবটি বিশ্বব্যাংক করে থাকে। অন্যটি আয়ের পাশাপাশি মানবসম্পদের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে করা হয়ে থাকে এবং তা করে জাতিসংঘ। এবং দ্বিতীয়টার গ্রহণযোগ্যতা বেশি। তবে এখানেও কিছু সমালোচনার দিক রয়েছে। যেমন অর্থনীতির সব দিক এতে ধরা পড়ে না। শিল্পায়নের দিকটি নেই। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এটি উন্নয়নের বড় মাত্রা। আধুনিক উন্নয়নের ধারণায় সুশাসনের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এখানে তা বিবেচনায় নেওয়া হয় না।

প্রথম আলো: স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক পর্ব গেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় গেছে। আমাদের এই অর্জন কি ধারাবাহিক উদ্যোগের ফল, নাকি বিশেষ কোনো দল বা সরকারের উদ্যোগের ফল?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ১৯৭৫ সালে যখন আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় ঢুকেছি, তখন থেকেই আমাদের এ থেকে বের হওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আজকের অর্জন আসলে

চার দশকের চেষ্টার সম্মিলিত ফল। প্রতি দশকে ১ শতাংশ হারে ধারাবাহিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন সরকার ক্ষমতায় থাকলেও মানবসম্পদ উন্নয়ন, রফতানিমুখী শিল্পের প্রসার, কৃষি খাতের গুরুত্ব, ভৌত অবকাঠামোর সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে একধরনের নীতিগত ধারাবাহিকতা ছিল।

প্রথম আলো: গত এক দশকের উন্নয়নকে কীভাবে দেখছেন?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: এটি মানতেই হবে যে গত ১০ বছরে উন্নয়নের ত্বরণ নতুন মাত্রা পেয়েছে। এ কারণেই স্বাধীনতার অর্ধশত বার্ষিকী-২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম। আপনাদের মনে থাকার কথা যে ২০০৬ সালে সিপিডি'র উদ্যোগে নাগরিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে 'রূপকল্প ২০২১' প্রণয়ন করা হয়েছিল। পরে আওয়ামী লীগের ২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে এবং ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনায় অনুরূপ লক্ষ্য স্থান পায়। আগেই বলেছি, এ জন্য লক্ষ্য হিসেবে যে সময়সীমা আমরা নির্ধারণ করেছিলাম, তার ছয় বছর আগেই আমরা তা অর্জন করেছি।

প্রথম আলো: মধ্য আয়ের দেশের লক্ষ্য দ্রুত অর্জিত হলো কিসের উপর ভিত্তি করে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: সাধারণভাবে বলা যায়, প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার, রেমিট্যান্স প্রবাহ বেগবান থাকা এবং টাকার মূল্যমান স্থিতিশীল থাকা - এসব কারণেই তা সম্ভব হয়েছে।

প্রথম আলো: এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখার পথ?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে নীতিকাঠামোতে এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে হবে, বিশেষ করে প্রয়োজন অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন। যেমন আমাদের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান কমছে। কিন্তু কৃষি খাত থেকে বা এই খাতের সঙ্গে যুক্ত লোকজন একই গতিতে কিন্তু অন্য খাতে যেতে পারছে না। তাদের শিল্প খাতে অথবা প্রাগ্রসর সেবা খাতে যুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। অর্থনীতির মূল ভিত্তি বিবেচনায় নিলে শিল্প ও অবকাঠামোর দিক থেকে দেশ কিছুটা এগিয়ে আছে। যদিও কর্মসংস্থানের হার কম। আগের উন্নয়নকে সামনে নিয়ে যেতে হলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সংহতি ও গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষার বিষয়টি খুবই জরুরি।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার সামর্থ্য অর্জন করেছে, কিন্তু এ জন্য বাংলাদেশকে আরও ছয় বছর অপেক্ষা করতে হবে। এই ছয় বছরের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলো কী কী?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ক্ষেত্রেই কিছু ঝুঁকি সামাল দিতে হতে পারে। কিছু বৈরী আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। ২০০৮-০৯ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার ফলে এখনো বিনিয়োগ বাড়ছে না। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংঘাত ও সহিংসতা বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। বিশ্বব্যাপী অভিবাসী সমস্যার কারণে আন্তর্জাতিক অনুদান তথা সহায়তা সেই দিকেই যাবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বিভিন্নমুখী প্রবণতা বিশ্বকে উৎকণ্ঠায় রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সংরক্ষণবাদী বাণিজ্যনীতির কারণে বাজারসুবিধা কমতে পারে। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকবে। এ ছাড়া জলবায়ুর উষ্ণায়নের কুপ্রভাব রয়েছে। রয়েছে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। অন্যদিকে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল, তুলা, সার ও চালের কম দাম থাকায় বাংলাদেশ কিছুটা সাশ্রয়ও পেতে পারে।

প্রথম আলো: স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটলে বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা কমে যাবে। এই পরিস্থিতি আমরা সামাল দেব কীভাবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: কেপ ভার্দে বা বতসোয়ানার মতো যে সমস্ত দেশ এরই মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে, সেই দেশগুলোতে বৈদেশিক অনুদান কমে গেছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা-ই হবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাও কমে যাবে। তখন অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে কর আহরণ বাড়াতে হবে। অর্থাৎ, করের আওতা বাড়াতে হবে। রফতানির ক্ষেত্রে নতুন পণ্য বা বহুধাকরণ লাগবে। শুধু তৈরি পোশাকের উপর নির্ভরশীল থাকলে হবে না। বিনিয়োগযোগ্য যে অর্থ বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে, তা ঠেকাতে হবে। বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে। কিন্তু বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সূচক খুবই দুর্বল। নীতিকাঠামো, অবকাঠামো বা দক্ষ ব্যবস্থাপনা - এসব যা-ই বলা হোক না কেন, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাৎক্ষণিক প্রণোদনার চেয়ে মধ্য মেয়াদে দেশটি কতটুকু স্থিতিশীল, সেটিকেই বেশি বিবেচনায় নেয়।

প্রথম আলো: বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হয়েছে, সামনে উন্নয়নশীল দেশ হবে - তখন দেশ হিসেবে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে কী কী চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: দ্বৈত উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে তিন ধারার সূচক পূরণ করতে হবে। একদিকে রয়েছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের সূচকগুলো। এর উপর বৈশ্বিক উন্নয়ন কর্মসূচির বা এসডিজি'র অভীষ্টের নতুন তালিকা পূরণ করতে হবে। শুধু প্রবৃদ্ধি হলে বা শিল্পায়ন হলে হবে না, তা সুষম, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন হতে হবে। সরকারের তথ্য অনুযায়ী ২০১০-১৫ সময়কালে দেশে মানুষের মধ্যে ভোগবৈষম্য বেড়েছে, কিন্তু তার থেকে বেশি বেড়েছে আয়বৈষম্য। আরও বেশি বেড়েছে সম্পদের বৈষম্য। একটি ব্যাপক ও গভীর বৈষম্যপূর্ণ সমাজে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার টেকসই করা যায় না। আমি মনে করি, এই পরিস্থিতি মোকাবেলাই হচ্ছে আগামী দিনগুলোর মূল চ্যালেঞ্জ।

প্রথম আলো: এটি দেখা যাচ্ছে যে আগে যেসব দেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে, তারা দীর্ঘ সময় ধরে এই কাতারেই রয়ে যাচ্ছে। এই পর্ব থেকে পার হয়ে উন্নত দেশ হতে পারছে না। এখানে সমস্যাটি কোথায়?

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আসলে বাংলাদেশকে আমরা মধ্য মেয়াদে কোথায় নিয়ে যেতে চাই, তা মাথায় রেখে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা দেখছি যে মধ্য দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ দীর্ঘ সময় ধরে মধ্যম আয়ের পর্যায়ে আটকে আছে। এর পেছনের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জনগণকে যথাযথ ও উচ্চমানের পৌর ও নাগরিক সুবিধা দিতে না পারা, যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে না পারা, মানসম্মত মানবসম্পদ তৈরি করতে না পারা, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বৃদ্ধি। তাদের রয়েছে সামাজিক সংহতি বা সামাজিক পুঁজির অভাব, তদুপরি আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সুশাসনের প্রকট ঘাটতি। ফলে সামনে এগোতে হলে এই দিকগুলোতে আমাদের নজর দিতে হবে।

প্রথম আলো: আমরা তো ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। এটি কতটুকু বাস্তবসম্মত? চীন, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া বা মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলো এখনো উন্নয়নশীল দেশের কাতারে রয়ে গেছে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: ২০৪১ সালে উচ্চ আয়ের দেশে (যাকে অনেকেই উন্নত দেশ বলছেন) পরিণত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের দু'টি দিক আছে। একটি অর্থনৈতিক বাস্তবতা, অন্যটি রাজনৈতিক উদ্যম। 'মধ্য আয়ের ফাঁদ'কে পাশ কাটিয়ে অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধি সমুন্নত রাখা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পক্ষেই সম্ভব হয়নি। ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে (মাথাপিছু জাতীয় আয় সাড়ে ১২

হাজার মার্কিন ডলার) পরিণত হতে হলে বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চ প্রবৃদ্ধির হারকে আরও বেগবান করে আগামী ২৪ বছর ধরে রাখতে হবে। আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে আমরা ভালো করছি - এ রকম একটি স্বীকৃতি আমরা পেয়েছি। একে কাজে লাগিয়ে যদি নতুন বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সমাবেশ করতে পারি, কম সুদে বৈদেশিক ঋণ নিতে পারি, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারি, অভ্যন্তরীণ কর আদায় বাড়াতে পারি, তাহলে একটি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হয়। বিকাশমান মধ্যবিত্তের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য ও সেবা তৈরি করতে পারি, যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সংকট নিরসন করতে পারি এবং আয় ও সম্পদবৈষম্যকে আটকাতে পারি, তাহলে ইতিহাসের ধারা বদলানো সম্ভব। জাতীয় স্পৃহা, গণ-উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব - এসব কিছু মিলিত হলেই তো ইতিহাসের ধারা বদলায়।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: আপনাকেও ধন্যবাদ।

০১ এপ্রিল ২০১৮
প্রথম আলো

বৈষম্য পুরো সমাজ ব্যবস্থায় বিভাজন তৈরি করে, যা অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়

ফাহমিদা খাতুন

নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। অর্থনীতিতে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন, যুক্তরাজ্য থেকে। পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করেছেন কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে। ভিজিটিং ফেলো ছিলেন নরওয়ের ক্রিশ্চিয়ান মিখেলসেন ইনস্টিটিউট, দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া ইনস্টিটিউট ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোনমিকস অ্যান্ড ট্রেড ও ভারতের সেন্টার ফর স্টাডি অব সায়েন্স, টেকনোলজি অ্যান্ড পলিসিতে। বিআইডিএস-এ রিসার্চ ফেলো, ইউএনডিপিতে পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও ইউএসএআইডিতে অর্থনীতিবিদ হিসেবে কাজ করেছেন। দেশ-বিদেশের বহু জার্নালে তার গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয়বৈষম্য বৃদ্ধি, মজুরি, বিনিয়োগসহ নানা বিষয়ে বণিক বার্তার সঙ্গে কথা হয় এ অর্থনীতিবিদের।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রুহিনা ফেরদৌস।

এসডিজি অর্জনে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কী সম্ভব?

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অংশ হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য পুরোপুরিভাবে দূর করতে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা অনেক দেশের জন্যই কঠিন হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপে আমরা দেখছি, আমাদের দেশে দারিদ্র্য কমছে ঠিকই, কিন্তু যে গতিতে কমছে, সেখানে এক ধরনের ধীরাবস্থা তৈরি হয়েছে। যেমন - ২০১০ সালে যেখানে

দারিদ্র্যসীমার নিচে জনসংখ্যা ছিল ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৪ দশমিক ৩ শতাংশ। কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের গতি মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। সেক্ষেত্রে আমরা যদি দারিদ্র্য দূরীকরণের হারের মধ্যে একটি গতিময়তা আনতে না পারি, তাহলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কিত এসডিজি'র সম্ভব হবে না। সেজন্য আমাদের আয়বর্ধক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বেশি করে বিনিয়োগ দরকার। এক্ষেত্রে যে ধরনের বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়, সেদিকে মনোযোগী হতে হবে। গত চার দশকে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোয় এক ধরনের পরিবর্তন এসেছে। যেমন - কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে ক্রমান্বয়ে আমরা শিল্প ও সেবা খাতনির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছি। অর্থনীতি যখন এগিয়ে যায়, তখন সেখানে এ ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন হয়। তবে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল রাখতে হয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে কি না এবং মানুষের আয় বাড়ছে কি না। কৃষি খাত থেকে বর্তমানে জিডিপি'র মাত্র ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ আসে। অথচ সেখানে মোট শ্রমশক্তির প্রায় ৪৪ শতাংশ নিয়োজিত। অর্থাৎ সেখানে উদ্বৃত্ত শ্রম রয়েছে এবং তারা সারা বছর কাজ পান না। অন্যদিকে আমাদের অর্থনীতির প্রায় ৫২ শতাংশ সেবা খাত থেকে আসে। কিন্তু সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। আর্থিক খাত, তথ্য-প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন, ট্যুরিজম ইত্যাদি খাতের আরো প্রসার ঘটাতে হবে।

আয়বৈষম্য বেড়েছে। এটি কমানোর সহজ কোনো পথ আছে কি?

আমাদের অর্থনীতি এগোচ্ছে। মাথাপিছু আয় বাড়ছে। প্রবৃদ্ধির সংখ্যাগত দিক থেকে আমরা খুব ভালো করছি। আমাদের প্রতিবেশী দেশ কিংবা স্বল্পোন্নত দেশের মধ্যে এমন উদাহরণ বিরল। কিন্তু প্রবৃদ্ধির যে গুণগত দিক, যেমন প্রবৃদ্ধির সুফল সবার মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হচ্ছে কি না, সেটিই দেখার বিষয়। বর্তমানে উচ্চবিত্তদের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হচ্ছে। বিবিএসের খানা জরিপ অনুযায়ী, ২০১৬ সালে উপরের ৫ শতাংশ লোকের হাতে মোট দেশজ আয়ের ২৭ দশমিক ৯ শতাংশ রয়েছে, যা ২০১০ সালে ছিল ২৪ দশমিক ৬ শতাংশ। অন্যদিকে নিচের ৫ শতাংশ লোকের আয় ২০১০ সালের শূন্য দশমিক ৭৮ শতাংশ থেকে কমে ২০১৬ সালে শূন্য দশমিক ২৩ শতাংশ হয়েছে। আয়বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয় ভোগের বৈষম্য, সম্পদের বৈষম্য, ও সুযোগের বৈষম্য। এ থেকে তৈরি হয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য। সম্পদ আমাদের দেশে ক্ষমতার সহায়ক অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে। সেজন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিত্তশালীদের প্রভাব বাড়ছে। আয়বৈষম্য থেকে পুরো সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে

যে বিভাজন সৃষ্টি হয়, তা অর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনতে পারে না। বৈষম্য থেকে জন্ম নেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সবার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে না পারছি এবং সব ধরনের বৈষম্য লাঘব করতে না পারছি, ততক্ষণ উচ্চপ্রবৃদ্ধি তাৎপর্যপূর্ণ হবে না। আমাদের স্বাধীনতার মূল যে উদ্দেশ্যগুলো ছিল, তার মধ্যে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূর করা ছিল অন্যতম। এ লক্ষ্যে আমরা কতদূর আসতে পেরেছি, তা এখন দেখার সময় হয়েছে।

টেকসই ও দৃশ্যমান দারিদ্র্য নিরসনে করণীয় কী হতে পারে?

এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান তৈরির দিকে নজর দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষার্থীরা পাস করে বের হচ্ছেন, তাদের মধ্যেও বেকারত্বের সংখ্যা অনেক বেশি। অনেকেই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছেন। আমাদের শ্রমশক্তির প্রায় ৮৫ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। তাদের কাজগুলো সংগঠিত নয়। এ কাজগুলো নিম্ন আয়ের। এ ধরনের কাজের নিশ্চয়তা থাকে না। টেকসই উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। যে কাজের উপার্জন দিয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো মেটানো সম্ভব হবে, তাই উপযুক্ত কাজ। আমাদের অর্থনীতির আকার বাড়ছে। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা অনুযায়ী অর্থনীতির আকার বড় নয়। তাই সবাইকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য শিক্ষিত ও স্বল্পশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে স্বনিয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে তাদের জন্য স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে, যা তারা ছোট ও মাঝারি ব্যবসার মূলধন হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে।

আমাদের দারিদ্র্য পরিমাপ পদ্ধতি কতটা কার্যকর বলে মনে করেন?

দারিদ্র্য পরিমাপের বিষয়টি দীর্ঘদিন থেকেই একটি বিতর্কিত বিষয়। এ বিতর্ক সারা বিশ্বে। মূলত দু'টি ধারায় এ বিতর্কটি প্রবাহিত হয়। অনেক বিশ্লেষক বলেন যে, দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য যে জরিপগুলো পরিচালনা করা হয়, সেগুলোয় সঠিক তথ্য আসে না। কারণ সেগুলোয় যে লোকগুলো তথ্য দেয়, তারা সাধারণত তাদের আয় বা ভোগের পরিমাণ কম করে বলে। আবার আরেকটি ধারার বিশ্লেষকরা বলেন যে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্র্যের মানদণ্ড কম করে রাখে এবং দারিদ্র্য কমানোটা বেশি করে দেখাতে চায়। অনেক দিন থেকে মাথাপিছু আয় ১ দশমিক ২৫ ডলারকে দারিদ্র্যরেখা ধরা হচ্ছে। অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক এ আয়ের নিচের মানুষটি দরিদ্র। মাথাপিছু দৈনিক ২ ডলারকে দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা যখন

মাথাপিছু ২ ডলার ধরে দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণ করব, তখন অনেকেই এ দারিদ্র্যরেখার নিচে পড়ে যাবে এবং দরিদ্র জনগণের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই এক্ষেত্রে অনেকের অনীহা রয়েছে। কেননা তখন অনেক আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হবে না।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলভেদেও তো দারিদ্র্য হারের তারতম্য রয়েছে।

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয়। অঞ্চলভেদে দারিদ্র্যের তারতম্য রয়েছে। গ্রাম ও শহরে দারিদ্র্যের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিম এলাকায় দারিদ্র্য বিভাজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোয় যেমন - ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে দারিদ্র্যের হার পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলো যেমন - বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহীর তুলনায় কম। দারিদ্র্যের হার কমানোর ক্ষেত্রেও পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলো পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর চেয়ে এগিয়ে। আঞ্চলিক বৈষম্য রয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ বণ্টনের অভাব। যেসব জেলা পিছিয়ে রয়েছে, তাদের জন্য একই পরিমাণ সম্পদ বণ্টন করলে চলবে না। তাদের এগিয়ে আনতে হলে অর্থের বরাদ্দ ও সুযোগ-সুবিধা একটু বেশি পরিমাণে দিতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব উল্লেখযোগ্য। এলাকার জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেটি নিতে পারছেন কি না এবং সঠিকভাবে তা ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, সে বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

ইউরোপ-আমেরিকার রফতানি বাজারে বাংলাদেশের আধিপত্য ধরে রাখা ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া হলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প সমস্যায় পড়বে। আপনার পর্যবেক্ষণ কী?

প্রতিযোগিতা সবসময়ই ছিল এবং সামনেও থাকবে। আমাদের দেশের তুলনায় অন্য দেশগুলো যদি উৎপাদন খরচ কমিয়ে সুলভে পণ্য সরবরাহ করতে পারে, তাহলে ক্রেতারা তাদের কাছেই যাবে। প্রশ্ন হচ্ছে, কমপ্লায়েন্সের জন্য আমাদের যে খরচ বাড়ছে, সেটিকে আমরা কীভাবে পুষিয়ে নেব? এক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর বিকল্প নেই। চীনের মতো উৎপাদনশীল হতে হলে শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন করতে হবে। তখন শ্রমিকের বেতন বাড়লেও আমরা প্রতিযোগী হতে পারব, যেহেতু শ্রমিকপ্রতি উৎপাদন বাড়বে। এটি স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের জন্য বিশ্বের বাজার পরিস্থিতি আগের মতো আর থাকবে না। সুযোগ-সুবিধাগুলো ক্রমে কমে যাবে। প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই আমাদের টিকে থাকতে হবে। আগামী ছয় বছর পর ২০২৪ সালে আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে চলে যাব। চলতি বছর এ প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে। তারপর আরো তিন বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত আমরা পর্যবেক্ষণে থাকব। ততদিন

পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশের প্রাপ্য সুবিধাগুলো আমরা পাব। কিন্তু তারপর স্বল্পোন্নত দেশের সুযোগ-সুবিধাগুলো আমরা আর পাব না। উন্নয়নশীল দেশের জন্যও কিছু সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, যেমন - আমাদের পণ্যের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাওয়ার জন্য জেনারেলাইজড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স প্লাস বা 'জিএসপি প্লাস' পাব। কিন্তু সেক্ষেত্রে অনেক শর্ত থাকবে। যেমন - কর্মপরিবেশ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচনে সাফল্য, নারীর ক্ষমতায়ন, কার্বন নিঃসরণ কমানো ইত্যাদি। তাই আমাদের প্রতিযোগীসক্ষম হতে হবে। প্রতিযোগীসক্ষম হওয়ার জন্য অবকাঠামোগুলোর উন্নয়ন প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। উপযোগী রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি প্রণয়ন করতে হবে। সুযোগ-সুবিধা চলে গেলেও বাজার ধরে রাখা সম্ভব হবে প্রতিযোগীসক্ষম হওয়ার মাধ্যমে।

পোশাক ব্যবসায়ীরা বলছেন, রফতানির অবস্থা ভালো নয়। মজুরি বৃদ্ধি পেলে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ তাদের মোকাবেলা করতে হতে পারে?

জীবনধারণের জন্য শ্রমিকদের উপযোগী মজুরি দিতেই হবে। এটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কমপ্লায়েন্সের অংশ। আমরা যদি অন্য সব নিয়মনীতি ও শর্ত পূরণ করতে পারি, তাহলে শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি দিতে পারব না কেন? আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকতে হলে এটি পূরণ করতে হবে। উৎপাদন খরচ বাড়ার অনেক কারণ রয়েছে। যেটি আগেই বলেছি। সুতরাং শুধু মজুরি বৃদ্ধিকেই উৎপাদন খরচ বাড়ার কারণ ভাবলে চলবে না।

দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ বৃদ্ধির কারণ কী?

ঋণখেলাপির মাধ্যমে অর্থ আত্মাসৎ করার প্রক্রিয়াটি নতুন নয়। তবে বর্তমানে আত্মসাৎকারীর সংখ্যা ও অর্থের পরিমাণ দু'টিই বেড়েছে। সৎ উপার্জনকারীদের জন্য এটি নিরুৎসাহজনক। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না করলে এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ঋণখেলাপি হওয়ার সংস্কৃতি বেশি দিন চললে কেউ আর বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন না। কেননা উচ্চসুদে নেওয়া অর্থ এবং সহজলভ্য অর্থ একই বাজারে প্রতিযোগিতা করলে সহজে পাওয়া অর্থ বিনিয়োগ করলেই লাভ বেশি হবে, যেহেতু এ অর্থের জন্য কোনো সুদ দিতে হয় না। এখানে অসম প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

আর বিদেশি বিনিয়োগের বিষয়ে বলতে চাই, আমাদের দেশের অবস্থা এমন হয়নি যে, এখানে বিনিয়োগের আর কোনো সুযোগ নেই, তাই দেশের বাইরে বিনিয়োগ করতে

হবে। আমাদের ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ তো বাড়ছেই না। জিডিপি'র অংশ হিসেবে ব্যক্তি খাতের বিনিয়োগ ২৩ শতাংশের মধ্যে আটকে রয়েছে। তাদের কীভাবে দেশে বিনিয়োগে আগ্রহী করা যায়, সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে। বিনিয়োগ হলে আমাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হবে। দেশের ভেতরে বিনিয়োগের ক্ষুধা থাকতে বিদেশে বিনিয়োগের আগ্রহের বিষয়টিকে সমর্থন করা যায় না। দেশে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে যে আস্থাহীনতা রয়েছে, তা দূর করা জরুরি।

সরকার কীভাবে রাজস্ব আয় আরো বাড়াতে পারে?

একদিকে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, অন্যদিকে কর ফাঁকি রোধ করতে হবে। করযোগ্য ব্যক্তিদের করজালের আওতায় নিয়ে আসার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। সবার মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। কর দেওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে কর দেওয়া নিয়ে ভুল ধারণা ভাঙতে হবে। সৎ করদাতাদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। রাঘব বোয়াল ও ক্ষমতাশালীদের কাছ থেকে কর আদায় করা কষ্টকর। এদের কাছ থেকে কর আদায়ের জন্য যারা কাজ করছেন, তাদের প্রশাসন ও নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকে নৈতিক সমর্থন দিতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি কর আদায় ব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ালে রাজস্ব আয় অনেক বাড়বে।

বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হওয়ার মানদণ্ডগুলো পূরণ করেছে। উন্নয়নশীল দেশ হলে কী সুবিধা হবে?

বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে। মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ সূচক ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক - এ তিনটি পূরণ করে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হতে চলেছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতারই পরিচায়ক। সুতরাং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আমাদের দেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবেন। বিদেশি বিনিয়োগের সঙ্গে আসবে আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতা। এতে আমাদের সক্ষমতা বাড়বে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। আমাদের ঋণমান বাড়বে। তখন আন্তর্জাতিক আর্থিক বাজার থেকে ঋণ নেওয়ার সুযোগ বাড়বে। তবে সুযোগের পাশাপাশি যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে - শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা হারানো, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন - বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে স্বল্পসুদে ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ পাওয়া কিংবা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ওষুধের পেটেন্ট করার বর্ধিত সময়সীমা পাওয়ার মতো সুবিধাগুলো চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এখন থেকেই তৈরি হতে হবে। সামগ্রিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা

বাড়ানো, পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করা, সেবার মানোন্নয়ন, দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তিগুলোয় সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি দমন এবং সর্বোপরি সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সামনের দিনগুলোয় আমাদের টিকে থাকতে হবে।

০৩ এপ্রিল ২০১৮
বণিক বার্তা

সিপিডি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গণমাধ্যমের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রক্ষা করে আসছে। নীতি গবেষণার ফলাফলকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের যে অগ্রণী ভূমিকা আছে তা স্বীকৃত সত্য। এ কারণে সিপিডি'র গবেষকরা গণমাধ্যমে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে কলাম লিখে, সাক্ষাৎকার প্রদান করে ও মন্তব্য দিয়ে নীতি গবেষণার জটিল বিষয়গুলোকে সহজবোধ্যভাবে সাধারণ জনগণের কাছে উপস্থাপন করে থাকে। বর্তমান গ্রন্থটি ২০১৭-১৮ সালে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত মতামতের একটি সংকলন।

২০১৭-১৮ সালে সিপিডি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হতে বাংলাদেশের উত্তরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের করণীয় ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করেছে। এলডিসি সংক্রান্ত গবেষণায় প্রধানত এলডিসি হতে মসৃণ রূপান্তরের জন্য কী করণীয়, উন্নয়নের পরবর্তী ধাপের চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবেলায় নতুন ধরণের সক্ষমতা অর্জনের বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে। এসডিজি সংশ্লিষ্ট গবেষণায় এসডিজি অর্জনে ভবিষ্যতের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ এবং এসডিজি'র আলোকে ধরিত্রীর রূপান্তরে নাগরিকের মনোভঙ্গির বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয় বক্তব্যসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। এই সময়কালে সংঘটিত শিশুদের বিপ্লব আমাদের বিবেককে কীভাবে নাড়া দিয়েছে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। এই সংকলনটিতে বাংলাদেশের সংবিধানে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শন প্রয়োগের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়।

বাংলাদেশের বাজেট বিষয়ক গবেষণা সিপিডি'র ধারাবাহিক কাজের অংশ। বরাবরের মতোই বাজেটের পূর্বে ও পরবর্তীতে বিশ্লেষণ ও বাজেট বরাদ্দকালে কোন কোন খাতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এ ছাড়া, বাজেট বাস্তবায়নের বড় চ্যালেঞ্জ, কর্মসংস্থান ও আয় বাড়ানো, কর ফাঁকি বন্ধকরণে জিরো টলারেন্স নীতি ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সংস্কার এ সময়ের আলোচিত একটি বিষয়। সে লক্ষ্যে ব্যাংকিং কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, ঋণখেলাপি, সমস্যা ও করণীয় সংক্রান্ত বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া, দেশের শ্রমবাজারে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, নতুন মজুরি কাঠামো, শ্রমবাজারে নারীদের অবস্থার বিষয়ে সমসাময়িক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

একটি সময়োপযোগী আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে দেশের ভেতরে বিরাজমান বৈষম্য ও বিভাজন নিয়ে। আগামী দিনের উন্নয়ন পথরেখায় এই বৈষম্য সমাজ ব্যবস্থায় যে বিভাজন তৈরি করছে, তা অর্থনীতির জন্য সুখকর নয়। এই বৈষম্য কমানো এক ধরণের চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে।

গণতান্ত্রিক, সহনশীল, অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে সিপিডি'র গবেষকরা প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রতিফলন রয়েছে বইটির বিভিন্ন প্রবন্ধে। নানামুখী বিষয়ের অনন্য এই সম্মিলন উৎসুক পাঠকদের আগ্রহ পূরণে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৮১৫২৭৭৯, ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৪৮১১০৪১৪ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

9 789843 457974